KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher ধীরেন ভট্টাচার্য
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৪৮/৭ ৪৮/৮ ৪৮/৯ ৪৮/১০ ৪৮/১১	Year of Publication : Nov 1987 Dec 1987 Jan 1988 Feb 1988 March 1988 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আবদুর রাউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

ফেব্রুআরি ১৯৮৮

ছাত্রজীবনে 'ভারতীয়' ত্যাগ-তিতিক্ষার অধ্যাত্মবাদী আদর্শে অনুগত বিনয়কুমার সরকার কেমন করে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস-বোধকে আশ্রয় করে যৌবনেই গড়ে তুললেন নতুন ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাষ্ট্রতত্ত্ব ড০ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "শতবর্ষের আলোকে বিনয়কুমার সরকার ঃ প্রসঙ্গ রাষ্ট্রচিন্তা" নিবন্ধে রয়েছে এই ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। □ ৭২ বছর আগে ২৯-বছর-বয়সী বিনয়কুমার সরকারের "বিশ্বসাহিত্য" নামে একটি বিস্ময়কর রচনার পুনর্মুদ্রণ। বাঙলায় আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনার এটি একটি দিক্‌চিহ্ন। □ সদ্যঃপ্রয়াত ড০ রশীদ আল-ফারুকীর চতুরঙ্গের জন্য শেষ লেখা "ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামে আলেমসমাজের দান" ঃ ভারতের মুক্তিসংগ্রামের একটি স্বল্পালোচিত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত। □ অনুশীলন সমিতির প্রমুখ নেতা পুলিনবিহারী দাসের আত্মজীবনীর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এই স্ববিরোধী ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করেছেন অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা। □ "বেনামী প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর" নিবন্ধে এই স্বল্পালোচিত বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ বিশদ করেছেন অধ্যাপক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক কথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

—শ্রীমা

বর্ষ ৪৮। সংখ্যা ১০
ফেব্রুআরি ১৯৮৮
মাঘ ১৩৯৪

শতবর্ষের আলোকে বিনয়কুমার সরকার :
প্রসঙ্গ রাষ্ট্রচিন্তা ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫২
বিশ্বসাহিত্য বিনয়কুমার সরকার ৮৬৭
ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামে আলেমসমাজের দান
রশীদ আল ফারুকী ৮৯৩
বেনামী প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯১৪

আর্ত মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৮৭৩
প্রতিকৃতি খসরু পারভেজ ৮৭৪
নিরাশ্রয় সমর চক্রবর্তী ৮৭৫
চিত্রকর শম্ভু রক্ষিত ৮৭৬

একস্পার্ট গুণময় মান্না ৮৭৭
তন্মাত্র সুভাষ ঘোষাল ৯০৪

গ্রন্থসমালোচনা ৯২৫
দিব্যেন্দু হোতা, কৃষ্ণ ধর, মনসুর মুসা, মেঘ মুখোপাধ্যায়

নাটক ৯৩৭
আমাদের নাটকের মুখ ও মুখোশ অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

সাক্ষাৎকার ৯৪৭
যিনি জাদুর স্বপ্নে স্থির সুভাষ ঘোষাল

চিত্রকলা ৯৫১
প্রবীণ-নবীনের সমাবেশ হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ ৯৫৫
অপ্রবাসী বিভূতিভূষণ অমল সেনগুপ্ত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

F. K. (JUTE) PRIVATE LIMITED
12, India Exchange Place
Calcutta-700 001
Phone : 22-9701/9979
Cable : SWEETPEA, CALCUTTA

শতবর্ষের আলোকে বিনয়কুমার সরকার : প্রসঙ্গ রাষ্ট্রচিন্তা

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাসের বিচার অভ্রান্ত হলেও কোনো-কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার পরিণতি যে করুণ হয়ে উঠতে পারে, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে এই কথা ভেবে যে মাত্র চল্লিশ বৎসর আগেও ভারতবর্ষের বে-সরকারি সাংস্কৃতিক দূত রূপে যিনি বিশ্ববন্দিত ছিলেন আজ গোটা ভারতবর্ষে তো বটেই, এমনকি খোদ বঙ্গদেশেও সেই 'গৌরবময় বঙ্গবিপ্লবের' কৃতী সন্তান বিনয়কুমার সরকার এক বিস্মৃতপ্রায় পুরুষ। অথচ পাণ্ডিত্যের গভীরতায় মননের ব্যাপ্তিতে, চিন্তার উদারতায় এবং স্বদেশপ্রেমের ভাবালুতায় বিনয়কুমার ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মনীষার সার্থক উত্তরসাধক। বিগত শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের যুক্তিবাদী, বস্তুতান্ত্রিক, ভবিষ্যবাদী এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে আপন ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত করে সমাজবিজ্ঞানের নানা শাখায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছিলেন বিনয় সরকারই। অধ্যাপক সরকার ছিলেন সেই বিরল প্রজাতির একজন যাঁরা আদর্শবাদের তাগিদে সাংসারিক জীবনের যাবতীয় তুচ্ছতা, সংকীর্ণতা আর অপ্রাপ্তিকে উপেক্ষা করে বহুজনহিতার্থে আত্মোৎসর্গের ব্রত উদ্‌যাপন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সে আদর্শবাদের ভিত্তি ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় উদারনীতি-বাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। বহুত্ববাদ এবং চরম আপেক্ষিকতাবাদের আঙ্গিকে এরই প্রকাশ ঘটেছিল বিনয় সরকারের জীবন-দর্শনে। অথচ যে "যুক্তিনির্ভর" সমাজ ছিল এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরম আশ্রয়স্থল, যার পরিপূর্ণ বিকাশের স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রগতি-পূজারী বিনয় সরকার, ভারতভূমিতে তার বাস্তবায়ন এখনো পর্যন্ত আদর্শবাদীর রঙিন স্বপ্নই হয়ে রইল। ফলে বস্তুনিষ্ঠার ব্যাপারী বিনয় সরকার আদতে একপ্রকার রোম্যানটিক জীবনদর্শনেরই জন্ম দিয়ে ফেলেন। একবিংশ শতাব্দীর দোর-গোড়ায় পৌঁছে সে কারণেই হয়তো "সরকারবাদে"র অস্তিত্ব সম্পর্কেই বাঙালি তথা ভারতবাসীর বিস্মরণ ঘটে। কিন্তু যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে, বিনয়-সরকারী সমাজতত্ত্ব বা রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রকৃত অর্থেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবার মতো নয়।

'সরকারবাদে'র সামগ্রিক মূল্যায়ন অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, শিক্ষাতত্ত্ব, অর্থনীতি বা সমাজতত্ত্বের নানা শাখায় তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটলেও রাষ্ট্রতাত্ত্বিক বিনয় সরকারের যথার্থ ভূমিকা

বিশ্লেষণ করাই এর উদ্দেশ্য। মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশের আগে বিষয়নির্বাচনের যুক্তি স্পষ্ট করা ভালো। কারণ অর্থনীতিবিদ বা সমাজতাত্ত্বিক বিনয় সরকারের যেটুকু পরিচিতিও বা বর্তমান সময়ে রয়েছে, রাষ্ট্রতাত্ত্বিক হিসেবে তার বিন্দুমাত্রও নেই। এই অপরিচয়ের ব্যবধান ঘোচানো দরকার বলে মনে করি। কেননা প্রাচ্যের তথা ভারতবর্ষের স্বকীয় জীবনদর্শনের মহিমাকীর্তনের নামে যে আবেগসর্বস্ব আধ্যাত্মিক এবং আধিবিদ্যক রাজনীতির জোয়ারে দেশ প্লাবিত হচ্ছিল, উদার-নীতবাদে আস্থা স্থাপন করেও বিনয় সরকার সেই প্লাবনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং যুক্তিনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞানমূলক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেছিলেন। ভারতীয় জীবনচর্যায় আধুনিকতার আগমনে এর দান কম নয়।

একথা অবশ্য ঠিক যে রাজনীতিকে বিনয় সরকার কখনো তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান গণ্য করেন নি। বরং মানুষের আর-পাঁচটা কাজের মধ্যেই অন্যতম একটি কাজ হিসেবেই রাজনীতির বিচার করেছেন। তাই তাঁর জীবনদর্শনে রাজনীতির কোনো বিশেষ স্থান ছিল না। বস্তুতপক্ষে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে শত হস্ত দূরে থাকা বিনয় সরকার প্রকৃত অর্থেই দলানুগামিতার ঊর্ধ্বে নিরালম্ব একক ব্যক্তিরূপে বিরাজমান ছিলেন। এর ওপরে ছিল তাঁর কঠোর বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা। মূল্যমান-নিরপেক্ষ সমাজ-বিজ্ঞানচর্চার ওপর তাঁর আস্থা এত প্রবল ছিল যে সমসাময়িক কোনো রাজনৈতিক প্রশ্নেই বিশেষ কোনো মতাদর্শ বা দলীয় মতবাদের প্রতি আনুগত্য তিনি দেখান নি। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, বহুত্ববাদী বিনয় সরকারের কাছ থেকে কোনো কমিটেড রাজনৈতিক বক্তব্যই তাঁর দেশবাসী পায় নি। বরং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর অবস্থান ছিল জনপ্রিয় মতবাদের সরাসরি বিরোধী। দু-একটা উদাহরণের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন, অসহযোগ আন্দোলনের অনতিবিলম্বেই জাতীয় শিল্প সংরক্ষণের সমস্যা নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস যখন ব্রিটিশ শুল্কনীতির ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ, অধ্যাপক সরকার তখন *Imperial Preference vis-a-vis World Economy* (1934) গ্রন্থে বিশদভাবে 'অটোয়া চুক্তি' ও সাম্রাজ্য-বাদী 'অগ্রাধিকার নীতি'-র সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। তা ছাড়া স্বদেশীয়ানার কট্টর সমর্থক হয়েও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিদেশী তথা ব্রিটিশ মূলধনের ব্যাপক আমদানির সপক্ষে তিনি মত প্রচার করেছিলেন। আবার গান্ধীজীর ডাকে সমস্ত দেশবাসী যখন আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের বার্ষিক সভায় (২২ ডিসেমবর, ১৯৩১) ভাষণদানপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তথাকথিত ভারতীয় ঐক্যের আলেয়ার পেছনে না ছুটিয়া অথবা আজকালকার তথাকথিত ফেডারেশ্যনের খপ্পরে না পড়িয়া ভারতবাসীর উচিত ছিল সোজাসুজি ভারতবর্ষকে ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্রধান স্বাধীন শক্তিকেন্দ্রে টুকরা-টুকরা করা'। ("নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন", ২য় ভাগ, পৃ ৩৫৭) এভাবে প্রচলিত এবং প্রতিষ্ঠিত মতবাদের বিরোধিতা করাই ছিল যেন তাঁর দস্তুর। সর্বগ্রাসী দলীয় রাজনীতির যুগে দলানুগামী সাধারণ জনমানসে বিনয় সরকারের প্রতিবাদী লেখনী যে বিশেষ রেখাপাত করতে পারে নি এটাও সম্ভবত তার একটি কারণ।

ভারতীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাসে বিনয় সরকারের স্থাননির্ণয়ে আরো দুটি অসুবিধের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, প্রাক-স্বাধীনতাপর্বে ভারতে রাষ্ট্রতত্ত্বের বিকাশের পথে অন্যতম প্রধান বাধা ছিল ভারতীয় সমাজের ঔপনিবেশিক চরিত্র। ইউরোপে যে পুর-সমাজ ও জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব এবং বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের আবির্ভাব এবং বিকাশের ইতিহাস জড়িত, সাম্রাজ্যবাদী-শাসনাধীন ভারতের ঔপ-

নিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজে তার বিকাশ ছিল অকল্পনীয়। তাই যথার্থ রাষ্ট্রতত্ত্ব গড়ে ওঠার বাস্তব পরিস্থিতিই সেদিনকার ভারতবর্ষে ছিল না। দ্বিতীয়ত, আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা এবং গ্রন্থ-রচনা করেছেন তাঁরা সাধারণত কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মবীর-চিন্তানায়কদের রাষ্ট্রীয় ভাবনা নিয়েই ব্যাপৃত থেকেছেন। কিন্তু বিনয় সরকারের মতো যাঁরা প্রত্যক্ষ-ভাবে কোনো প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত না থেকেও বিশুদ্ধ চিন্তা এবং ধ্যানধারণার জগতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, গবেষক-অভিযিক্ত পাদপ্রদীপের আলোয় তাঁরা কদাচিৎ আসতে পেরেছেন।

চিন্তাজগতের আলোড়নকে যথাযোগ্য মর্যাদা-দানের ব্যর্থতার দায় অবশ্য আমাদের ওপরেই বর্তায়, চিন্তানায়কদের ওপর নয়। তা ছাড়া জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন, এবং বাঙালির শিল্প- ও বাণিজ্যসাধনার সঙ্গে যিনি রন্ধ্রে-রন্ধ্রে মিশেছিলেন সেই বিনয়কুমার সরকারকে সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে বহুদূরবর্তী বিশুদ্ধ চিন্তাবীরের অপবাদ অবশ্যই দেওয়া উচিত নয়। বরং বর্তমান প্রজন্মের অনুসন্ধিৎসু গবেষক-দের পক্ষে যেটা জানা অনেক বেশি জরুরি তা হল এই যে, পরাধীনতার গ্লানি বিস্মৃত না হয়েও তিনি স্বাধীন ভারতের উপযোগীরাষ্ট্রতত্ত্ব রচনায় মনোনিবেশ করতে পেরেছিলেন। সেই রাষ্ট্রতত্ত্বের সার্থকতা বা মতাদর্শগত ভিত্তি নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে কারুরই দ্বিমত থাকার কথা নয় যে, ধর্মনিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠ রাজনীতিচর্চার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে অন্তত তিনি প্রায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন যখনও তার শৈশবাবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে নি, ইতিহাস এবং বিমূর্ত দূরকল্পনাশ্রয়ী দর্শনের বন্দীদশা থেকে যখনও তার মুক্তি ঘটে নি, সেই আদিপর্বে অর্থনীতির অধ্যাপক বিনয় সরকার প্রায় আধুনিক আচরণবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সুরে সুর মিলিয়ে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি মূল্যমান-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসেবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানচর্চার আহ্বান জানিয়েছিলেন। শুধুমাত্র এই কারণেই ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে তিনি মৌলকত্ব দাবি করতে পারেন।

ভাবালুতাবর্জিত বস্তুনিষ্ঠ এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজ-নীতিচর্চার প্রতি বিনয় সরকারের এই মমত্ববোধ কিন্তু নিছক তাত্ত্বিক গবেষণার ফল নয়। তাঁর কঠোর বাস্তববোধ এবং জীবনবোধ থেকেই এই মমত্ব উৎসারিত হয়েছিল। পরাধীনতার লজ্জা ভুলে ভারতবর্ষ আবার বৈদিক যুগের 'চরৈবেতি' বাণী উচ্চারণ করতে-করতে একদিন কর্মযোগী দিগ্বিজয়ী জাতি হিসেবে 'জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'—এই ছিল তাঁর জীবনসাধনা, তাঁর স্বপ্নময় বাস্তব। এই স্বদেশপ্রেমের তাড়নাতেই তিনি রাষ্ট্রতত্ত্বের আঙিনায় প্রবেশ করেছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রকৃত অর্থেই দেশোন্নতির সোপান হয়ে উঠবে।

২

ইতিহাস, দর্শন এবং সমাজতত্ত্বের অধিষ্ঠ প্রয়োগের সাহায্যে বিনয় সরকার এই দেশোন্নতির রাষ্ট্রতত্ত্বের যে তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল রচনা করেন তা এককথায় অনবদ্য। মৌলিক চিন্তার বর্তমান অবক্ষয়ের পাশে যখন তাঁর "প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সাম্য সম্পর্ক", "সৃষ্টি-মূলক অস্থিরতা" (Creative Disequilibrium), "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার" (Utilisation of the World-forces) ও "বহুত্ববাদ" (Pluralism) সংক্রান্ত ধারণামূলক বর্গের কথা আমরা আলোচনা করি তখন তাঁর চিন্তার উৎকর্ষে চমৎকৃত না হয়ে পারি না। তাঁর জীবনদর্শন তথা রাষ্ট্রচিন্তায় এই বর্গগুলির

সবিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বলেই সেগুলির অন্তর্নিহিত মূল ভাবধারাকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ছাত্রাবস্থাতেই বিনয় সরকারের মনে পাশ্চাত্যের ভোগের আদর্শের সঙ্গে প্রাচ্যের ত্যাগ আর তিতিক্ষার আদর্শের মৌলিক প্রভেদ সম্পর্কে বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, ম্যাক্স মুলার প্রমুখের মতবাদ গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু ১৯১১ সালে এলাহাবাদের পাণিনি অফিসের প্রকাশিত *Sacred Books of the Hindus Series*-এর জন্য 'শুক্রনীতি'র ইংরেজি তরজমাকালে বিপুল গবেষণার ফলে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি সার্বজনিক-মত-বিরোধী এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যা তাঁর জীবনদর্শনকেই আমূল বদলে দিল। তাঁর নিজের কথাতেই, 'ভারতীয় সংস্কৃতির এক নয়া মূর্তি আমার নজরে জোরের সহিত দেখা দিতে শুরু করেছিল। সে হচ্ছে সমরনিষ্ঠ, অর্থ-নিষ্ঠ, রাষ্ট্রনিষ্ঠ, হিংসানিষ্ঠ, শক্তিনিষ্ঠ ভারত। তার পাশে নিবেদিতা-প্রচারিত ভারত-মূর্তি অতি-কাল্পনিক, অতি-অলীক, অতি-ভাবনিষ্ঠ, অতি-আদর্শনিষ্ঠ মনে হচ্ছিল।' ("বিনয় সরকারের বৈঠকে", সম্পাদনা : হরিদাস মুখোপাধ্যায়, ১ম ভাগ, পৃ ২৯২) এইভাবে বিনয় সরকারের ভাবজগতে যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল সেখানে মানবধর্মের নিরিখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কোনো মৌলিক প্রভেদ থাকে না ; কারণ, কি কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য, সর্বত্রই মানুষের ধর্ম এক—সর্বত্রই মানুষ জীবনধারণ এবং প্রসারণের জন্য যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই সংগ্রামেরই হাতিয়ার রূপে কখনো গ্রহণ করে বস্তু-বাদকে, কখনো বা অতীন্দ্রিয়বাদকে। এই কারণেই তিনি বলতে পারেন, 'ভারতবর্ষ ততখানি বস্তুনিষ্ঠ, ততখানি যুদ্ধপ্রিয়, ততখানি শক্তিযোগী, ততখানি সাম্রাজ্যবাদী যতখানি ইয়োরোপ ; আবার ইউরোপ ততখানি নীতিনিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক বা ঐ ধরনের আর কিছু যতখানি ভারতবর্ষ।·····বলেছি, ভারতের লোকগুলা মানুষের বাচ্চা, রক্তমাংসের মানুষ। ব্যাস্।' ("বিনয় সরকারের বৈঠকে", ১ম ভাগ, পৃ ৩৬-৩৭)।

মানবধর্মের এই মূলগত ঐক্যের ভিত্তিতে বিনয় সরকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যাবতীয় সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত তুলনামূলক আলোচনা করে দেখান যে শিল্পবিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত প্রাচ্য প্রতিটি বিষয়েই পাশ্চাত্যের সঙ্গে সমানভাবে টেক্কা দিতে পারত। তাঁর মতে, শিল্পবিপ্লবের ফলে উভয়ের সমান্তরাল অগ্রগতি সাময়িকভাবে ব্যাহত হলেও শিল্পায়ন তথা আধুনিকীকরণের সাহায্যে এশিয়া তথা ভারতবর্ষও ধাপে-ধাপে প্রগতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করতে পারবে। এই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে *Futurism of Young Asia*(১৯২২) ও অন্যান্য গ্রন্থে এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের স্বার্থে প্রচারিত যাবতীয় জাতিবিদ্বেষ-বর্ণবিদ্বেষ-প্রসূত "white man's burden"-সংক্রান্ত তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করেন তা পড়লে এখনো রোমাঞ্চিত হতে হয়।

ঔপনিবেশিক সমাজের মানুষও যে অনিবার্যভাবে প্রগতির রথে চড়ে ধাবমান হবে, বিনয় সরকারের এই বিশ্বাসের ভিত্তি হল ব্যক্তিত্ব ও সমাজবিকাশের দ্বন্দ্বতত্ত্ব, যার নাম "সৃষ্টিমূলক অস্থিরতা"। হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বের সামান্য সংশোধিত রূপে এই সৃষ্টিমূলক অস্থিরতার তত্ত্ব পেশ করেছেন তিনি। হেগেলের মতোই "নয়" (thesis) ও "প্রতিনয়ে"র (antithesis) দ্বন্দ্বের ফলে "সমন্বয়" (synthesis) সৃষ্টির কথা তিনি বলেন। তবে হেগেলের তত্ত্বে যেমন "উল্লম্ফনে"র সাহায্যে প্রতিটি "সমন্বয়ে" গুণগত পরিবর্তন সঞ্চারিত হয়, বিনয় সরকারের তত্ত্বে প্রতিটি "সমন্বয়ে" মাত্রার হেরফের ঘটে, কিন্তু বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বদলায় না। হেগেলের মতো দ্বান্দ্বিক বিকাশের কোনো চরম লক্ষ্যের কথাও তিনি স্বীকার করেন না। কিন্তু আত্মিক জগৎ এবং বস্তুজগৎ যে দ্বন্দ্বময় এবং প্রগতি যে সেই দ্বন্দ্বেরই ফল, হেগেলের সঙ্গে বিনয় সরকার এ বিষয়ে একমত।

বিনয় সরকারের মতে, প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বে, সামাজিক সম্পর্কসমূহে এবং ভাবাদর্শ ও প্রতিষ্ঠানের জগতে চিরপ্রবহমান সু-কু, ভালো-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক, সত্য-অসত্য এবং সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব মানুষকে প্রতিনিয়ত অসত্য, অশিব এবং অ-সুন্দরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রেরণা সঞ্চার করে, এবং তারই পরিণতিস্বরূপ যে-কোনো স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করে। "নয়" ও "প্রতিনয়ে"র এই দ্বন্দ্ব ব্যক্তি-মানুষের মনোজগতে যেমন, বৃহত্তর সমাজেও তেমনি নিত্য-নতুন "সমন্বয়" সৃষ্টির জন্য অসংগতি এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করে চলে, কিন্তু কখনোই চিরস্থায়ী সমন্বয়ের জন্ম দিতে পারে না। প্রতিটি "সমন্বয়"ই তার পূর্ববর্তী সমন্বয় থেকে আপেক্ষিক অর্থে প্রগতিশীল মাত্র। কারণ, বিনয় সরকারের মতে, যা আছে আর যা নেই, এই দুয়ের মধ্যে শাশ্বত বিরোধই মানুষের সৃজনশীল বুদ্ধিবৃত্তি আর সংকল্পকে জাগ্রত করে তাকে প্রগতির স্রোতে অবগাহন করতে উদ্দীপ্ত করে।

"সৃষ্টিমূলক অস্থিরতা" যদি প্রগতির ভগীরথ হয় তাহলে "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার" হল সেই ভগীরথের মহাশঙ্খ। বিনয় সরকারের মতে, প্রকৃতিজগতে যেমন প্রতিটি জীবকে নানাবিধ অনুকূল আর প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে আপস আর সংগ্রাম করে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে টিকে থাকতে হয়, মানবসমাজেও তেমনি রাজনৈতিক উত্থান-পতন, ধর্ম এবং নৈতিকতার উন্নতি-অবনতি, অর্থনৈতিক অগ্রসরতা-অনগ্রসরতা বা সাহিত্যশিল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষ—এক কথায় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ বা সভ্যতার বিবর্তন, কোনো-কিছুই একক জাতিগত প্রচেষ্টার ফল নয়, বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের ফল। অর্থাৎ, বিশ্বের যাবতীয় প্রাকৃতিক এবং সামাজিক শক্তিসমূহের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই প্রতিটি মানবসমাজের সমৃদ্ধি, অবক্ষয়, স্বাধীনতা বা পরাধীনতা নির্ধারিত হয়। সুতরাং প্রতিটি জাতীয় জনসমাজেই "সৃষ্টিমূলক অস্থিরতা"র সাফল্য নির্ভর করে এই বিশ্বশক্তির কালোপযোগী ব্যবহারের ওপর। এই কারণেই বিনয় সরকার তাঁর উন্নতি-দর্শনে "বিশ্ব-শক্তি"র ওপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন—'বিশ্বশক্তির সন্ধানে যাহারা ব্রতী, তাহারা কি রাষ্ট্রীয় জীবনে, কি বিজ্ঞান-দর্শন সুকুমার শিল্পের ক্রমবিকাশে, কি ধনদৌলতের রূপান্তরে মানবজীবনের গতি, অগ্র-গতি ঊর্দ্ধগতি লক্ষ্য করিতে বাধ্য।' ("নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন", ১ম ভাগ, পৃ ৩৭৩)।

তুলনামূলক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা, সৃষ্টিমূলক অস্থিরতার দ্বন্দ্বতত্ত্ব এবং বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের প্রায়োগিক দিক—বিনয়-সরকারী সমাজতত্ত্বের এই তিনটি মূল স্তম্ভ তাঁর জীবনদর্শনের যে বিন্দুতে এসে মিলেছে তা-ই হল "বহুত্ববাদ"। বহুত্ববাদকে তিনি তাঁর জীবনের বেদান্ত রূপেই গণ্য করতেন। সত্য এক নয়, বহু—প্রায়োগিক দর্শনের এই চরম আপেক্ষিকতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর বহুত্ববাদের জন্ম। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি লক্ষ করেন, মানবতার ধর্ম সর্বত্র এক হলেও ব্যক্তিমানুষের সৃজনী প্রতিভা বহু বিচিত্রভাবে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক প্রয়োজনে কাজে লাগায়। জীবনের অভি-ব্যক্তিতে বৈচিত্র্যের সূচনা হয় এখান থেকেই। বিচিত্র রূপে যেমন জীবনের প্রকাশ ঘটে, তেমনি বিচিত্র শক্তির প্রভাবেও মানবজীবন গড়ে ওঠে। বিনয় সরকার তাই কোনোপ্রকার অদ্বৈতবাদকেই বরদাস্ত করেন না। শক্তিযোগ এবং চরৈবেতির পূজারী বিনয়কুমার মানবসমাজের বিচিত্র গড়ন এবং ভাঙা-গড়ার মধ্যেই প্রগতিমুখী নবজীবনের সংকেত খুঁজে পান। তাই বহুত্ববাদী জীবনদর্শনই তাঁকে ভবিষ্যবাদী আর আশাবাদী করে তোলে।

বিনয় সরকারের রাষ্ট্রচিন্তা তাঁর জীবনদর্শনেরই অনুগামী। এই দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতই তাঁর রাষ্ট্র-তত্ত্বে স্বকীয়তা এবং মৌলিক চরিত্র প্রদান করেছে। এর ফলে তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটে উঠেছে সেগুলিও প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমত, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের তুলনামূলক সমাজ-তত্ত্ব বিনয়-সরকারী রাষ্ট্রতত্ত্বে রাজনৈতিক জীব হিসেবে মানুষের মূলগত ঐক্যের কারণ অনুসন্ধানে সাহায্য করে। কৌটিল্য-ম্যাকিয়াভেলির মতো বিনয় সরকারও ক্ষমতা এবং আধিপত্যের জন্য সংগ্রামের মধ্যেই রাজ-নীতির নির্যাস খুঁজে পান। তাঁর মতে, মানুষমাত্রেই কাম, কাঞ্চন, কীর্তি আর কর্ম—এই প্রবৃত্তিচতুষ্টয়ের সামগ্রিক ফল এবং এগুলির মধ্যে "কীর্তি"প্রবৃত্তিই মানুষকে অপরের ওপর আধিপত্য কায়েম করতে, দিগ্বিজয়ী হতে এবং ক্ষমতাবান হতে অনুপ্রাণিত করে। "কীর্তি"প্রবৃত্তিই তাই রাজনীতির উৎস। কারণ, রাজ-নীতি হল এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক, স্বার্থপ্রণোদিত, বস্তু-নিষ্ঠ ও ইহলৌকিক কর্মকাণ্ড, যেখানে সত্য-অসত্য বা ন্যায়-অন্যায়ের সমান কদর। শঠতা, ধূর্ততা, হিংসা, মিথ্যাচারিতা ও প্রতিশোধস্পৃহা, বস্তুতপক্ষে সাংসারিক জীবনে নৈতিক অর্থে বর্জনীয় যাবতীয় অধর্মকেই বিনয় সরকার ধর্মনিরপেক্ষ সংসারনিষ্ঠ রাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে দেখেন। তাঁর চোখে কি ইউরোপ কি ভারত, সর্বত্রই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই চিরন্তন "সততা-ছলনা"-র সহাবস্থানের জটিল চরিত্রই ফুটে ওঠে। অতএব, রাজনীতির লড়াইয়ে ভাবালুতার যে কোনো স্থান নেই, "জোর যার মুলুক তার" নীতির জোরেই যে বিশ্বরাজনীতি পরিচালিত হয়, বিজিগীষু ব্যক্তি এবং জাতির মদমত্ত পদভারেই যে রাজনীতির ক্ষেত্র চিরকাল লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে আর হতে থাকবে, জাতীয় মুক্তিব্রতে দীক্ষিত ভারত-বাসীর কাছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিনয় সরকারের এটাই ছিল প্রাথমিক উপদেশ।

দ্বিতীয়ত, জীবনের অন্যান্য দিকের মতো রাজ-নীতিতেও শাশ্বত বলে কিছু থাকতে পারে না। কারণ দ্বন্দ্ব আর সংঘাতের ফলে রাজনৈতিক জগৎ প্রতি মুহূর্তেই গতিময়। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র থেকে ব্রিটিশ ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার পর্যন্ত নানা ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে বিনয় সরকার দেখিয়েছেন, সৃষ্টিমূলক অস্থিরতার কারণে বিশ্বের সর্বত্রই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের জগতে অবিরাম ভাঙাগড়ার খেলা চলে। জাতি এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সরকারের রূপ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শ—বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রীয় জীবনের কোনো দিকই এই সার্বিক দ্বান্দ্বিক নিয়মের প্রভাব এড়াতে পারে না। তাই 'যুবক ভারতের' রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কেরা এই প্রগতির অনু-শাসনের স্বরূপ উপলব্ধি করে বিদ্রোহী কবির মতো 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' মত্ত হবেন এবং মানবিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে সমাজের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অংশের মধ্যে ধাপে-ধাপে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন, বিনয় সরকারের জীবনে এটিও বিশেষভাবে কাম্য ছিল।

তৃতীয়ত, জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় জীবনের উত্থান-পতন যেহেতু শুধুমাত্র ব্যক্তিমানুষের সৃজনী প্রতিভা, সংকল্প, দূরদৃষ্টি বা কার্যকরী ভাবুকতার ওপর নির্ভর করে না, আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্য তথা যাবতীয় সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ঘাতপ্রতিঘাতেরও যেহেতু এ-বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, অধ্যাপক বিনয় সরকার তাই সেই ১৯১১-১২ সাল থেকেই জাতীয় উন্নতির জন্য "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের" তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে আসছেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, বাস্তবমুখী ও প্রাণচঞ্চল পররাষ্ট্রনীতির সাহায্যেই কেবল রাষ্ট্র-নায়কেরা নিজ-নিজ জাতির স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও সার্বিক উন্নতি সুনিশ্চিত করতে পারেন—এই বিশ্বাস থেকে তিনি কোনোদিনই সরে আসেন নি। 'যুবক ভারতের' জন্যও তাই "আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি" অনুসরণের আহ্বান জানাতে তিনি দ্বিধা করেন নি। কারণ, তাঁর অনন্যকরণীয় ভঙ্গিতে তিনি যেমন লিখেছেন,

> The political emancipation of India will be achieved, as world-forces should lead one to believe, not so much on the banks of the Ganges and the Godavari as on the Atlantic and the Pacific.....kinship with world-culture is the only guarantee for India's self-preservation and self-assertion. (*Futurism of Young Asia*, 1922, pp. 306-307).

চতুর্থত, বহুত্ববাদী দর্শনের যাথার্থ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েই বিনয় সরকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যের সপক্ষেই ওকালতি করেন। বহুত্ববাদী জগৎ এক অর্থে প্রতিটি জাতির রাষ্ট্রনায়কদের সামনে রাজনৈতিক বিকাশের বিচিত্র সম্ভাবনার ক্ষেত্র তুলে ধরে। তাই সর্বদেশেই জাতীয় নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের ভাবালুতা বর্জন করে শক্তিযোগের আরাধনা করতে এবং সুদক্ষভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কালোপযোগী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীর ইতিহাসে নিজ-নিজ জাতির জন্য দাগ রেখে যেতে হয়। কিন্তু বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে বাস্তব-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করলে এই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব নয়। বিনয় সরকারের মতে এই বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার অর্থই হল স্বজাতিস্বার্থনীতি (real-politik) অনুসরণ করা।

বস্তুতপক্ষে ঔপনিবেশিক পর্বের ভারতবর্ষে "স্বজাতি-স্বার্থনীতি"-র চেয়ে অধিকতর কার্যকর নীতি আর কীই বা হতে পারত? অধ্যাপক সরকার তাঁর রাষ্ট্র-তত্ত্বের মাধ্যমে এই সহজ কথাটিই নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, এই নীতি সার্থকভাবে অনুসরণ করতে হলে সম্পূর্ণ উদার এবং মুক্ত মানসিকতা নিয়ে রাজনীতিচর্চা করতে হবে। কারণ, সাধারণত দেখা যায় যে, চিরপরিবর্তনশীল রাজনৈতিক জগতে কোনো তত্ত্ব, মতবাদ বা প্রতিষ্ঠানেরই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধিকার না থাকলেও এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে গতানুগতিক রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার চরিত্রে

মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হলেও আমরা প্রাচীন এবং চিরাচরিত প্রথাকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করি এবং তার ফলে স্বাভাবিক কারণেই তত্ত্ব আর বাস্তবের মধ্যে মারাত্মক অসংগতি ফুটে ওঠে। অথচ এই অসংগতি দূর না করলে রাষ্ট্রতত্ত্বের যেমন জীবনের সঙ্গে যোগ থাকে না, অপরদিকে দেশোন্নতির কাজও সমান-ভাবে ব্যাহত হয়। এইজন্যই ভারতীয় রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিনয় সরকারই হয়তো একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি কোনো তত্ত্বগত ধ্যান-ধারণাকেই তাদের প্রচলিত ও জনপ্রিয় অর্থে গ্রহণ করেননি। তাঁর অনন্যতা এখানেই যে তিনি বিংশ শতাব্দীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনসমূহের আলোকে উনিশ-শতকীয় ধ্যানধারণার প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দেশোন্নতির সহায়ক "বাস্তববাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব" (realistic theory of the state) রচনায় ব্রতী হন।

৩

বিনয় সরকার প্রণীত "বাস্তববাদী রাষ্ট্রতত্ত্বে"র তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করলে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর সেটি হল পরাধীন ভারতবর্ষের বাস্তব পরিস্থিতির পক্ষে উপযোগী এমন এক রাষ্ট্রতত্ত্ব রচনা করা যা "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারে" ভারতীয় দেশনায়কদের প্রকৃত কাজে আসবে। বৈশিষ্ট্যত্রয় হল : জাতিগঠনের বস্তুনিষ্ঠ তত্ত্ব, রাষ্ট্রের চরিত্র এবং স্বাধীনতার স্বরূপনির্ণয়।

জাতিগঠনের বস্তুনিষ্ঠ তত্ত্ব (positive theory of nationmaking) রচনা করে বিনয় সরকার "জাতি" শব্দটির সঙ্গে যতপ্রকার আধিবিদ্যক, আধ্যাত্মিক বা রোম্যানটিক ধ্যানধারণার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে একদিকে হার্ডার-প্রচারিত "জাতীয় আত্মা"-র তত্ত্ব এবং অন্যদিকে উড্রো উইল্‌সন্-প্রচারিত "জাতি-

রাষ্ট্রে"-র তত্ত্ব নস্যাৎ করেন। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত *The Politics of Boundaries and Tendencies in International Relations* গ্রন্থে তিনি বলেন, ধর্ম, ভাষা বা রক্তসম্পর্কের যে ঐক্যের ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয় বলে সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে, এবং তার ভিত্তিতে যে 'এক জাতি, এক রাষ্ট্রে'র তত্ত্ব প্রচার করা হয় তা 'বুজরুকিপূর্ণ'। কারণ ইউরোপের যে 'নেশ্যন'-রাষ্ট্রের উদাহরণ তুলে ধরে এই তত্ত্বকে সমর্থন করা হয়, সেই ফ্রান্স, জারমানি, বেলজিয়াম, পোল্যানড, যুগোশ্লোভিয়া ইত্যাদি প্রতিটি রাষ্ট্রই আসলে বহুভাষিক, বহুধার্মিক ও বহুজাতিক। ঐতিহাসিক কারণে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম আর জাতির মানুষ পারস্পরিক সুবিধার জন্য দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করে রাষ্ট্র গঠন করে, অথচ আমরা বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্বই নেই সেই "জাতীয় সত্তা", "জাতীয় আত্মা" ইত্যাদির পিছনে ছুটে বেড়াই। শুধু তাই নয়, বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এবং উন্নত মারণাস্ত্রের যুগে কোনো জাতির পক্ষেই স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। উপরন্তু, সামাজিক প্রক্রিয়ায় অহরহ জাতি, রক্ত, ভাষা এবং ধর্মের যে সংমিশ্রণ চলছে তার ফলেও "জাতীয় ঐক্যে"র ধারণার পিছনে ছোটা নিরর্থক হয়ে পড়েছে। তাই প্রখর বাস্তববিজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে বিনয় সরকার লেখেন, 'Not unity, but independence is the distinctive feature of a national existence.' (*The Politics of Boundaries*. p. 21) তাঁর মতে, ভাষা, ধর্ম বা সংস্কৃতির ঐক্য নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শক্তির জোরে একদল ঐক্যপ্রথিত মানুষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছে কিনা তার ওপরেই সেই জনসমষ্টিকে "জাতীয়তা" (nationality) বলা হবে কি না তা নির্ভর করে। সুতরাং বিনয় সরকারের মতে জাতিগঠনের সমস্যা হল আসলে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট জনসমষ্টির সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

এই দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব প্রয়োগেও অধ্যাপক সরকার যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ-শাসনাধীন ভারতীয় ঐক্যের শ্লোগান যে আসলে সাম্রাজ্যের ঐক্যের সমার্থক, একথা উপলব্ধি করেই তিনি সেই ১৯২৪-২৫ সাল থেকেই জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলিকে 'তথাকথিত ভারতীয় ঐক্যের' পরিবর্তে বিভিন্ন ভারতীয় প্রদেশে স্বরাজ, স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান বা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে অধিকতর মনোনিবেশ করার আহ্বান জানিয়ে এসেছেন। কিন্তু চল্লিশের দশকে যখন জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে মুসলিম লীগ ধর্মভিত্তিক দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রচার করল, বিনয় সরকার তার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সময়য়ের ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র গঠনের তত্ত্ব প্রচার করেন। আবার ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে দেশবিভাগ যখন ঠেকানোই গেল না, তখন বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে ভারতীয় উপমহাদেশের উভয় খণ্ডেই ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যগ্রথিত রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবও তিনি দেন। তাঁর শেষ গ্রন্থ *Dominion India in World Perspectives* (১৯৪৯)-এ তিনি চমৎকারভাবে লেখেন যে, ব্রিটিশ শক্তি এদেশ ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে যে পুরনো রাষ্ট্রীয় ধ্যানধারণা নিয়ে ভারতবাসী চলতে অভ্যস্ত ছিল তার আশু পরিবর্তন জরুরি হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি বলেই তিনি প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নকে শিকেয় তুলে রাখতে চান। স্বাধীন ভারতে প্রতিটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানে সম্মতি জানালেও ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনকে তিনি অবাস্তব প্রস্তাব বলেই মনে করেন। বরং প্রতিটি ভাষা এবং সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দান করে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করার দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অনেক বেশি মনোমত ছিল।

'আমার বিবেচনায় রাষ্ট্র একটা কৃত্রিম সঙ্ঘ ও শাসনযন্ত্র। এর ভেতর প্রাণ, আত্মা ইত্যাদি বস্তু

দেখবার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নানা-ভাষা-ভাষী নরনারী,—হরেক রকমের সংস্কৃতি-ওয়ালা নরনারী,—এক সংগে জীবন চালাতে সমর্থ।' ("বিনয় সরকারের বৈঠকে", ১ম ভাগ, পৃ ৭৩) এই উক্তি থেকেই রাষ্ট্র সম্পর্কে বিনয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো প্রকার দেবত্ব আরোপের চেষ্টা না করে এবং একটি সাধারণ মানবিক প্রতিষ্ঠান রূপে রাষ্ট্রকে চিহ্নিত করে তিনি ইউরোপের তথা প্রাচীন ভারতের সেক্যুলার ঐতিহ্যের ধারাকেই অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। পরিবর্তনশীল বিশ্বে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বা ভৌগোলিক সীমানার কোনো স্থায়িত্ব না থাকলেও তাঁর মতে যে-কোনো জনসমষ্টি অন্তত দুটি মৌলিক শর্ত পূরণ করলেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শর্ত দুটি হল : (১) রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প থাকা অবশ্যই প্রয়োজন, এবং (২) বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নবগঠিত রাষ্ট্রকে রক্ষা করার সামর্থ্যও থাকতে হবে। সুতরাং রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে রাজনৈতিক কূটকৌশলের অন্যতম সমস্যা হিসেবেও দেখা যেতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে বিনয় সরকার তাঁকেই যথার্থ রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদা দেবেন যিনি কোনো নির্দিষ্ট জনসমাজের আর্থিক এবং সামরিক সামর্থ্য বুঝে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে নতুন রাষ্ট্র গঠনই শুধু নয়, তাকে রক্ষা করতেও সক্ষম হবেন। অতএব, জাতিগঠনের মতো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা অর্জন করা এবং অক্ষুণ্ণ রাখার সমস্যাকে বিনয় সরকার যে প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

"স্বাধীনতা" বলতে কেবল বাহ্যিক আক্রমণের হাত থেকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বজায় রাখাকেই বোঝায় না, ব্যক্তিমানুষের জীবনের নানাবিধ স্বাধীনতার প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। তাই ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর রাষ্ট্রতত্ত্ব আবহমান কাল ধরেই আলোকপাত করে এসেছে। বিনয় সরকার যে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মোটামুটিভাবে পাশ্চাত্যের উদারনীতিবাদী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যেরই সমর্থক ছিলেন, একথা জোর দিয়েই বলা চলে। প্রথমত, তাঁর মতে রাষ্ট্র চুক্তির ফলে প্রতিষ্ঠিত একটি সংঘ বলে যে-কোনো রাষ্ট্র সৃষ্টির পিছনে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সমর্থন না হলেও পরোক্ষ অনুমোদন অবশ্যই থাকা চাই। এটিকে তিনি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক দিক বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রের দ্বিতীয় দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। কারণ যেভাবেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, একটি সংখ্যালঘু প্রবর (elite) গোষ্ঠীই প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং সম্ভবত সেই কারণেই বল-প্রয়োগের ক্ষমতা বা সামরিক শক্তিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের কথা ভাবা যায় না। বিনয় সরকারের মতে এটি হল রাষ্ট্রের স্বৈরতান্ত্রিক বা অভিজাততান্ত্রিক দিক।

বিনয় সরকারের রাষ্ট্রতত্ত্বে রাষ্ট্রের এই দ্বৈত চরিত্রটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে তাঁর "গণ-একনায়কতন্ত্র" (Demo-despotocracy) ধারণার মধ্যে। ১৯৩৮ সালে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত প্রথম সর্বভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনে তিনি এই তত্ত্ব সর্বপ্রথম পেশ করেন। তাঁর নিজেরই ভাষায়, '…in the normal *Gestalt* of livlng political forms and political relations democracy and despotocracy supplement and are really complementary to each other. These two groups of values constitute one socio-political complex.' (*The Calcutta Review*, January, 1939, p. 87) বিনয় সরকার মানবপ্রকৃতি থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে দ্বৈত চরিত্রের দ্বন্দ্বের কথা বলেন, এই তত্ত্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই তত্ত্বানুসারে কোনো প্রকার রাজনীতি, রাজনৈতিক সংগঠন বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেই বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের মতো বিশুদ্ধ একনায়কতন্ত্রের একচেটিয়া প্রাধান্য থাকতে

পারে না। বরং স্বৈরাচারী এবং গণতান্ত্রিক প্রবণতা সমান্তরালভাবে বর্তমান থেকে পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে। তাই প্রতিটি রাষ্ট্রই হল 'এক একটি গণ-একনায়কতন্ত্র'। বিনয় সরকারের ভাষায়, 'Every Polity = $\text{democracy}^{x} \times \text{despotocracy}^{y}$'. (পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ৮৯ এই যুক্তিতে তাঁর মতে ব্রিটিশ-মারকিন গণতন্ত্রের সঙ্গে হিটলার-মুসোলিনির একনায়কতন্ত্রের কোনো মৌলিক পার্থক্য থাকতে পারে না। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে যে পার্থক্যটুকু ধরা পড়ে তা হল ঐ গণতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের মাত্রার হেরফের। কোথাও হয়তো গণতন্ত্রের মাত্রা বেশি, কোথাও বা কম : তেমনি কোথাও হয়তো একনায়কতন্ত্রের মাত্রা বেশি, অন্য কোথাও হয়তো তার মাত্রা কম। এইভাবেই আনুষ্ঠানিক ন্যায়শাস্ত্র ও অভিজ্ঞতাবাদের নিরিখে বিনয় সরকার নাৎসি জারমানি, ফাশিস্ত ইতালি ও কমিউনিসট রাশিয়ার নবমূল্যায়ন করেন। তাঁর মতে, আনুষ্ঠানিকভাবে স্বেচ্ছাচারী পদ্ধতি অবলম্বন করলেও জনগণের স্বার্থকে যথার্থ মূল্য দিয়ে অতীতের স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাগুলি থেকে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। গণ-সার্বভৌমত্বের নামে গণ-সংগঠনগুলির সহায়তায় গণ-উদ্যোগের ভিত্তিতে দেশ শাসন করে এই তথাকথিত একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলি আসলে "নয়া গণতন্ত্রের" (neo-democracy) সূচনা করেছে। এটি এমন ধরনের গণতন্ত্র যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের চিরাচরিত বৈরিতার অবসান ঘটানো হয়েছে এবং একই নৈতিক সত্তার পরিপূরক দুটি দিক হিসেবেই যেন তাদের আবির্ভাব ঘটেছে। এবং এটি সম্ভব হয়েছে সৃষ্টিমূলক অস্থিরতার চিরন্তন প্রক্রিয়ার ফলেই।

ফাশিস্ত ইতালি বা নাৎসি জারমানির সঙ্গে সমাজতন্ত্রী রাশিয়াকে একাসনে বসানো যেমন চলে না, তেমনি তাদের সঙ্গে পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই, একথাও নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া শক্ত। কিন্তু "গণ-একনায়কতান্ত্রিক" রাষ্ট্রের "নয়া-গণতান্ত্রিক" রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার যে সমাজতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা বিনয় সরকার দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। কারণ সমাজের প্রবর গোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু শাসকবর্গের হাত থেকে ক্ষমতা, সুবিধা, উদ্যোগ, ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা সমাজের অন্ত্যজ, অশিক্ষিত, দরিদ্র এবং নিষ্পেষিত জনগণের কাছে ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবেই যে হস্তান্তরিত হচ্ছে, বিনয় সরকারের কাছে সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই চিন্তাপদ্ধতিতে অবশ্য একটি স্ববিরোধিতা আছে। কারণ, গণ-সমালোচনা, গণ-আন্দোলন ও গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র করায়ত্ত করার আদর্শ যেমন বৈপ্লবিক, তেমনি প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নেওয়ার মধ্যে সংস্কারবাদী মানসিকতা ফুটে ওঠে। বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারগুলি সম্পর্কে বিনয় সরকারের বক্তব্য সেদিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। কেননা ১৮৬১ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত যে-সমস্ত শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধিত হয়েছে বিনয় সরকার সেগুলিকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের 'বড় বড় খুঁটা' বলেই চিহ্নিত করেন। ব্রিটিশ ভারতে প্রকৃত স্বাধীনতার বৃদ্ধি কতটা ঘটেছিল সে বিষয়ে অবশ্যই সংশয় থেকে যায়, কিন্তু এই সংস্কারগুলির সঙ্গে-সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে যে ধাপে-ধাপে তীব্রতা-বৃদ্ধি ঘটেছিল সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকেরাও তার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

বিনয় সরকারের রাষ্ট্রতত্ত্বের যদি সত্যিই কোনো লক্ষ্য থেকে থাকে তা হল স্বাধীনতার তত্ত্ব রচনা করা। ইতালির দার্শনিক ক্রোচের (B. Croce) মতো তিনিও স্বাধীনতাকেই পার্থিব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ রূপে গণ্য করেন। কারণ, স্বাধীনতার পরিমণ্ডলেই মানবসমাজের সমৃদ্ধি ঘটে, —স্বাধীনতা অর্জনেই প্রগতির সার্থকতা নিহিত। রাষ্ট্রের চরিত্র বা সরকারের রূপ, যা কিছুই আমরা বিচার করি না কেন, বিনয় সরকারের মতে স্বাধীনতার অগ্রগতি বা সংকোচনই হল প্রকৃত মাপকাঠি যার নিরিখে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাফল্য-ব্যর্থতার বিচার করতে হয়। এমনকি জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নেও স্বাধীনতার সমস্যাকেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। তবে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এখানেই যে, পরাধীন ভারতের কথা মাথায় রেখেও কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চর্চাতেই তাঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় স্বাধীনতার মূলে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার সমস্যা বর্তমান, সরকারবাদ তার প্রতিও অবিচার করে নি। এক্ষেত্রে তিনি প্রকৃত অর্থেই দার্শনিক কান্‌টের উত্তরসাধক। কান্‌টের মতোই তিনি সংকল্পের ও ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতাকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করেন। কারণ, স্বাধীনতাকে তিনি প্রকৃতিগতভাবেই যাবতীয় বিধিনিষেধের উর্ধ্বে অবস্থিত একটি নৈতিক সত্তা হিসেবেই পূজা করেন। যুক্তি এবং বিচারবোধের অধিকারী যে মানুষ আপন স্বাতন্ত্র্য আর সংকল্পের স্বাধীনতা অটুট রেখে সৃজনী প্রতিভার সাহায্যে জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে, বিনয় সরকার তথাকথিত "ত্যাঁদড়"-দেরই সেলাম জানান। কারণ, বিশ্ব-ইতিহাসে তাঁরাই প্রগতির অগ্রদূত রূপে পূজা পাওয়ার যোগ্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কান্‌টীয় নৈতিক স্বাধীনতা সত্যিই কি আমরা ভোগ করতে পারি? বিনয় সরকারের কাছেও একই প্রশ্নই দেখা দিয়েছিল। আধুনিক শিল্প-সমাজে যান্ত্রিকীকরণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক চুক্তি ইত্যাদির ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে সংকুচিত হয়েছে তা তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের স্তর পেরিয়ে সমাজতন্ত্রের স্তরে নিত্য নতুন আঙ্গিকে স্বাধীনতার সম্প্রসারণ ঘটেছে। সেই স্বাধীনতারই জয়গান করেছেন বিনয় সরকার।

মার্কসীয় অর্থনীতি এবং শ্রেণীদর্শনের তত্ত্বে বহুত্ববাদী বিনয় সরকারের পরিপূর্ণ আস্থা থাকার কথা নয়। তাই সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে মার্কসীয় বিশ্লেষণের গভীরতাও তাঁর কাছে আশা করা যায় না। কিন্তু গণতন্ত্রপ্রেমী সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে সহজ মানবিক সম্পর্কের বিকৃত রূপ স্বরূপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি যে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন এবং আজীবন ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রচারিত শ্রেষ্ঠজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েছেন তার মূল্যও কম নয়। প্রসঙ্গত তাঁর পরিণত বয়সের রচনা *Villages and Towns as Social Patterns* (1941)-এ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র কষাঘাতের কথা মনে পড়ে: 'No individual or people that holds slaves abroad can be a genuine democrat or exponent of freedom at home. The imperialist colonialist or master of subject nations is a demoralized personality.' (পৃ ৫৪৬-৫৪৭)। এই একই কারণে এর প্রায় বিশ বৎসর আগে রচিত *Futurism of Young Asia* গ্রন্থে তিনি রুশ অকটোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়গান করেছিলেন। নবগঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যখন জারের রাশিয়ার পদানত জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার শুধু নীতিগতভাবে নয়, বাস্তবেও কার্যকর করে তখন যুবক বিনয় সরকার বলশেভিকবাদের সাম্রাজ্যবিয়োজন (de-imperialisation) ও বি-উপনিবেশন ((de-colonisation) নীতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। কারণ, আধুনিক ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম নিদর্শন যখন 'পাশ্চাত্যে'র কাছে 'প্রাচ্য' প্রাপ্য সম্মান আর মর্যাদা পেয়েছিল। তবে প্রখর ঐতিহাসিক বোধ নিয়ে বিনয় সরকার এই কঠোর সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বাধীনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে না, রূপকথার রাজকন্যার মতোই দৈত্যরাজের কবল থেকে তাকে ছিনিয়ে আনতে হয়। সেজন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন

সৃষ্টিমূলক অস্থিরতার, অন্যদিকে তেমনই প্রয়োজন বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের। বাস্তব দূরদৃষ্টি নিয়ে সমাজ-প্রগতির দ্বন্দ্বতত্ত্বকে ব্যবহার করলে বিশ্বের যে-কোনো জাতীয় জনসমাজের পক্ষেই যে সমাজপ্রগতির শীর্ষে আরোহণ করা সম্ভব, বিনয় সরকারের জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রতত্ত্ব তারই ইঙ্গিত বহন করে। এদিক থেকে দেখলে তাঁর জীবনদর্শনের পুনরালোচনার প্রয়োজন সম্ভবত এখনই ফুরিয়ে যায় নি।

বিশ্বসাহিত্য

বিনয়কুমার সরকার

আমাদের দেশের খবরের কাগজ এবং সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রগুলিকে আমরা ঘরে বসিয়া যথেষ্টই নিন্দা করিয়া থাকি। বাহিরে আসিয়া বুঝিতেছি আমরা সত্যসত্যই বেশী নিন্দার পাত্র নহি। বিলাতে এবং আমেরিকায় সংবাদপত্রগুলি বিশেষ কোন যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে বলিয়া মনে হয় না। কি বিষয়-নির্ব্বাচন, কি তথ্যসংগ্রহ, কি সম্পাদকীয় মন্তব্যপ্রকাশ—কোন বিষয়েই বিলাতী ও ইয়াঙ্কি কাগজওয়ালারা ভারতীয় সহযোগীদিগকে বেশী পশ্চাতে ফেলিতে পারেন না। তবে সমগ্র পাশ্চাত্য-মণ্ডলে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ও জীবনই উচ্চতর—এইজন্য স্বভাবতই এখানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা সাময়িক সাহিত্যের সুর কিছু উন্নত। তাহা ছাড়া পরিচালনা সম্বন্ধে এখানে যৎপরোনাস্তি উৎকর্ষ দেখা যায় সন্দেহ নাই। মাসিকই হউক বা দৈনিকই হউক—প্রত্যেক পত্রই এক-একটা বিরাট লাভজনক ব্যবসায়-বিশেষ। এই ব্যবসায় চালাইবার দিক্ হইতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক কাগজ-পরিচালকই যে-কোন পাশ্চাত্য পরিচালকের নিম্নে পড়িবেন—একথা বলিতে বাধ্য। কিন্তু সম্পাদন হিসাবে এলাহাবাদের দৈনিক লীডার, মান্দ্রাজের সাপ্তাহিক হিন্দু, কলিকাতার মাসিক মডার্ণ রিভিউ এবং মহারাষ্ট্র ও বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান মাসিক পত্রিকাগুলি এই ধরণের বিদেশী পত্রিকাবলীর সমকক্ষ। অবশ্য আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ-সম্পাদিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা ঐতিহাসিক পত্রের অভাব যৎপরোনাস্তি। দাক্ষিণাত্যের দি ওয়েলথ্ অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝার ইণ্ডিয়ান থট এবং পাণিনি আফিসের The Sacred Books of the Hindus Series ত্রিশ কোটি নর-নারীর দেশে নগণ্য বলিলেই চলে। খাঁটি বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক পত্রিকা বোধ হয় একখানাও নাই। এইখানেই আমরা বর্তমান জগতের মানবসমাজ হইতে পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এই মাপকাঠিতে আমাদের

১২ বছর আগে লেখা এই রচনাটি "প্রবাসী"-র বঙ্গাব্দ ১৩২২ সনের ভাদ্র সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত হল। বিনয়কুমারের বয়স তখন ২৯। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এক তরুণ বাঙালি বিদ্যা-জীবীর এই বিশ্বব্যাপ্ত দৃষ্টি এবং বোধ আমাদের চমৎকৃত করে।

স্বাধীনচিন্তার অভাব, আমাদের মৌলিকতার অভাব, আমাদের উদ্ভাবনীশক্তির অভাব সহজেই বুঝিতে পারি।

বিলাতের এবং ইয়াঙ্কিস্থানের সৈনিক ও মাসিক পত্রে চিত্রশিল্প স্থাপত্য এবং নাটক নৃত্যকলা সঙ্গীত ও সাধারণ সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনা প্রায়ই বাহির হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও সাময়িক পত্রিকায় এবং খবরের কাগজে সমালোচনার স্তম্ভ আছে। সর্ব্বত্রই ধরণধারণ, লিখিবার ভঙ্গী, সমালোচনার রীতি প্রায় একরূপ। এই রচনাগুলিকে বাস্তবিকপক্ষে সমালোচনা বলা অন্যায়—চিত্রপরিচয়, চিত্রকর-পরিচয়, শিল্পী-পরিচয়, গ্রন্থের বিবরণ, নর্ত্তকীর বিবরণ, ওস্তাদের জীবনবৃত্তান্ত ইত্যাদি বলাই কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য মহলেও ভারতবর্ষ অপেক্ষা উচ্চতর প্রণালী দেখিতে পাই না। আমাদের সম্পাদক ও "শ্রীসমালোচক"গণকে বিশেষ দোষী বিবেচনা করিবার কারণ নাই। পুস্তক-সমালোচনা করিতে হইলে লেখকগণ ভূমিকা সূচীপত্র নির্ঘণ্টপত্র এবং অভ্যন্তরের কোন অর্দ্ধ অধ্যায় হইতে বাছিয়া দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃত করেন। কোন নটী অথবা গায়ক এবং চিত্রাঙ্কণ বা মূর্ত্তির বিবরণ প্রদান করিতে হইলে লেখক গৃহসজ্জার কথা, শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের কথা ইত্যাদি অবতারণা করিয়া কার্য্য সাধিতে চেষ্টা করেন। রবিবাবুর গ্রন্থাবলী বিলাত ও আমেরিকার কত কাগজে প্রশংসিত হয়। সমালোচনার রীতি সেই মামুলি ধরণের—

"ম্যাক্‌মিলান" যখন প্রকাশক, নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত রবিবাবু যখন লেখক বা অনুবাদক, ভারতীয় "মিষ্টিক" চিন্তায় যখন এই গ্রন্থ ভরপুর, তখন বলাই বাহুল্য এই গ্রন্থের বিশেষ আদর হইবে। পাঠকগণকে কবিতার (অথবা রচনার) রস আস্বাদন করাইবার জন্য কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।* * * আর একটা নমুনা দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম * * *।

এই ধরণের সমালোচনা বা শিল্পী-পরিচয় বিলাতী ও ইয়াঙ্কি সাময়িক পত্রে সাধারণতঃ দেখিতে পাই। সুতরাং ভারতবাসীর অত্যধিক আত্মনিন্দা করিবার প্রয়োজন নাই মনে হইতেছে।

যথার্থ সমালোচনাপদবাচ্য রচনা এই-সকল দেশের পত্রিকায় মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই রচনাসমূহে লেখক কাব্য সঙ্গীত ও সুকুমার শিল্পের ভিতরকার কথা টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করেন। কবি গায়ক ও শিল্পীর বাণী—তাঁহাদের অন্তর্জ্জগৎ এই-সমুদয় রচনায় স্পষ্টরূপে প্রচারিত হয়। উৎকৃষ্ট কাব্য চিত্র ও সঙ্গীতের ন্যায় এই ধরণের সমালোচনাও বিরল। কারণ এই সমালোচনা প্রকৃত প্রস্তাবে মৌলিক সৃষ্টি-শক্তির পরিচয়—দার্শনিক মনীষার সাক্ষ্য—দর্শন-শাস্ত্রেরই এক অঙ্গ বা বিভাগ।

প্রকৃত সমালোচক বঙ্গসাহিত্যের আসরেও দেখা দিয়াছেন। আমাদের সমালোচনার ঘর নিতান্ত শূন্য নয়। বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, ও রামেন্দ্রসুন্দর, ইহারা সমালোচনাসাহিত্যে বাঙ্গালীর প্রতিনিধি। বিলাতী সমালোচকগণের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে বলিব ব্যাজহট, লেসলী ষ্টিফেন এবং ম্যাথিউ আর্ণলড ইত্যাদির প্রবর্ত্তিত সমালোচনাপ্রণালী ইহাদের রচনাতেও দৃষ্ট হইয়াছে। ইহারা সমালোচ্য সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা ভাষ্য ও টিপ্পনী লিখিয়াছেন।

সাহিত্যসমালোচনার অন্য এক রীতি আছে। সেই রীতি দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ-প্রণীত The New Essays in Criticism নামক গ্রন্থে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত অনেকেই জানেন না। ইহার প্রভাবও ভারতবাসীর ইংরেজী এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে বিন্দুমাত্র পড়ে নাই। ইহাতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনা এবং পাশ্চাত্য সমালোচকগণের সমালোচনা আছে। তাহা ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ বুঝান হইয়াছে। গ্রন্থনিবদ্ধ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বর্ত্তমান জগতের চিন্তামণ্ডলে ভারতবর্ষের স্থান সহজেই ধরিতে পারা যায়। দুঃখের কথা, গ্রন্থের ভিতর বিশ্বসাহিত্যের

উল্লেখ এবং পাণ্ডিত্যের অবতারণা এত অধিক যে পৃথিবীর বেশী লোক ইহা সহজে বুঝিতে পারিবে না—বাঙ্গালী বা ভারতবাসীর ত কথাই নাই। ইহার প্রাঞ্জল সংস্করণ এবং ভাষ্যস্বরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

ব্রজেন্দ্রনাথ যেরূপ তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালীর পক্ষপাতী চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন স্বাধীনভাবে সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই সমালোচনার আসরে নামিয়াছেন। ইহার রচনাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে এই-সমুদয়ের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হইবে। শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ঐতিহাসিক গ্রন্থ। লেখককে স্থানে স্থানে সমালোচকের কার্য্যও করিতে হইয়াছে। ইহার সমালোচনায় সাধারণতঃ ম্যাথিউ আর্ণল্ড্, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির ব্যাখ্যা-প্রণালীই বিশেষ প্রকটিত—কিন্তু মাঝে মাঝে দ্বিতীয় প্রণালীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দীনেশবাবুর History of Bengali Language and Literature নামক ইংরেজী গ্রন্থে এই রীতির পরিচয় বেশী।

বর্ত্তমান বাঙ্গালাসাহিত্যের আসরে মামুলি গ্রন্থ-পরিচয় অথবা "শ্রীসমালোচক"-লিখিত শিল্প-পরিচয় ব্যতীত যথার্থ সমালোচনার প্রয়াসও আছে। বিগত সাত বৎসরে সমালোচনার ঘরে লেখকের সংখ্যা বাড়িয়াছে—রবীন্দ্রনাথের নোবেল-প্রাইজ লাভের পর সাহিত্য-সমালোচনা বাঙ্গালা সাহিত্য সবিশেষ পুষ্টি-লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। আগামী কয়েক বৎসরের ভিতর নিরেট ফল পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি আমাদের দেশে সমালোচনার দুই রীতিই অবলম্বিত হইয়া থাকে।

বিলাতে থাকিয়া ইয়োরোপের কথা বেশী শুনিতাম না—বিশ্বচিন্তা, বিশ্বসাহিত্য ইত্যাদির সংবাদ পাইতাম না। অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্বি_জ, এডিনবারা ইত্যাদি বড় বড় চিন্তা-কেন্দ্রগুলি যেন জমাটবাঁধা প্রাচীর-বেষ্টিত চর বা দ্বীপ-স্বরূপ। দুনিয়ার-ভাব-স্রোত এই-সমুদয় 'চরে' সহজে প্রবেশ করে না। ইয়াঙ্কিস্থানে দেখিতেছি—সমগ্র ইয়োরোপই আমার সম্মুখে। এখানকার চিন্তা-মণ্ডলের আবহাওয়ায় সঙ্কীর্ণতা প্রাদেশিকতা গতানুগতিকতা যেন একেবারেই নাই বোধ হইতেছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় দুই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তারাই ইয়োরোপের সকল প্রদেশকে নিজ নিজ কেন্দ্রে টানিয়া আনিতে সচেষ্ট। ফরাসী, ইটালীয়, রুশ, জার্ম্মান ইত্যাদি সকল জাতীয় চিন্তাই ইয়াঙ্কি-প্রতিষ্ঠানে মর্যাদা লাভ করে। ইয়োরোপের বিভিন্ন সাহিত্য কলা ও সভ্যতা শিখাইবার জন্য এখানে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ফলতঃ ফ্রান্স, জার্ম্মানী ইত্যাদি দেশের পরিচয় ইংরেজী ভাষায় পাইতে হইলে বিলাতে না যাইয়া আমেরিকায় আসাই সুবিধাজনক। হার্ভার্ড ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ ইয়োরোপের নানা সাহিত্য ও সভ্যতা সম্বন্ধে যে-সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, বিলাতের ইংরেজী-সাহিত্যে সে-সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালাদেশে এক্ষণে সাহিত্যসমালোচনা, সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা, শিল্পরীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ইত্যাদি চলিতেছে। এদিকে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের দৃষ্টিও পড়িয়াছে। এই সময়ে আমরা বিশ্বসাহিত্যের সংবাদ রাখিতে চেষ্টা করিলে সবিশেষ উপকৃত হইব। আমরা তুলনামূলক ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক আলোচনা-প্রণালী নানাক্ষেত্রে অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তও হইয়াছি। কাজেই দুনিয়ার চিন্তাশক্তি হইতে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া স্বকীয় স্বাস্থ্য ও কলেবর পুষ্ট করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। আমরা যে পথে অগ্রসর হইয়াছি সেই পথই আরও প্রশস্ত ও বিস্তৃত হইতে পারিবে।

এইজন্য এক্ষণে তুলনামূলক সমালোচনা-প্রণালীর প্রবর্ত্তকগণের গ্রন্থ আমাদের দেশে অধীত ও প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। ফরাসী তেন, এদর্ম শেরার এবং স্যাঁৎ ব্যভ, ডেন্‌মার্কের জর্জ ব্রাণ্ডেস এবং আয়র্ল্যণ্ডের ডাউডেন ইত্যাদির রচনাবলী সুপ্রচলিত হইলে

সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে বিশেষ সুবিধা হইবে। চিত্রকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য, নাটক, কাব্য, উপন্যাস ইত্যাদির মূল্য নূতনভাবে সমাজে প্রচারিত হইতে থাকিবে। বস্তুতঃ সাহিত্য-সমালোচনার ভিতর দিয়া জাতীয় চরিত্রগঠনের সুযোগ আসিবে। এই ধরণের সমালোচক যথার্থভাবে দার্শনিক—অর্থাৎ পথপ্রদর্শক—নূতন চিন্তার প্রবর্ত্তক—সুতরাং জাতীয় জীবনের নিয়ামক।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুনো ফ্রাঙ্কা জার্ম্মান-সাহিত্য সম্বন্ধে একখানা সমালোচনাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য কোন দার্শনিক, সমালোচক বা ঐতিহাসিকের মতবাদ অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। ব্রাণ্ডেস্, ডাউডেন অথবা ফ্রাঙ্কার সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধেও এই কথাই খাটিবে। কিন্তু ইহাদের আলোচনাপ্রণালী লক্ষ্য করিবার জন্যই ইহাদের আদর প্রধানতঃ হওয়া উচিত।

ফ্রাঙ্কা-প্রণীত Social Forces in German Literature গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচনাপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে :—

"There seems to be a decided need of a book which should give a coherent account of the great intellectual movements of German life as expressed in literature; which should point out the mutual relation of action and reaction between these movements and the social and political condition of the masses from which they sprang or which they affected; which in short, should trace the history of the German people in the works of its thinkers and poets."

গ্রীন (John Richard Green)-প্রণীত History of the English People গ্রন্থ ভারতবর্ষে সুপরিচিত। এই গ্রন্থের সাহিত্যসংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে এই ধরণের সমালোচনাপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

জর্জ্জ ব্রাণ্ডেসের সেক্সপীয়ার-বিষয়ক গ্রন্থের নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। তাঁহার আর একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিভক্ত। নাম Main Currents in Nineteenth Century Literatures। এতদ্ব্যতীত নরওয়ের নাটককার ইবসেন, জার্ম্মান শ্রমজীবীর বন্ধু ফার্ডিনাণ্ড ল্যাসেল এবং পোলিশ জার্ম্মান দার্শনিক নীট্শে সম্বন্ধে জীবনী ও সমালোচনা-গ্রন্থ ইহার প্রণীত। Main Currents গ্রন্থের বিভাগগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

1. The Em'grant Literature.
2. The Romantic School in Germany.
3. The Reaction in France.
4. Naturalism in England.
5. The Romantic School in France.
6. Young Germany.

আর্ণল্ড্, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির অবলম্বিত ব্যাখ্যা-ভাষ্যরীতি এবং ব্রজেন্দ্রনাথ ডাউডেন ইত্যাদির অবলম্বিত তুলনামূলক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক আলোচনা-প্রণালীর প্রভেদ জর্জ্জ ব্রাণ্ডেসের ভাষায় দেখাইতেছি :—

"Regarded from the merely aesthetic point of view as a work of art, a book is a self-contained, self-existent whole, without any connection with the surrounding world. But looked at from the historical point of view, a book, even thought it may be a perfect, complete work of art, is only a piece cut out of an endlessly continuous web. Aesthetically considered, its idea, the main thought inspiring it, may satisfactorily explain it, without any cognisance taken of its author or its environment as an organism; but historically considered, it implies, as the effect implies the cause, the intellectual idiosyncrasy of its author, which asserts itself in all his productions which condition this particular book, and some understanding of which is indispensable to its comprehension. The intellectual idiosyncrasy of the author, again, we cannot comprehend without some acquaintance with the intellects which influenced his development, the spiritual atmosphere which he breathed."

এই ধরণের সাহিত্যসমালোচনা সভ্যতার ইতিহাসের এক অধ্যায়স্বরূপ। ফরাসী অধ্যাপক গ্যেরার-প্রণীত French Prophets of Yesterday: A Study of Religious Thought under the Second Empire এই শ্রেণীর সমালোচনাগ্রন্থ। ইহাতে গীজো, শেরার, কীনে, মিশলে, হ্যুগো, স্যাঁ সিমঁ, প্রুধঁ, ভিক্রি, লীল, স্তাঁৎ ব্যভ, তেন্, রেনাঁ ইত্যাদি লেখকগণের সাহিত্য-জীবন ও চিন্তাপ্রণালী ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের রীতিতে আলোচিত হইয়াছে। ১৮৪৮ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত ফরাসীদিগের জাতীয় জীবন এই সাহিত্যসমালোচনার গ্রন্থে বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়। লেখক ক্যালিফর্ণিয়ার লীল্যাণ্ড ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

৫।৭ বৎসর হইল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে "জার্ম্মান-সাহিত্যে ভাবুকতা" সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা হইয়াছিল। সেগুলি Romanticism and the Romantic School in Germany নামে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইয়াছে। লেখকের প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

"The results to which I have been led are essentially founded on the works of the authors themselves; these I have endeavoured to understand in their historical setting and their relation to our time."

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এইরূপ তুলনামূলক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রণালীতেই সাহিত্য-সমালোচনা শিখাইবার প্রয়াস চলিতেছে। সাহিত্যের অভ্যন্তরে মানবাত্মার ক্রমিক অভিব্যক্তি এবং সভ্যতার বিকাশ বুঝাইবার জন্যই বিভিন্ন কেন্দ্রে Comparative Literature অর্থাৎ তুলনামূলক সাহিত্য অথবা Literary Criticism অর্থাৎ সাহিত্যসমালোচনার পাঠচর্চ্চা নির্দ্ধারিত হয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যসমালোচনা-বিভাগের পাঠ্যতালিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে :—

1. The Relations of Semitic Literatures to the Literature of Europe.

2. The Relations of the Literature of India to the Literature of Europe.

3. The Relations of Greek Literature to European Literature in other tongues.

4. The Relation of Latin Literature to European Literature in other tongues.

5. The Relations of Irish and Welsh Literature to the Literature of Europe in other tongues.

6. The Relations of Icelandic Literature to European Literature in other tongues.

7. The Relations of Provencal Literature of European Literature in other tongues.

8. The Relations of Spanish Literature to European Literature in other tongues.

9. The Relations of Middle High German Literature to Europeans Literature in other tongues.

10. The Relations of Slavic Literatures to European Literature in other tongues.

এই পাঠ্যতালিকা হইতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত সমালোচনা-রীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতির সঙ্গে জাতির সম্বন্ধ এবং আদান-প্রদান বাহির করা হয়। সাহিত্যমণ্ডলে বিনিময় এবং লেনদেন ও পরস্পর-প্রভাববিস্তার কতটা সাধিত হইয়াছে তাহার পরিচয় প্রদানই সাহিত্যসমালোচকগণের লক্ষ্য। ইহারা ইউরোপীয় সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বশক্তির পরিচয় লইয়াছেন। আমরাও এই প্রণালীতে ভারতীয় সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বশক্তির পরিচয় লইতে পারি। অথবা ক্ষেত্র আরও সঙ্কীর্ণ করিলে,—বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় সাহিত্যের সম্বন্ধ ও আদানপ্রদান বুঝিতে অগ্রসর হইতে পারি। এইরূপ সাহিত্যসমালোচনার ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং বাঙ্গালার ইতিহাস স্পষ্ট ও সজীব হইয়া উঠিবে। একটা কথা উঠিতে পারে যে, আমরা নরওয়ে সুইডেন ডেন্মার্কের ভাষাও জানি না অথবা ঐ-সকল দেশের সাহিত্যরথীদিগের রচনার অনুবাদও কখন পাঠ করি নাই। সুতরাং বয়েজেন-প্রণীত Essays on Scandinavian Literature পড়িয়া লাভ কি? সেইরূপ

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে অষ্ট্রিয়ার কোন সাহিত্য-সেবীর নাম পর্য্যন্ত আমরা জানি না—পোলক-প্রণীত Franz Grillparzer and the Austrian Drama বুঝিব কি করিয়া? সেইরূপ পোল্যাণ্ডের সাহিত্যবীর মীকীভিক্স্ এবং রুশিয়ার আধুনিক উপন্যাস-লেখকগণের রচনা-বিষয়ক ইংরেজী সমালোচনা-গ্রন্থ সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। যে গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত শুনা নাই তাহার সমালোচনা প'ড়িয়া কি হইবে? যাঁহারা সমালোচনা-সাহিত্যকে অন্য কোন সাহিত্যের আনুষঙ্গিক মাত্র বিবেচনা করেন তাঁহারা এইরূপই ভাবিবেন। কিন্তু সমালোচনার যে বিবরণ প্রদত্ত হইল তাহাতে ইহা স্বয়ংই মৌলিক সাহিত্য দর্শন ইতিহাস ইত্যাদি বিজ্ঞানের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষণীয়। মেট্‌স-প্রণীত History of European Thought in the Nineteenth Century আমাদের যে ভাবে আলোচ্য, ঠিক সেই ভাবেই আমাদিগের রুশ, পোল, সুইডিশ, জার্ম্মান, স্পেনিশ, কেল্‌টিক, জাপানী, চীনা, আরবী, ফারসী ইত্যাদি সকল সাহিত্যের ইংরেজী ফরাসী অথবা জার্ম্মান সমালোচনা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে বিভিন্ন জাতির চিন্তাসম্পদ এবং ভাবরাশি আয়ত্ত হইতে থাকিবে। অধিকন্তু সমালোচকগণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান দৃঢ় হইবে। বহুবিধ সমালোচনার নমুনা পাইতে থাকিলে সমালোচনা-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি সহজেই আয়ত্ত হইয়া আসিবে।

বাঙ্গালীর "কবিকঙ্কণচণ্ডী" অথবা ভারতবাসীর "রঘুবংশম্" এই সমালোচনা-বিজ্ঞানের নিয়মে বুঝিতে হইলে তিন শ্রেণীর তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক :—

(১) এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় অথবা রচনা-রীতি জগতের যে যে গ্রন্থে অবলম্বিত হইয়াছে সেই-সকল গ্রন্থের আলোচনা। বাল্মীকির রামায়ণ, গেটের ফাউষ্ট, দান্তের ডিভাইন কমেডি, হোমারের ইলিয়াড ইত্যাদি কোন গ্রন্থই বর্জ্জন করিলে চলিবে না।

(২) কালিদাস অথবা মুকুন্দরামের যুগে সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং শিক্ষা-বিষয়ক সকল প্রকার তথ্যের আলোচনা। গ্রন্থকার-দিগের জীবন সেই যুগের সাধারণ শক্তিপুঞ্জ হইতে কতখানি রসগ্রহণ করিয়াছিল এবং গ্রন্থকারেরা তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন তাহা জানিতে হইবে।

(৩) সমগ্র ভারত অথবা বাঙ্গালার ইতিহাসে কালিদাসের যুগ অথবা মুকুন্দরামের যুগ কোন্ স্থান অধিকার করিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। কালিদাসকে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভারতীয় ইতিহাসের ধারা বুঝিতে হইবে। সেইরূপ কবিকঙ্কণকে বুঝিতে হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য এবং বঙ্গীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশ বুঝিতে হইবে।

আমাদের বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, নীতিশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, পদাবলী, অভঙ্গ, দোঁহা, আনন্দমঠ, গোরা ইত্যাদি যে-কোন গ্রন্থের আলোচনায়ই এই তিন-প্রকার তথ্যের অবতারণা আবশ্যক। ধর্ম্মসাহিত্যই হউক অথবা লোকসাহিত্যই হউক, সকল সাহিত্যকেই এই তুলনামূলক প্রণালী (Comparative Method) অথবা ঐতিহাসিক প্রণালী (Historical Method) দ্বারা যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল ইয়োরোপে খ্রীষ্টধর্ম্ম এইরূপ সমালোচনার কষ্টিপাথরে ঘষা শুরু হইয়াছে। সেই সমালোচনার নাম উচ্চাঙ্গের সমালোচনা—"Higher Criticism"। ইয়াঙ্কি পাদ্রী সাণ্ডারল্যাণ্ড (Sunderland)-প্রণীত The Origin and Character of the Bible এই প্রণালীতে লিখিত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভারতবাসী-মাত্রেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

আর্ত

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

পায়ের তলায় ঘোড়ার ডিম মাথায় ভাঙা চাঁদ
জন্মেছিলাম শ্মশানধারে শ্মশানেচুল্লীতে
মিলিয়ে যাব।
মধ্যিখানে দুঃসময়ের ফাঁদ
তারই মধ্যে বিরক্তিকর উর্ণনাভজাল
মায়ের স্নেহে তোমার প্রেমে বিচ্ছিরি সব সুতো
রঙবেরঙের নকশা তোলে।
যাই যেখানে চলে
হ্যাঁচকা টানে ফিরিয়ে আনে পাঁচালী পুঁথি পাঠ
এই কি জীবন! প্রশ্ন শুনে মায়ের বাল্যই ষাট!
পায়ের তলায় ঘোড়ার ডিম মাথায় ভাঙা চাঁদ
সারাজীবন মৃত্যুপথিক গোপন আর্তনাদ!

প্রতিকৃতি

খসরু পারভেজ

আজও তোমার দেখা নেই বীতশোক আহ্বান
সন্ধ্যার বন্দরে কাঁদে স্রোতশূন্য বিহ্বল নোঙ্গর
ভালোবাসার নারঙ্গীবনে ক্রন্দসী বুনো হাওয়া
দেখা নেই দৃশ্যহীন, ক্রূর স্রোতে বহতা জীবন

অনেক কেঁদেছি কষ্টে অশান্ত রুমালে ঢেকেছি মুখ
মনে পড়ে সেই চোখ শালবন বুক, স্নিগ্ধ তুমি
তোমারই আঙিনায় আকৈশোর কেটেছে যৌবন
তুমি আমি স্বাধীনতা সেই যুদ্ধদিন, রক্ত-রাত
সূর্যোদয়ের বাঙ্ময় নদীগুলো মনে পড়ে শুধু
দেখা নেই পারাবত পথিক আমার, প্রতিকৃতি

কতদিন বেয়ে যাব তিমিরে গাঙ্গেয় জলখেয়া
বেবোধ বৃষ্টিতে বড়ো বেশি ভিজে যাই, পুড়ে যাই
হৃদয়ে রক্তক্ষরণ প্রতীক্ষার পথ বাড়ে দীর্ঘ
কোথায় লুকালে অগ্নিদ্বীপে কক্ষচ্যুত দেশান্তরে?

এই বারবেলা এসো উদ্‌ভ্রান্ত বুকের খোয়াড়ে
কতদিন দেখা নেই তোমার দ্রাবিড় বাঙলায়
ফিরিয়ে নাও প্রেমের রাখী কষ্টের কাবিননামা
স্পর্শ নেই স্পর্শহীন, ক্রূর স্রোতে বহতা জীবন।

বাংলাদেশ

নিরাশ্রয়

সমর চক্রবর্তী

ঘন অহংকার তুমি ভেঙে দিলে—
আর তবে কার কাছে যাব?
ভয়ংকর কালো আফিঙের মতো জনপথ,
এখন আমাকে দেখে গাছগুলি ফিসফাস করে
তবুও অরণ্য ভালো এই ভেবে আর কত গভীর নির্জনে যাব?
কতখানি নীচে গেলে নদী তুমি কলঙ্ক লুকোতে পার?
সভ্যতায় জড়াব না দেহ এই ভেবে যতবার পাহাড়ে গিয়েছি
রক্তের বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে এই সমতলে
পাটাতনে তুলে এনেছিল যারা নতুন পলাশ
তারাও বাতিল হল, তুমি সাক্ষী ছিলে, যার কোনো মানে নেই।
এখন কোথায় যাব? কোন্ দ্বীপে?
বৃক্ষদের ঘৃণা আজ বাতাসের কাঁধ বেয়ে চলে
সব প্রকরণ প্রথা, দিশারির শখ, নিসর্গের ঝুলবারান্দা,
তুমি এইভাবে কেন ভেঙে দিয়ে গেলে?

চিত্রকর

শম্ভু রক্ষিত

চিত্রকর মুহূর্তগুলির প্রতিমূর্তির মতো একটি ঘোড়ার পিঠের ওপর বসলেন
গা-ঘেঁষে বয়ে চলা স্রোতের দিকে তাকালেন এবং বিকেলবেলা অর্গ্যানের মতো
চিৎকার করলেন আমাদের নাছসনুছস নুড়িগুলোদের মাঠে—
এবং যখন মৃগচর্মের তৈরি পোশাক পরলেন
তখন সমতলভূমির মাঝখানে ঝুঁকে পড়ে আছে সুঠাম তৃণভূমি
সৌন্দর্যের বাসিন্দারা গুলি চালাচ্ছে, অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে
অনেক বুড়ো মহিষ
এবং দিনের হলকায় যাদের চামড়ার রঙ তৃষ্ণার্ত উদ্বিগ্ন হত
তাদের হাতে অন্তহীন উচ্ছ্বাস হয়ে উঠছে ঈগলের পালক ; বীণাধ্বনি
গৃহীত হচ্ছে; ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেশান্তরযাত্রীরা, কিছু হাওয়া জেগে উঠছে
চিত্রকর নিরাশভাবে দৃশ্যের ভেতর উবু হয়ে বসলেন। আমি একটি
রোদে-পোড়া সমতলভূমি অতিক্রম করে চিত্রকরের স্মৃতি জাগিয়ে তুললাম।
কিন্তু হঠাৎ সূর্যাস্তবেলায় সারাটা গ্রাম ভেঙে পড়ল
বীরযোদ্ধার সাজে চিত্রকরকে দেখতে—
বনদেবী তার অ্যাপোলোকে ঘিরে ফেলল শুয়োরের চোঁট পরে।
চেঁচিয়ে কে বলল: ওহে যুবক আর বালকবৃন্দ, গালে সিঁদুর মাখানো যুবতীরা
এসো, বনদেবীর প্রতি ঔদাসীন্যের ভাব দেখাই!
পায়ে-পায়ে এসে চিত্রকর দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটালেন
অনেক ভারসাম্য দেখালেন তাঁর কণ্ঠস্বরে।
সীমান্ত ছেড়ে শীতের ঝড়ে উড়িয়ে আনা হালকা পাখিদের মতো
আমাদের সাদা তাঁবু দেখেন যিনি ; লাল সূর্য তাকে বালুর প্রাচীর দিল
কেউ বা তার জন্যে একটা ভোজ দাবি করল
যেমন ধর্মীয় অনুভূতির জন্যে দেশান্তরযাত্রীরা তাদের ছুটি পা ক্রমাগত
দুলিয়েই চলেছে ; এদেরই মাঝখানে তীরভরা তূণ
আর লম্বা ঠোঁটওয়ালা জলার পাখিগুলোর চিৎকার চিত্রকরের মাথার ওপর
দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। জন্তুরা চিত্রকরকে বলল: আমাদের সাহায্য করো,
তোমার কাছে আমরা কটন-উড দাবি করি
গিরিপথের কিনারায় আহত ও উবুড় হয়ে তারা মাটির নীচে পড়ে রইল,
পরে ডান ধারে বসল তারা
খাড়া পাহাড় আর বাতাস চিত্রকরকে খুঁজতে চাইল
চিত্রকর তাদের বললেন: যেহেতু তোমাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই
অনেকগুলো হিংস্র হৃদয় তৃষার্ত হয়ে থাকবে তোমাদের মধ্যে।
চিত্রকর কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়ে এসে অত্যন্ত যন্ত্রণার দৃষ্টিতে
তাকিয়ে আমাকে ঘাসের ওপর বসতে বললেন।

এক্স্ পার্ট ১

গুণময় মান্না

অম্বর চ্যাটার্জি গুণী ব্যক্তি। নিজের দেশের এমএসসি পিএচডি ডিএসসি তো বটেই, শিকাগো রোম লনডন থেকেও একটা না একটা ডিগ্রি এনেছেন। পৃথিবীতে যদিও আরো তিনটে মহাদেশ, তবু আমেরিকা-ইউরোপ যখন মন্থন করেছেন, তখন পৃথিবীর ছাদেই উঠে গেছেন। এ কথাটার মানে এই যে, বাড়ির ভেতর যত ঘর যত সিঁড়ি যত ব্যালকনি আছে, সেসবের আলাদা করে পরিচয় নেবার দরকার কী? যেহেতু ঘর সিঁড়ি ব্যালকনি বাড়িরই অন্তর্ভূত, সেজন্য যিনি ছাদে অধিষ্ঠান করবেন, লজিক্যালি তিনি ওসবেও অধিষ্ঠান করছেন, এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে ওঠে। অম্বর চ্যাটার্জি প্রাণরসায়নবিদ্যার শীর্ষস্থানে রয়েছেন একথা অবিসংবাদিত।

আর পদমর্যাদায়—শীর্ষস্থানে আছেন কি? নেই বটে, আবার আছেনও। এই প্রাদেশিক অথচ সুবিখ্যাত শহরে আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন এক বিজ্ঞানসংস্থার তিনি ডেপুটি-ডাইরেকটর। ডেপুটি যখন তখন নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ নন। তবে তাতে আর কী? ডিরেকটর ডকটর সেন তাঁর স্যার, বয়েস হয়েছে, স্বাস্থ্যও ভালো না, একসটেনশনে আছেন, আর বছরখানেক পরেই তিনি বিদায় নিচ্ছেন। এ লাইনে অম্বরের অনেক হোমরা-চোমরা শুভার্থী আছেন—(শুভার্থী মানে কী? না, তুমি আমাকে দেখো, আমি তোমাকে দেখব) তিন বছর আগে তাঁরা চেয়েছিলেন ডকটর সেনের একসটেনশন নাকচ করে দিতে। মোলায়েম হেসে অম্বরই বলেছিলেন, 'না-না, সেটা দৃষ্টিকটু দেখায়...' তা ডকটর সেন থেকে গেলে কী হবে, এই বদান্যতার বিনিময়ে তিনি তাঁর এই শক্তিমান ছাত্রটিকে সব কাজেরই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন: টু লিভ অ্যানড লেট লিভ আর কী। আইডিয়াটা মন্দ না। তাহলে দাঁড়াল, অম্বরের ডেপুটিত্ব স্বেচ্ছাবৃত, ওটা ডি জিওর, ডি ফ্যাকটো

তিনিই ডিরেকটর।

বয়েস-টয়েসের কথা যখন উঠল—অম্বর চ্যাটার্জির পঞ্চান্ন পেরিয়ে ছাপ্পান্ন চলছে। লম্বা একহারা চেহারা মুখের কাট শার্প চোখা নাক তীব্র দৃষ্টি, চুলে পাক-টাক ধরে নি, কেবল পরিষ্কার করে কামানো মুখে জুলপির দিকে শাদা রঙ ধরেছে। খেতে ভালোবাসেন, হজম করতেও পারেন। তাঁর ভোজনপ্রিয়তা নিয়ে সরস সব গল্প প্রচলিত আছে—ছেলেবেলাতেই তিনি নাকি কেড়েকুড়ে খেয়ে ফেলতেন মায়ের রান্নাঘর থেকে সরিয়েও। এখন তিনি বিখ্যাত লোক—একবার এক বড়ো রকমের সেমিনার হচ্ছে, তাঁরও পেপার পড়ার কথা, বসলেন, অত বড়ো হলঘরের সব নিমন্ত্রিত হোমরা-চোমরাদের একেবারে পিছনের সারিতে। একটার পর একটা পেপার পড়া চলছে, বিরাট বোর্ডে একের পর এক ছক আঁকা আর অঙ্কপাত হচ্ছে, হলঘরে শ্রোতাদের নিঃশব্দ একাগ্রতার মধ্যে এখানে-ওখানে সিগ্রেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী, অম্বর একবার করে উঠে যান, পিছনের দেয়াল ঘেঁষে ভাবী চা-পর্বের জন্য যে প্যাকেটের স্তূপ, তার থেকে দু-একটা করে নিয়ে চলে আসেন, আবার যান আবার আনেন, বোর্ডের দিকে চোখ, কান উৎসুক, কিন্তু মুখও চলেছে সমানে। টিফিনের সময় এক পেপার-পাঠক জিজ্ঞেস করলেন, 'ড. চ্যাটার্জি, কেমন লাগছে?' অম্বর ইংরেজি করে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোমরা যখন হলটাকে ভারী থেকে হালকাতর করছিলে, আমি তখন সেটাকে হালকা থেকে হালকাতর করছিলাম, হাঃ-হাঃ…'

অম্বর চ্যাটার্জির দাম্পত্যজীবনের কথাও এসে যায়। গল্প আছে. তিনি যখন প্রথম জীবনে ইংলিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন, (অধ্যাপনা তিনি খুব অল্প দিনই করেছিলেন, তারপর তিনি রিসার্চ-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে চলে যান, আজ এখানে কাল ওখানে, এ বছর এদেশে তো পরের বছর বিদেশে) তখন এত ভালো পড়াতেন যে ছাত্ররা তাঁর লেকচার শুনে স্তম্ভস্তপ্রাপ্ত, আর ছাত্রীরা অশ্রুসজল হয়ে উঠত। ছাত্র-ছাত্রীরা ভিড় করত তাঁর চারপাশে। তাদের মধ্যে সুপ্রভানাম্নী অনার্সের এক মেয়ে তাঁকে নোট দেখাতে এলে তার মুখ লাল এবং দু-একটা ভাঙা-কথা শ্বসিত হয়ে উঠত। সেই সুপ্রভাই তাঁর গৃহিণী।

কালের গতিকে ইতিমধ্যে সুপ্রভার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, স্বামীর ঠিক বিপরীত। অসম্ভব স্থূলকায়া, নড়তে-চড়তে কষ্ট হয়, তার ওপর ডান পায়ের হাঁটুতে বাত, টেনে-টেনে হাঁটেন। ফলে বাড়ির সব কাজ ঝি আর রাঁধুনির হাতে ছেড়ে দিয়ে কেবল দুটি কাজ তিনি করেন—তাঁদের ছেলে-মেয়ে-ছেলে করে তিনজন, বড়োটি এই শহরেই ডাকতারি পড়ে চতুর্থ বর্ষে, মেয়ে কানপুরে পোস্ট-গ্রাজুয়েট করছে, ছোটোটি গেছে ব্যাঙ্গালোরে এরনটিক্সের ডিগ্রি আনবার জন্য—সুপ্রভা সেই ছেলেমেয়েদের তদারকি করেন, চিঠি লেখেন, আজকাল চিঠি লিখতেও আলিস্যি হয়, আর মাঝে-মাঝেই বলেন, 'তোরা বাবার মতো কেউই হতে পারলি না…'। দ্বিতীয় কাজটি হল তাঁর স্বামীকে খাওয়ানো—যদিও রাঁধতেও পারেন না, পরিবেশনে আরো অক্ষম, টেবিলের অপর প্রান্তে বসে রাঁধুনিকেই সব সাজিয়ে দিতে বলেন, যেন দেবতার সামনে নৈবিদ্যি দিচ্ছেন, আর বেশ খানিকটা সময় ধরে অম্বর যখন টেবিলে বাঁ কনুই রেখে একটির পর একটি পদ খেয়ে যান, তখন সুপ্রভা অপলক চোখে তাঁর খাওয়া দেখেন, আর এটা-ওটা নিতে অনুরোধ করেন। নাঃ, সেই তরুণী বয়সে অম্বরকে যে তিনি দেবতা মনে করতেন, নিঃসন্দেহে তার কিছুটা এখনো রয়ে গেছে। কে বলে দীর্ঘকালের দাম্পত্যে সব নীরস গদ্য হয়ে যায়!

এই হল অম্বর চ্যাটার্জির প্রতিমা আর চালচিত্র। ভালোই, নয় কি? কিন্তু বছরে তিন-চার বার তাঁর সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসে। এবং রুটিন-মাফিক। এটা তিনি ঝেড়ে ফেলতেও পারেন না, গেলাও মুশকিল। সেটা হচ্ছে, বিভিন্ন মনোনয়ন-কমিটিতে তাঁর এক্স্-

পার্ট হওয়া। এটা কিছুতেই তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না, তবু যেতে হয়। গলদ্‌ঘর্ম হয়ে, না, ঠিক হল না, বলা উচিত অর্ধমৃত হয়ে যখন তিনি বেরিয়ে আসেন দুদিন বা কয়েক দিন পরে, তখন প্রতিবারই তাঁর মনে হয়, এবার নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষ রেহাই দেবেন বা তিনি রেহাই নেবেন, কিন্তু কোনোটাই হয়ে উঠে না। এটা বিপদ কেন? না, তিনি মনে করেন, এই-রকম ইনটারভিউ ব্যবস্থায় প্রকৃত উপযুক্ত প্রার্থীকে ছেঁকে তোলা যায় না, যেতে পারে না। তবু সেই অবাঞ্ছিত কাজের দায়িত্ব বাধ্য হয়ে নিতেই হয়। বিতিকিচ্ছি ব্যাপার।

এই ভাবেই চলছিল, হঠাৎ—এবারের বিপদটা খুব ভয়ংকর, মোটেই ছোটোখাটো নয়। কেন্দ্রীয়-সরকার-পরিচালিত এক কারিগরি সংস্থায় ডজন দশেক বিভিন্ন ক্যাটিগরির কর্মী নিয়োগ করা হবে, তার গোটা সাতেক মনোনয়ন কমিটিতে তিনি এক্স্-পার্ট নিযুক্ত হয়েছেন।

গেল মাস ছয়েক তাঁর কোনো ডাক আসছিল না। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতে শুরু করে-ছিলেন, বোধ হয় ফাঁড়া কেটে গেল। তারপর এই লার্জস্কেল বজ্রপাত! সর্বনাশ—কী হবে?

২.

পিএসসির চিঠি পেয়েই অম্বর চ্যাটার্জি হাঁক পাড়লেন, 'প্রতিভা, শোনো-শোনো, এই দেখো কাণ্ড…'

প্রতিভা রান্নাঘরেই ছিলেন, তদারকির জন্যও অন্তত তাঁকে সেখানে কিছুক্ষণ থাকতে হয়। 'যাই…', বলে যদিও সাড়া দিলেন, তবু তখনই আসতে পারলেন না। একটু পরে চটি টানতে-টানতে ঘরে ঢুকবার দরজার মুখে একবার দাঁড়ালেন চৌকাঠ ধরে, বোধ হয় একটু জিরোলেন, তারপর আর-একটু এগিয়ে বাঁ-দিকের সোফাটায়—সেটাই দরজার সবচেয়ে কাছে ছিল, নিজেকে বসালেন কষ্ট করে, 'কী ব্যাপার, অত ডাকাডাকি কেন…'

'এই দেখো, পিএসসি থেকে আমাকে ডেকেছে, এক্স্পার্ট হবার জন্য, যত্ত সব ঝামেলা…'

'ওমা, এই ক-দিন আগে তুমিই তো বলছিলে, সবাই তোমাকে ভুলে গেল নাকি। তা তোমাকে ডেকেছে, যাও। এতে ঝামেলার কী আছে…'

'ঝামেলার কী আছে? যা জান না তাই নিয়ে কথা বোলো না…'

'তুমিই তো আমাকে ডাকলে। তা না হলে আমি কি কথা বলতে এসেছিলাম? দেখো তো, তোমার ডাক শুনে ছুটে আসতেই হাঁপিয়ে গেছি…'

প্রতিভা ডাক শুনেই আসেন নি, ছুটেও আসেন নি, তবে সত্যি কথাটা এই যে হাঁপিয়ে গেছেন। আজ কাল নড়াচড়া করলেই হাঁপ ধরে।

অম্বরের অপ্রতিভ হবার কথা, কিন্তু তিনি রেগেই উঠলেন, 'আমার কথাগুলো কনট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে, তাই না? হচ্ছে হয়তো, না হয়ে উপায় আছে?' যে খামটা তিনি বিরক্তিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, সেটা আবার তুলে নিয়ে চিঠিখানায় চোখ বুলোতে-বুলোতে চলে এলেন স্ত্রীর কাছে—স্ত্রীর বিপরীত, বেশ স্মার্টলি চলাফেরা করতে পারেন—পাশে বসে পড়ে বললেন, 'দেখো, নিজের চোখেই দেখো। সাত-সাতটা কমিটিতে আমার নাম দিয়েছে। এতগুলো কখনো পারা যায়? তাছাড়া, এরনটিক্যাল এনজিনীয়ারিং, বিজনেস ম্যানেজমেনট, ওয়েল, আমি বায়ো-কেমিসট্রির লোক, এরনটিক্সের কী জানি, সেটা তোমার ছোটো ছেলে বরঞ্চ জানতে পারে। আর বিজনেস ম্যানেজমেনট, ওটা আমার সাত-পুরুষের ধাতে নেই। কী সব বিতিকিচ্ছি কাণ্ড বলো তো…'

'হ্যাঁ গো, তুমি কোন্ বিষয়টা না জান…' প্রতিভা হাসতে গেলেন, কিন্তু বিবর্ণ ফোলা গালে এখন আর হাসি আসে না, দু-একটা কুঞ্চনমাত্র দেখা গেল—'ওরা কি আর না জেনেশুনে ডেকেছে?'

'না জেনেশুনে ডেকেছে? এ কি আর তোমাদের সেই ইংলিশ চার্চ কলেজের অনার্স ক্লাশ যে তোমরা মেয়েরা আমার যা কথা শুনতে তাই মনে হত দৈববাণী? ওটাকে প্রেমে-পড়া বলে, পড়া-বোঝা বলে না…'

'সেসব বেশ মনে আছে দেখছি! আর কোন্ কোন্ মেয়ে তোমার প্রেমে পড়েছিল শুনি? বলতে খুব ভালো লাগছে, না?…'

'তাদের নাম মনে করে রেখেছি আর কী…এই তোমার বুদ্ধি! তোমার বুদ্ধিটা সেই অনার্স ক্লাশেই রয়ে গেছে…এমএসসি-তে যদিও বা ভরতি হলে, শেষ করলে না। অথচ কতবার আমি বলেছি, ওটা শেষ করো, রিসার্চে বোসো…'

'আহা, তুমি ততদিন অপেক্ষা করেছিলে? তার আগেই তো বিয়ে করে এনে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিলে, তাহলে?'

'আচ্ছা, হল। সবই আমার দোষ। এখন যে কথা হচ্ছিল, সেটার কিছু বলতে পার? এই যে বিজনেস ম্যানেজমেনটে আমাকে এক্‌স্‌পার্ট হতে বলেছে, তার মানে কী?'

'মানে আবার কী…অন্য রকম মানে আছে না কি?…'

'বিলক্ষণ আছে। ওদের লোক ঠিক করাই আছে, আমাকে সাক্ষীগোপাল করতে চায়…'

'ওমা, তাই না কি?'

'শুধু এই? এটা দেখো, শুধু আমার নামটাই তো দেখলে? কমিটিতে আর কে বা কারা আছেন, কিছুই উল্লেখ নেই। এ হচ্ছে আমাকে অন্ধকারে রাখা…কাদের সঙ্গে বসছি জানতেই পারছি না। হয়তো আমার ডানদিকে কোইম্বাটুরের বেঙ্কট পিল্লাই, আর বাঁ দিকে দিল্লির নাগেশ শর্মা…আর আমরা বিগ-বিগ এক্‌স্‌পার্টরা জান তো মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, যে যার নিজেকে নিয়েই আছি, কো-অর্ডিনেশন বলে কিছু নেই। আমি যাকে সিলেকট করব আমার মতে সে-ই বেস্‌ট ক্যানডিডেট, আর পিল্লাই যাকে সিলেকট করবে…আর, সিলেকট করার লোক আমাদের মনেই থাকে না কি? তুমিই বলো…' অম্বরের চোখ পিটপিট করতে লাগল, ইঙ্গিতে কিছু একটা বোঝাতে চাইলেন স্ত্রীকে।

সুপ্রভা সেদিক দিয়েই গেলেন না, এক হাত দিয়ে আর-এক হাত বেঁধে হঠাৎ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন তিনি, 'তাই নাকি? এ তো জানতাম না। তা তুমি বলে দাও না কেন যেতে পারবে না…যেখানে স'ত্যিকার সম্মান নেই, তোমার মতো লোককে শুধু লোক-দেখানোর জন্য ডাকা…'

'আরে, তুমি তো বেড়ে বলেছ…' অম্বর উৎসাহে স্ত্রীর পিঠে বেড় দিয়ে ধরেন।

'কাণ্ড দেখো…' সুপ্রভা কষ্ট করে পেছনে ঘাড় ফেরালেন, কষ্ট করে ঘাড় থেকে স্বামীর হাতটাও সরালেন, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলেন না, কোন্ কথাটা বেড়ে হয়েছে।—'কী বলছ তুমি?'

অম্বরের বলাবলি নেই, তিনি ততক্ষণে নিজের পড়ার টেবিলে গিয়ে—যেখানে একটু আগেই তিনি বসেছিলেন, ফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন। পেয়েও গেলেন নম্বরটা, ডাকলেন সেক্রেটারিকে।

'হ্যালো, কী বললেন, সেক্রেটারি নেই? আপনি কে? ও-কে। প্লীজ নোট ডাউন এ মেসেজ ফর হিম …ড. এ. চ্যাটার্জি স্পীকিং ·'

তা তিনি স্পীক করলেন, মনে যা ছিল। ফোন রেখে রিভল্‌ভিং চেয়ার ঘুরিয়ে স্ত্রীর দিকে মুখ করলেন, দু-হাতের আঙুল জড়িয়ে মটকাতে-মটকাতে। বললেন, 'দিলাম তো জবাব, কিন্তু ভারবালি রিফিউজ করে তো হবে না, আজই ইনসটিট্যুটে গিয়ে ফরমালি জানিয়ে দিতে হবে…কী কারণ দেখানো যায় বলো তো? হয়েছে…সিনস অব লেট আই হ্যাভ বীন কীপিং ইনডিফারেনট হেল্‌থ, আই সিনসিয়ারলি রিগ্রেট মাই ইনএবিলিটি টু সিট অন দ্য…'

সুপ্রভা হাঁই-হাঁই করে উঠলেন, 'থামো, ওসব অলুক্ষুনে কথা বোলো না তো, তোমার শরীর খারাপ। …কেন, স্ত্রীর অসুখ করেছে বলা যায় না?' বলে স্বামীর সুঠাম দেহের দিকে তাকিয়ে তাঁর দুচোখ করুণ হয়ে উঠল।

'এই দেখো, তোমাদের সংস্কারগুলো কিছুতেই আর গেল না। শরীর খারাপ, ওটা কথার কথা। কথা বললেই যদি কিছু হয়, সে তো তোমার অসুখ বললেও হতে পারে, নাকি…আচ্ছা-আচ্ছা, আর চোখ লাল করে ফেলতে হবে না, তাই হবে। শোনো, দু কাপ কফি বলে দাও তো, আর দুটো ওমলেট, বেশ জাঁকিয়ে তোমার সঙ্গে গল্প করা যাক, মন এখন দারুণ ফরসা…' বলে নিজের জানুতে থাপ্পড় মারলেন।

'ওমা, এই তো আধ ঘণ্টা হয় নি, চা খেলে, আবার কফি! আর এই বয়সে ডিম-টিমগুলো না খেলেই নয় কি, কখন এক-আধটা শখ করে খেলে, তা-না…'

'তুমি কি আমাকে গ্লাস-কেসের পুতুল বানিয়ে রাখতে চাও? বেশ, কফি খাব না, ওমলেট খাব না, তোমার সঙ্গে দুটো বেশি কথা বলতেও পারব না…'

তা বলতে না বলতেই, স্ত্রীর সঙ্গে রহস্যালাপ বন্ধ করতে হল। 'আমি আসছি…' বলেই একটি ছেলে সপ্রতিভ ভাবে ঘরে ঢুকল, ছেলেটি তাঁদের বড়ো ছেলের বন্ধু।

'ভালো আছেন মাসিমা?' পা ছুঁয়ে দুজনকেই প্রণাম করল ছেলেটি।

'এসো বাবা জয়ন্ত, ভালো আছ? রঞ্জু বেরিয়ে গেল কিন্তু, আধ ঘণ্টা আগে। বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? হ্যাঁ, বাবা, কী করছ তুমি এখন, ব্যাঙ্গালোরে তোমার পড়া শেষ হয়ে গেছে?…'

'একরকম হয়েছে, মাসিমা আবার হয়ও নি। সঞ্জু এর মধ্যে আসে নি, মাসিমা? সঞ্জু কিন্তু ওখানে প্রফেসর মহলে দারুণ নাম করেছে। ড. এস. পি. সিং তো ওকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসেন, তিনি বলেন, 'তোমরা বঙ্গালি ছেলেরা খুব ভালো আছ।'

অম্বর ভেতরে-ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন—জয়ন্ত তাঁর বড়ো ছেলেরই সমবয়সী এবং বন্ধু ঠিকই, কিন্তু ডাকতারি নয়, ব্যাঙ্গালোর থেকে এরনটিক্‌সের এনজিনীয়ার হয়ে এসেছে, কাজেই এটা স্বতঃসিদ্ধ যে সে প্রার্থী এবং নিজের জন্য তদবির করতে এসেছে। তাঁর ছোটো ছেলে সঞ্জয়ের সে তিন বছরের সিনিয়র।

তাঁর আরগুমেনটের লাইন ঠিক ছিল, কিন্তু যেখানটায় ভাবছিলেন, সেটা ঠিক নয়—একটু পরেই তা বোঝা গেল। জয়ন্ত এদিকে বলছিল, 'ড. সিং তো প্রায়ই সঞ্জুকে নিমন্ত্রণ করেন বাড়িতে, বলেন, রঘুবীর ওঅজ মাই ওনলি সান, নাও আই হ্যাভ গট টু সানস।' রঘুবীর আমার সঙ্গেই পড়ত, মাসিমা, ভালো ছেলে, আমি হয়েছিলাম ফার্স্ট ক্লাশ থার্ড, আর ওর পজিশন ছিল নাইন্‌থ, একটুর জন্যে ফার্স্ট ক্লাশ মিস করে…'

এরপর জয়ন্ত সোজা অম্বরকেই সম্বোধন করল, 'মেসোমশাই, আপনি পিএসসি-র এক্‌সপার্ট হয়েছেন শুনলাম, দারুণ ভালো হয়েছে…'

সতর্ক হয়েই ছিলেন অম্বর, এরপরই ওর কথাটা পাড়বে। বাছা, তুমি তো জান না, এইমাত্র আমি রিফিউজ করেছি। খেলাটা বজায় রাখার জন্য তিনি তখনই ভাঙলেন না, ওজন করে একটুমাত্র হাসলেন।

'মেসোমশাই, ড. সিংকে আপনি চেনেন? তিনি কিন্তু আপনাকে ভালোই জানেন, মনে করে রেখেছেন…'

'সম্ভব। বোমবেতে এক কমিটিতে আমরা এক-সঙ্গেই ছিলাম, দ্যাট ওঅজ ইন এইটিওআন, একবারই মাত্র…'

'মাসিমা, জিজ্ঞেস করছিলেন না, আমার পড়া শেষ হয়ে গেছে কিনা?…' একবার সুপ্রভার দিকে তাকিয়ে নিয়ে জয়ন্ত আবার অম্বরের দিকেই চোখ ফেরাল, 'আমি ড সিং-এর আনডারেই নাম রেজিস-ট্রেশন করেছি, আমাকে একটা স্কলারশিপ পাইয়ে দিয়েছেন। রঘুবীরও একটা স্কলারশিপ পেয়েছিল,

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, হীজ্‌ নট ফীলিং কোআইট কন্‌ফিডেনট, ও চাকরিতে ঢুকতে চায়। ড. সিং একেবারেই জানেন না, বাবাকে বলবার সাহসই নাই ছেলের, ও পিএসসি-র অ্যাপ্লিক্যানট হয়ে বসে আছে···'

'তাই নাকি। সবার তো আর রিসার্চের দিকে ঝোঁক থাকে না, চাকরি মন্দ কী···' নীরস কণ্ঠে বললেন অম্বর।

প্রতিভার মনে ছিল, স্বামী কফি চেয়েছিলেন, এখনো দেওয়া হয় নি। কষ্ট করে উঠলেন তিনি, রান্নাঘরের দিকে যেতে গিয়ে বললেন, 'জয়ন্ত, বাবা, চলে যেও না, আমি কফি পাঠিয়ে দিচ্ছি···'

ওমলেট-কফি পর্ব শেষ হল। ছেলেটিকে প্রতিভার বেশ লাগে, যাবার সময় বলে দিলেন, 'আবার এসো, জয়ন্ত, রঞ্জুর সঙ্গে দেখা হল না, ও থাকার সময় এসো···'

'আসব, মাসিমা···' এবারও দুজনকে প্রণাম করে ছেলেটি চলে গেল।

এখন একটু স্নেহবিগলিত হয়ে স্বামীকে কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু তাঁর মুখে ভ্রূকুটি দেখে থমকে গেলেন।

'কী হল?'

'তুমি মনে কর, জয়ন্ত তোমার রঞ্জুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ঝালাতে এসেছিল, মোটেই না···'

'তাই তো বলল। তবে কি চাকরির উমেদারি করতে? কিন্তু ও তো অ্যাপ্লিক্যানট নয়, তবে তুমি ওরকম ভাবছ কেন? ··'

'বুঝতে পারলে না? ব্যাপারটা তার থেকেও সিরিয়াস··' অম্বরকে সত্যিই একটু চিন্তিত মনে হল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে যেন কিছু একটা হিসেব মিলিয়ে দেখতে চাইলেন। স্বামীকে চিন্তিত দেখে প্রতিভারও মুখখানা শুকিয়ে উঠতে চাইল—'আহা, বলবে তো, না বললে কী করে বুঝব···'

ঠিক সেই সময় ফোন বাজল।

ফোনটা অম্বরের টেবিলেই ছিল, হাত বাড়ালেনও, কিন্তু না তুলেই স্ত্রীর দিকে তাকালেন—সে দৃষ্টিতে নারভাসনেস এবং জিজ্ঞাসা: তুলব?

এখন, অম্বরের সব কথা প্রতিভা বুঝুন আর না বুঝুন—তা ছাড়া, সোহাগী স্ত্রীদের বলতেও ভালো লাগে, তোমার মতো অতশত বুঝি নে, বাপু—তবু এই মুহূর্তে বুঝলেন, স্বামী বিপন্ন।

'দাঁড়াও, আমি ধরছি···' প্রতিভা তাঁর বাতের ব্যথা ভুলে গেলেন, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সোফা ছেড়ে স্বামীর টেবিলে এলেন এবং যথারীতি হাঁপিয়েও এই উঠলেন, 'হ্যালো, কে বলছেন?···'

'রাইটারস্‌ থেকে মিনিসটার চক্রবর্তীর পি. এ. বলছি। তিনি ড. চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলতে চান। তাঁকে দেবেন একটু?'

'কে মিনিসটার চক্রবর্তী?···'

'অনবল্‌ মিনিসটার ফর ফিশারিজ অ্যানড হাসব্যানড্রি শ্রী পি. কে. চক্রবর্তী···'

'ও, কিন্তু উনি তো এখন বাড়ি নেই, আমাকে বলবেন?···'

অম্বর হাঁ-হাঁ করে উঠতে গেলেন, কিন্তু প্রতিভা চোখের ইঙ্গিতে থামালেন স্বামীকে। ওদিকে একটু বিরতি, বোধ হয় মিনিসটার এবং পি. এ.-র কথা হল। এবং লাইনের ও-মুখে ব্যক্তিরও পরিবর্তন হল।

'হ্যালো, মিসেস চ্যাটার্জি বলছেন? কেমন আছেন? ··আপনি আমাকে মনে করতে পারছেন তো?···'

প্রতিভার যেন রূপ বদলে গেছে, তিনি সমানে তাল রেখে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। যোগও করলেন, 'আপনি ভালো আছেন?'

'ভালো আর থাকতে পারি? মিনিসটার হয়ে অবধি মাথার ওপর ডিমক্লিসের খাঁড়া ঝুলছে। আচ্ছা, অম্বরকে কখন পাওয়া যাবে বলুন তো·· এক ঘণ্টা পরে? আচ্ছা, আমি ওকে আবার ডাকব···দাঁড়ান-দাঁড়ান, এক ঘণ্টা পরে থাকব কিনা ঠিক নেই, ওকে দুপুরে ইনসটিট্যুট থেকে আমাকে ধরতে বলবেন? বেলা একটা থেকে একটা পনেরো···তারপরই আবার আমাদের ক্যাবিনেট মিটিং আছে কিনা···আচ্ছা-আচ্ছা, থ্যাঙ্ক ইউ···'

ফোন ছাড়লেন প্রতিভা, রাগে তাঁর বিবর্ণ মুখও লালচে হয়ে উঠেছে।—'তোমার বন্ধু গো···প্রভাত চক্কোত্তী, ঠিক ওর কোনো শালা বা ভাগ্নে ক্যানডিডেট, আমাকে আর বলে দিতে হয় না। তোমার বন্ধু, মিনিসটার হয়ে পায়া ভারী হয়েছে, এখন আর পোঁছে তোমাকে? আমাকে আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কেমন আছেন? আমি অমনি ভুলছি আর কি! খবরদার তুমি ওকে রিং কোরো না। জান, কী চালিয়াত হয়েছে তোমার বন্ধু ··প্রথমে বলল, সে-ই রিং করবে, কিন্তু মিনিসটারের ডাঁট আছে তো আবার, দুবার ফোন করবে তোমাকে? তাই বদলে বলল তোমাকে রিং করতে···কী, মাথা নাড়ছ যে, তুমিই ফোন করবে নাকি?'

অম্বর বললেন, 'আরে না, ওকথা না·· আমি ভাবছি কি, পিএসসি-র সেক্রেটারিকে আবার আমার ফোন করতে হবে। এক্‌স্‌পার্ট না হলে খুবই ভুল হবে, জান···না হলে···'

'তা কেন, তোমার ইচ্ছে যখন নেই। আর, একবার তুমি না বলে দিয়েছ···আমি কিছু বুঝছি না···'

'শোনো শোনো, তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। রঞ্জুর বন্ধু জয়ন্ত এসেছিল। তুমি ভাবছিলে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে, মোটেই তা নয়। সে নিজের জন্য আসে নি, সেটা ঠিক, এসেছিল তার রিসার্চ-গাইড ড. সিং-এর ছেলে মহাবীরের জন্যে। ড. সিং জানেন না বলল তো, ওটা ধাপ্পা, মিনিসটার প্রভাত যেমন ধাপ্পা দিল এক ঘণ্টা পরে থাকবে কিনা ঠিক নেই··· ধাপ্পা কেন বুঝলে না, সে চাইছে আমার টাইম সে মানবে কেন, তার টাইম আমাকে মানতে হবে, আই মাসট কন্‌ফরম, টু হিজ অ্যাপয়েনটেড আওয়ারস্‌। যাক সে কথা, ড. সিং-এর ছেলে···জানো, এর সঙ্গে তোমার ছোটো ছেলে সঞ্জু জড়িত···'

'ওমা, সঞ্জু আবার এর মধ্যে আসছে কী করে?···' প্রতিভা এটা সত্যিই বুঝতে পারলেন না।

অম্বর হাসতে গেলেন, কিন্তু তাঁর মুখখানা করুণ হয়ে উঠল, 'আসছে এইভাবে: জয়ন্তর মারফত ড. সিং আমাকে বলে পাঠালেন, অবশ্য অকথিত এবং অলিখিত বার্তায়, ড. চ্যাটার্জি, তুমি মনে রেখো, তোমার ছেলে যতই ব্রিলিয়ানট হোক, এবং আমি বঙ্গালি ছেলেদের যতই ভালোবাসি না কেন···যদি আমার ছেলে মহাবীরকে তুমি না দেখ, ওয়েল, তোমার ছেলেকে ফাইন্যালে পজিশন নিয়ে এখানে পাশ করতে হবে, তারপরও তার রিসার্চের প্রয়োজন হবে···'

'ওমা, তাই তো···'

'প্রতিভা, তোমার ছোটো ছেলে ছাড়াও বড়ো ছেলে আছে এখানে, মেয়ে কানপুরে। কে জানে তাদের কখন দরকার হবে। আমার বিশ্বাস সেসব জায়গা থেকেও আমাকে ধরবে ঠিক। তারপর এই প্রভাত, মিনিসটার···আমি জানি না তাকে ফোনে ডাকব কি না, ডাকব নিশ্চয়ই, আমি জানি না কার জন্যে সে বলবে·· কিন্তু দেখো, আর এক বছর পরে আমার বস ড. সেন রিটায়ার করছেন, তখন আমার ডিরেকটর হওয়ার কথা তো? তারপরও, বিয়নড সিক্‌স্‌টি এক্‌স্‌টেনশন আছে, মিনিসটারের হাতে আমাকে পড়তে হবে না?···'

ফুলে-ওঠা বেলুন চুপসে গেলে যেমন হয়, প্রতিভার অবস্থা ঠিক তেমনি দাঁড়াল, 'ওমা, কী হবে তাহলে?' প্রতিভার কত গর্ব, তাঁর স্বামী আর পুত্রকন্যাদের নিয়ে। তাঁর কাছে স্বামী তো তুলনাহীন বটেই, সেই তরুণী কাল থেকে আজও তিনি প্রেমমুগ্ধ, আর ছেলেমেয়েরাও এক-একটি রত্ন। নিজের গুণেই তারা পথ কেটে বেরোচ্ছে, বেরোতে থাকবে এক-একটা

খোলস ভেঙে-ভেঙে, তারপর একটি করে প্রতিষ্ঠাভূমি পাবে, এটাই ছিল তাঁর ধারণা।

অম্বর বলছিলেন, 'এ কী রকম জান, ঠিক একটা মাকড়সার জালের মতো। আমরাই বুনেছি সেই জাল। তবে মাকড়সার জালের সঙ্গে পার্থক্য এই যে গোটা জালটাই একটা মাকড়সার, আর আমাদের জালের এক-একটা গিঁঠে আমরা এক-একজন। গিঁঠগুলো আমাদের তৈরি, আবার আমাদের অবলম্বন, যদি রাগ করে একটা গিঁঠ ছিঁড়ে দিই, তাহলে সমস্ত জালটাই ছিঁড়ে পড়বে না?…'

অম্বর বললেন না, তাঁদের জালটা মোটেই মাকড়সার জালের মতো পলকা নয়, বজ্রকঠিন—যার বেষ্টনী ভেদ করে নীচের তলা থেকে কোনো মানুষই উঠতে পারবে না, উপরন্তু মুহূর্মুহু ওপর থেকেই মানুষ বাঁধন আলগা হয়ে নীচে গলে পড়ে যাচ্ছে। খুব সাবধানে আঁকড়ে থাকতে হবে, আবার তারই মধ্যে নিজেদের চালাচালি করতে হবে।

প্রতিভা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আবার ফোন বাজল। এটা অম্বর নিজেই ধরলেন—ওদিক থেকে বলছেন পিএসসি-র সেক্রেটারি শ্রীরামন। ইংরেজিতেই কথাবার্তা হল।

'আমার জন্য একটা মেসেজ রেখেছিলেন, পেয়েছি। নিশ্চয়ই গুরুতর কারণে আপনি কমিটিতে বসতে পারছেন না, আই সিনসিয়ারলি রিগ্রেট ইট। কিন্তু স্যার, ওটা ইন্ রাইটিং আপনাকে পাঠাতে হবে…'

সর্বনাশ! বেটা বলে কী। অম্বর আমতা-আমতা ভাব একেবারেই ছেড়ে দিলেন। 'আই সিনসিয়ারলি রিগ্রেট'—অম্বরের বুঝতে অসুবিধে হল না, বেটা মনে-মনে বলছে, 'আই হার্টিলি রিজয়েস ইন ইট'—বেটা এক্ষুনি নিজের তাঁবেদার কাউকে কমিটিতে বসিয়ে দেবে। তাড়াতাড়ি বললেন, 'ও নো, দেআর ওজ সাম মিসটেক। আই অ্যাম গ্ল্যাড টু ইনফরম্ ইউ অ্যাবাউট ইট, প্লেট থিংস স্ট্যানড অ্যাজ দে অ্যার…'

একটু নীরবতা। বোধ হয় শ্রীরামনের এটা পছন্দ হল না, তাঁকে ঠেলে ফেলার একটা সুযোগ ফসকে গেল। পরক্ষণেই মধুপিছল কণ্ঠে শ্রীরামন বললেন, 'ও, আই অ্যাম মাচ রিলিভড্। ইট জাসট পেইন্ড্ মী দ্যাট এ পারসন অব ইয়োর স্কলারশিপ অ্যানড স্ট্যাটাস…উই অয়্যার গোয়িং টু মিস ইউ। নাউ ইট্স্ অল সেট্‌লড…'

ওঃ, কী নির্মম আর মধুময় সত্য—ভারি মনোরম খেলা। আমি পণ্ডিত, তুমি পণ্ডিত, সে পণ্ডিত—প্রমাণ? এসো, তুমি আমাকে পণ্ডিত বলে সোচ্চার হও—সেমিনারে পিরিয়ডিক্যালে বেতারে দূরদর্শনে সংবাদপত্রে—ওগুলো আমাদেরই গড়া আমাদেরই জন্যে। আমিও তোমার জন্য ঠিক একই জিনিস করব। রেসিপ্রসিটি—পারস্পর্য।

৩

বেশ উৎসাহের সঙ্গে তো রাজি হয়ে গেলেন অম্বর, বলা উচিত না-রাজি ভাবটাকে কাটিয়ে উঠলেন, কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠতে লাগল। পেড়ে-ফেলা একটা কেঁচো কিংবা আরসোলাকে খুদে-খুদে পিঁপড়েরা যেমন ঝাঁক বেঁধে ধরে, এও হল তেমনি। মনোনয়ন কমিটিতে এক্স্পার্ট নিয়োগ কন্‌ফিডেনস্যাল ব্যাপার, কিন্তু সবাই কী করে যে সব খবর জেনে যায়। কি ঘরে কি ইন্‌স্টিট্যুটে, কোথাও আর অম্বরের নিভৃত থাকবার উপায় রইল না।

তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় একরকম বিপর্যস্তভাবে বাড়ি ফিরে অম্বর এলিয়ে পড়লেন, প্রতিভার দেওয়া কড়া কফিও আর তাঁকে চাঙ্গা করে তুলতে পারল না। বললেন, 'দেখো, প্রতিভা, এর থেকে সেই প্রথম বয়সের দিনগুলো অনেক ভালো ছিল। তোমাদের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতাম, তোমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতে…আর এই বিখ্যাত হয়ে কী হল। তখন

নিজের পড়াশুনো নিয়ে থাকতে পারতাম, আর এখন অন্যের বিচার পরখ করা…তাও কি পরখের কথা কেউ বলছে? দরখাস্তেই কেবল সেটা লেখা থাকে… উপযুক্ত বিবেচিত হলে…আর কার্যত? পুরো তিনটে দিন কাটে নি, এর মধ্যে কত লোককে যে আমার বলতে হয়েছে, নিশ্চয়ই, এই প্রার্থীর তো দারুণ যোগ্যতা আছে, কিংবা নিশ্চয়ই দেখব, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা আর বলতে…'

'বেশ তো, তাই বলেই কাটিয়ে দাও। ওখানে সবই তো তোমাদের হাতে থাকবে, তোমরা বেসট ক্যানডিডেট বেছে নেবে…'

'বেশ বলেছ। ইতিমধ্যে যারা আমাকে ধরে পড়েছে, আর যাদের মামুলি হলেও আশা দিয়ে যাচ্ছি, তারা নেকড়ের মতো আমার গলা কামড়ে ধরবে না? কাকে তুমি অফেনড করে বসবে, তার ঠিক কী?…'

'এক কাজ করলে হয় না, চলো আমরা দুজনে কোথাও চলে যাই, যেখানে তোমাকে কেউ খুঁজে পাবে না। ইনটারভিউয়ের তো এখনো দিন দশেক বাকি, সেদিন সময়মত হাজির হলেই চলবে…'

বলা শেষ হল না, অম্বর একরকম লাফিয়ে উঠলেন, 'আরে, আরে, তুমি তো বেড়ে বলেছ…' হাঃ-হাঃ করে হেসে উঠলেন তিনি, অস্থির আনন্দে পায়চারি করতে লাগলেন, ঘাড়ও নাড়লেন দু-একবার, 'ঠিক, তোমার বুদ্ধি ঠিক খেলেছে…আচ্ছা, বলো তো, কোথায় গাঢাকা দেওয়া যায়?'

তা সে বিষয়ে একটা প্ল্যান তাঁরা মোটামুটি খাড়া করে ফেললেন। এ ব্যাপারে প্রতিভা এতটাই সহধর্মিণী হয়ে উঠলেন যে, অম্বরের তাক লেগে গেল, এমনি যে, 'তুমি কিছুই বোঝ না' এই প্রিয় বচনটি অম্বর আর প্রয়োগ করতে পারলেনই না। উলটে কয়েকবারই স্ত্রীর বুদ্ধির তারিফ করলেন। অম্বর একাই যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিভা কিছুতেই ছাড়লেন না।—'না-না, তাহলে তুমি যা-তা খাবে, সে হবে না…'। আর অম্বর—মুখে যতই বলুন, সত্যি কথা বলতে কী, স্ত্রীকে ছেড়ে একলা কোথাও বেশিদিন থাকা—তাঁর বীর হৃদয় কুঁকড়ে যাচ্ছিল।

এরপর প্ল্যান-মাফিক কাজ করার পালা। দশ-দিন ইনস্‌টিট্যুটে যেতে পারবেন না, জানালেন ডকটর সেনকে—তাঁর অনেক ছুটিছাটা পাওনা ছিল, কোনো অসুবিধে হল না। পিএসসি-র সেক্রেটারিকে চিঠি লিখলেন, কয়েকদিন তিনি একটু বাইরে যাচ্ছেন, একেবারে ইনটারভিউয়ের দিন তাঁকে পাওয়া যাবে। সেদিন সাড়ে ন'টায় গাড়ি পাঠালেই চলবে।

প্রতিভার মাসতুতো বোনেরা পুরী বেড়াতে গিয়ে-ছিলেন, তাঁদের ফ্ল্যাটটা পেতে অসুবিধে হল না। কেবল রাঁধুনিকে নিয়ে গেলেন। নতুন পরিস্থিতি—বেশ উৎসাহ নিয়ে শুরু তো করলেন। প্রথম-প্রথম বেশ স্বচ্ছন্দে চলল। সমস্যা হল বাইরে বেরোনো—দূর প্রান্তে হলেও শহরটা তো একই। অন্তত বাজারটা করতে হবে, চাকর আনেন নি, কে কখন দেখে ফেলবে, আর চিনে যে ফেলবে তাতে আর আশ্চর্য কী। বিখ্যাত হওয়ার মুশকিল আছে।

অম্বর বললেন, 'দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি…'

কী ব্যবস্থা, না, সন্ধ্যার পর বাজার করতে আরম্ভ করলেন, বেরোলেন ধুতি-পানজাবি পরে। পারলে মাথায় একটা চাদর জড়িয়ে নিতেন, কিন্তু এখন কিনা মার্চ মাস, সেটা আর সম্ভব হল না। তাতেই বা কী, স্ত্রীকে বললেন, 'শেভ করা ছেড়ে দিচ্ছি, জান তো আমার দাড়ি কত তাড়াতাড়ি গজায়, দুদিনেই জঙ্গল হয়ে উঠবে…আর শোনো-শোনো, একটু কাজল দিও তো, দেখব কার সাধ্য চিনতে পারে… কেন, কাবুলি পুরুষেরা চোখে সুর্মা টানে না?'

প্রতিভার হাসি আসে না, তবু টেনে-টেনে হাসতে লাগলেন, 'মাগো, মা, এতও তোমার মাথায় আসে…'

সুতরাং ছদ্মবেশের এই নতুন আয়োজনের পর্বটা বেশ ভালোই কাটল, কিন্তু তারপরই উলটো প্রতি-

ক্রিয়া শুরু হল, কিছুই ভালো লাগে না। প্রথম শারীরিক দিক দিয়ে। প্রতিভা যথারীতি তাঁকে খাইয়ে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু নড়াচড়া নেই, ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হয়, কাজেই গা-হাত ব্যথা করে, বায়ুর প্রকোপ দেখা দেয়, অম্বলে গলা জ্বালা করে। দ্বিতীয়ত, যদিও কিছু বইপত্র এনেছেন, কিছু মোটেই পর্যাপ্ত নয়, একটা টপিক অনুসরণ করতে গিয়ে অন্য বইয়ের দরকার হয়, নিজের বা ইন্‌স্টিট্যুটের লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারছেন না। বিরক্ত হয়ে বলেন, 'প্রতিভা, এসো, তাস খেলা যাক···'

স্বামীর অসুবিধা প্রতিভা খুবই বোঝেন, তিনি প্রস্তাব করেন, "হ্যাঁ গো, আমাকে একটু পড়াও না, সব তো ভুলে বসে আছি···'

'আর আমিই যেন সব মনে করে রেখেছি। আচ্ছা, ধরে নেওয়া গেল, মাথায় সব সাজানো আছে। তা, তুমিই বলো কী তোমার জানার আছে···'

প্রতিভা বিপদে পড়লেন, কী যে তাঁর জানার আছে, সেটাই তিনি জানেন না। কিন্তু স্বামী কিনা উৎসুক হয়েছেন, তাঁকে আবার বিমনা হতে দেওয়া যায় না, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করছেন, যেন কত ভেবেচিন্তে প্রশ্নটা বের করেছেন, 'আচ্ছা, কমপিউটার কী গো? আজকাল কাগজে এত হৈচৈ কেন, কেউ বলছে কমপিউটার ভালো, কেউ বলছে, না, চলবে না···'

'কমপিউটার? আমি বায়ো-কেমিসট্রির লোক তুমি ভুলে যাচ্ছ···'

'আহা, তুমি যেন ওসব জান না! তা ছাড়া, আমার মতো মুখ্যুকে বোঝাতে কামান-টামান আনতে হবে না....'

'হল, আনব না। কমপিউটার মানে হচ্ছে ক্যালকুলেটর, গণবার যন্ত্র···যন্ত্রটা খুব ছোটো হতে পারে, ধরো, এই টাইপরাইটারের মতো, আবার একটা গোরিলার মতো বড়োও হতে পারে। তখন তাকে একটা হিমঘরে রাখতে হয়, তা না হলে ভদ্রলোকের

মাথা গরম হবার জোগাড়, আর মাথা গরম হলে সূক্ষ্ম কাজ-টাজ করতে পারে না, এই তোমার প্রিয় স্বামী ড. চ্যাটার্জির মতো আর কী, হাঃ-হাঃ ·'

প্রতিভা মুখ মুড়লেন, 'এমা, তোমার আবার মাথা-টাথা গরম হল কবে! নাও, যা বলছ বলো....'

'আচ্ছা-আচ্ছা, শোনো, যন্ত্রটা নেহাত যন্ত্রচালিত হতে পারে, বৈদ্যুতিক, কিংবা ধরো, ইলেকট্রনিক হতেও পারে···

'ইলেকট্রনিক কী গো···'

'ওটা হচ্ছে স্রেফ ফাঁকা দিয়ে, কি গ্যাস, কি সেমি-কনডাকটর দিয়ে বিদ্যুৎ-পরিবাহের বিজ্ঞান, তোমাদের অত সাধের টি-ভি গো···আচ্ছা, ওটা তুমি জানতে না? আর প্রতি কথায় এটা কী ওটা কী বললে কমপিউটার বলব কী করে?···'

স্বামীর ভ্রূকুটি দেখে প্রতিভা বললেন, 'আচ্ছা-আচ্ছা, কমপিউটার নিয়ে বলো···', মনে মনে ভাবলেন, আর বাধা দেবেন না।

'দেখো, কমপিউটারকে বললাম তো ক্যালকুলেটর, কিন্তু দুই আর তিনে যোগ করে পাঁচ হল—এইরকম গণনা নয়, ওর মাথা অনেক অনেক জটিল জিনিস নিয়ে কাজ করে। ওকে অনেক অঙ্ক দিলে, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ···আর কমপিউটারের দারুণ মেমারি, ও মুহূর্তে রেজাল্ট জানিয়ে দিল। শুধু অঙ্কই নয়, নানা বিষয়ের গোছা-গোছা আইটেম দিয়ে দিলে ওর সামনে—কিংবা, আরো এগিয়ে যাও, আজকাল কোনো একটা উৎপাদন-প্রক্রিয়ার এত ভাগ আর উপবিভাগ, সে একটা অরণ্য, ও ঠিক পথ খুঁজে দেবে সেই অরণ্য থেকে। শুধু তাই নয়, সংগঠনের এক অঙ্গের সঙ্গে আর-এক অঙ্গের প্রিসাইজ রিলেশন কী, তার কো-অর্ডিনেশন···'

'ওরে বাবা, আমার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করেছে, তোমাদের কমপিউটার একটা দৈত্য-দানা বল, যা চাইবে তাই এনে হাজির করে দেবে···'

'এমন কি কমপিউটার বলে দেবে ডকটর

চ্যাটার্জির মতো এক্‌স্‌পার্টের প্রয়োজন আছে কি নেই, হাঃ-হাঃ···'

প্রতিভা চাইছিলেন স্বামীকে প্রফুল্ল রাখতে, এভাবে প্রাণ খুলে হাসতে দেখে তাঁর মনে হল অন্তত সে ব্যাপারে তিনি সফল হয়েছেন।

প্রায় সন্ধ্যায় স্বামীর সঙ্গে বসে তিনি গল্প-সল্প করেন, নিজে কিছু বলেন, স্বামীকেও বলান, দ্বিতীয়টাতেই তিনি খুশি হন বেশি। আজকাল অম্বরের খুব অম্ল আর গ্যাস হচ্ছে, বদলে-বদলে অ্যানটাসিড খাওয়াচ্ছেন। তবে তাঁকে একটু যে কম খাওয়াবেন, বা লঘুপাক খাবার দেবেন, সেটা তাঁর মনে আসে না, চানও না।

ইনটারভিউএর দু-এক দিন আগে এইরকম সান্ধ্য আসরে অম্বর বললেন, 'জান, আজকাল ভালো ঘুম হচ্ছে না, উদ্ভট সব স্বপ্ন দেখছি, তার মধ্যে নাইট-মেয়ারও আছে···'

এটাতে প্রতিভার চিন্তিত হবার কথা, হলেনও। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, 'একদিন তোমাকে চিৎকার করে উঠতে শুনলাম···ডাকতারকে বলব?'

'এই দেখ, ভয় পেয়ে গেলে তো? শুধু দুঃস্বপ্ন নয়, অদ্ভুত সব আইডিয়াও আসে। একদিন তোমাকে কমপিউটার নিয়ে বোঝাচ্ছিলাম, মনে আছে? স্বপ্ন দেখছি, এক লেকচার থিয়েটারে কমপিউটারের শ্রাদ্ধ করে বক্তৃতা দিচ্ছি, ঘন ঘন হাততালি পড়ছে। মজার ব্যাপার কী জান, আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছে···কারা জান? ছাত্র-টাত্র তো আছেই, বড়ো বড়ো বিজনেস ম্যাগনেট, ইনডাস্ট্রিয়ালিসট, আর গরিব-গুর্বোরাও। দেখছি কী। কতকগুলো ঠেলাবালা তাদের ঠেলা নিয়েই হলে ঢুকেছে, সেগুলোকে ঠেলে একবার এদিকে নিয়ে আসছে, আবার ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর সে কী হাততালি···আমার বক্তৃতা শুনে, নাকি, ঠেলাবালাদের নিয়ে মজা পেয়ে···'

শেষ হল না, প্রতিভাই মজা পেয়ে হাসতে লাগলেন, 'মাগো মা, সত্যিই অদ্ভুত স্বপ্ন তো···'

'শুধু এই? বলছিলাম কী জান, আমাদের দেশে সায়েন্সের মাথামুণ্ডু নেই, গোঁ ধরে এদিকে চলছে তো ওদিকে হটছে। এই যে কমপিউটার, সায়েনস অ্যানড টেকনলজি···তা মানুষের প্রয়োজনে কমপিউটার, না কি, কমপিউটারের প্রয়োজনে মানুষ···শোনো, শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে অনেকক্ষণ আইডিয়াটা নিয়ে ভেবেছিলাম। তা কথাটা ঠিক, আমাদের দেশে ঠেলাবালা আর বিজনেস ম্যাগনেট পার্শ্ববিন্যস্ত, ঠিক যেন ফাইভ স্টার হোটেল আর তার পাশেই বস্তি। ঠেলাবালাকে উঠিয়ে তবেই তো আমরা কমপিউটার যুগে প্রবেশ করব···আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানচর্চা আর তার প্রয়োগ, এ সবই হচ্ছে অমূল তরু, ডালপালা আছে, দু-চারটে ফুল-ফলও আছে, কিন্তু সব ওপরে-ওপরে সাজানো, মাটির ভেতরে শেকড়ও নেই, সেখান থেকে রসও টানছে না।···'

'ও, তাই তো,···' বললেন প্রতিভা, কিন্তু অম্বরের বুঝতে বাকি রইল না, প্রতিভা কিছুই বোঝেন নি। কিন্তু যেটা বুঝেছেন, পরক্ষণেই সেটা তিনি বললেন, 'দেখো বাপু, শোবার সময় খালো মনটন নিয়ে শোবে তো, ওসব দুঃস্বপ্ন দেখো না···'

'আচ্ছা, স্বপ্ন দেখা কি মানুষের হাতে!···' অম্বর হেসে উঠলেন এবং ইনটারভিউএর দিন পর্যন্ত একই ভাবে স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্ন দেখতেও লাগলেন।

8

ইনটারভিউএর দিন বেরোবার মুখে প্রতিভা বললেন, 'দাড়ি-টাড়িতে তোমাকে আর সত্যিই চেনা যায় না, বাপু। আজই তো ইনটারভিউ, সকালে কামিয়ে-টামিয়ে নিলেই তো পারতে···'

আজ অম্বর বেরোচ্ছেন তাঁর অভ্যস্ত শার্ট-ট্রাউজার পরে, তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রীর কথাই সত্য বলে মনে হল। বললেন, 'এটাই ভালো, রাস্তাতে

কে পাকড়াও করবে। আর কমিটিতে ইনকগনিটো থাকারও সুবিধে, আমরা কমিটি মেমবারেরা পরস্পরের ওপর চাপ দিয়েই থাকি…'

ফ্ল্যাট থেকে নীচে নেমে কারে ঢুকবার মুখে চালককে বললেন, 'ওহে, একটু স্পীডে চালিয়ে নাও তো…'

সামনে চালকের সঙ্গে আরও একজন ছিল, তারা দুজনেই বলল, 'ইয়েস, স্যার…'

ওরা স্পীডের ওপর গাড়ি তো চালালই, মনে হল একটু ঘুরপথও নিল। ঘুরপথটা অম্বর যে দেখে বুঝলেন তা নয়—গাড়িতে উঠে একটা জারনালের পাতা ওলটাতে শুরু করেছিলেন, দৃষ্টি সেখানে রেখেও রাস্তাঘাটের যতটুকু আউটলাইন পাওয়া যায় সেটাই। গাড়িটাতে একটুও ঝাঁকানি নেই। আচ্ছা—একবার তাঁর মনে হল—আজকে কি যানজটও নেই? শহরের ভোল বদলে গেল নাকি!

তাঁদের গাড়ি হুশ করে এক ভবনের চত্বরে ঢুকল। গাড়ি থামার পর ভাবলেন, সামনের ওরা নেমে দরজা খুলে দেবে, দিল না কিন্তু। তা না দিক, তিনি নিজেই সেটি করলেন এবং স্মার্টলি বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে।

ক্যাজুয়্যাল চোখে অম্বর চ্যাটার্জি একবার এপাশে-ওপাশে চোখ বুলিয়ে আনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ইনটারভিউএর ভেন্যু চেনজ করেছে না কি?'

'ইয়েস, স্যার…' বলেই কিন্তু ওরা গাড়ি ঘুরিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেল, বোধহয় আর কাউকে আনতে যাচ্ছে।

এক লহমার দৃষ্টিপাতেই বোঝা যায়, বিরাট চত্বর—মূল বাড়িটাও খুব বড়ো। সীমানা-দেয়ালটাও খুব উঁচু, তবে বরাবর সেটা দৃশ্যমান নয়। কিছু দূর ছাড়া-ছাড়া একটা করে শেড বা চালা নেমেছে, সেখানে অনেক ছেলে-ছোকরার ভিড়। এইরকম প্রতি চালাতেই ছেলেরা জট বেঁধেছে, মেয়েরাও আছে। এসব দেখলেন কি দেখলেন না, অম্বর চ্যাটার্জি তাঁর সদ্য-গজানো দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে বাড়িটার মূল দরজার দিকে এগোলেন। তিন ধাপ সিঁড়ি, বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠলেন—স্মার্টনেস অ্যানড এজিলিটি—সেমিনার বা কনফারেন্সে গেলে প্রতিবার এইরকম ভঙ্গি করতেই তিনি অভ্যস্ত। নীচের তলায় যতটুকু চোখে পড়ল, অনেকগুলো ঘরই বন্ধ, কেবল সিঁড়ির ঠিক পাশের ঘরটাতে দুজন পুরুষ একজন মহিলা একটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। গতির বেগেই দশ-দশ কুড়ি ধাপ সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন অম্বর, বুঝি বা একটু হাঁপ ধরল। নাঃ, এতটা জোরে সিঁড়ি ওঠা আর চলে না, বয়স হচ্ছে তো। এই তো—সামনেই একটা বড়ো হল, দেয়ালে-দেয়ালে চার্ট টাঙানো। বিরাট টেবিলের ওপর কিছু কাগজ-পত্র, দুটি মেয়ে চটপট সেই টেবিল মুছে পরিষ্কার করছে—পরিষ্কার করছে কিন্তু নোংরা ছিল বলে তো মনে হয় না। 'আর সব কোথায়?…' কথাটা চকিতে মনে হল অম্বরের, ঘড়ির দিকেও তাকালেন, অনেক আগেই এসেছেন নাকি? কই না তো, দশটা বাজতে মাত্র দু মিনিট বাকি—তবে?

অগত্যা হলে ঢুকে কায়দা করে বললেন, 'বেগ পার্ডন…', কিন্তু মেয়ে দুটি তাতে একটু চকিত হল যেন, মনে হয় এইরকম সম্বোধনের সঙ্গে তারা পরিচিত নয়। একজন জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবেন?'…'

'এখানে আজ পিএসসি-র ইনটারভিউ আছে না?'

'ইনটারভিউ? না তো…'

অন্য জন তাকে শুধরে বলল, 'আপনি কি সেলফ-সিলেকশন মীট-এর কথা বলছেন? সেটা নীচে চত্বরে হচ্ছে, এক ঘণ্টা আগেই আরম্ভ হয়েছে…'

ব্যাপারটা একটু গোলমেলে মনে হল অম্বরের। বললেন, কণ্ঠস্বরে যতটা সম্ভব নিস্পৃহভাব এনে, 'এখানে তাহলে কী হবে?…'

'কী হবে? কেন, এখানে এইমাত্র একটা স্বনিয়োগ

পরীক্ষা হয়ে গেল। পাঁচজন ভাষা-শিক্ষক দরকার স্কুলের জন্য। ওই দেখুন আলমারিতে…পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ আর মহিলা খাতা জমা দিয়েছেন…এক ঘণ্টা পরে তাঁরা আবার আসবেন, তখন মিলিয়ে দেখা হবে…'

অম্বর তৎক্ষণাৎ বুঝলেন, ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন তিনি। কিন্তু চৌকোশ মানুষ, জীবনে কখনো বেকুব হন নি, তাই সামলে নিয়ে বললেন, যেন ঠিক এইটের জন্যই এসেছিলেন এইরকম একটা ভাব নিয়ে—'প্লীজ, ওই যে খাতা বলছেন, সেটা কী? আর স্ব-নিয়োগ…'

'একটা প্রবন্ধ লিখেছেন ওঁরা, ওই পঁয়ত্রিশ জন, বিষয়…ল্যাংগুয়েজ অ্যানড সোসাল রিলেশনস। একঘণ্টা পরে ওঁরা প্রত্যেকেই নিজের লেখাটা পড়বেন, অন্যরা তখন শুনবেন, একজন একসপার্টও আছেন…'

অম্বর বেশ বুদ্ধিমান, তখনই বুঝে নিলেন, এখানে ভাষা-শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতিটা কী রকম। স্পষ্টই বোঝা যায়, সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ওরা নিজেরাই বেছে নেবে। কিন্তু এরকম নিয়োগ-পদ্ধতি কবে চালু হয়েছে, কোন্ স্কুলেই বা নিয়োগ হবে কিছুই ভেবে উঠতে পারলেন না।

একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কোনো প্রার্থীর আত্মীয়? কেউই কিন্তু আসেন না এখানে, অবশ্য কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা ফোনে তাঁর আত্মীয়দের জানিয়ে দিই। কিন্তু আজকে তো আমরা তেমন কাউকে জানাই নি…'

কী জন্যে যেন মেয়েটির এই নিরীহ সরল কথাগুলো অম্বরের কাছে ন্যাকা-ন্যাকা মনে হল। একটু বিরক্ত হলেন। 'আমি একজন একসপার্ট…' কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে মেয়ে দুটোকে তাক লাগিয়ে দিতে ইচ্ছে হল তাঁর—ওরকম জাহির করাটা শুধু তাঁর কেন সবারই অভ্যাস—কিন্তু কী জানি, মেয়ে দুটি, যদিও তাদের ক্লাশ ফোর স্টাফ বলেই মনে হয়, যদি তাঁর কথায় হেসে ওঠে।

'আই অ্যাম সরি, লেট মী এনকোয়ার ডাউন-স্টেআর্স্…' বলে গটগট করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। মেয়ে দুটি অবাক হয়ে তাঁকে একটু দেখল, তারপর নিজেদের কাজে ফিরে গেল।

সিঁড়ির পাশে সেই ঘরটিতে এসে গেলেন তিনি, দেখলেন এখনো সেই তিনজন গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করছে। অম্বর আর কায়দা-টায়দা করলেন না, ডিস্টার্ব্ করছেন বলে দুঃখ-প্রকাশও করলেন না, একটু জোর দিয়ে কথাগুলো বলে গেলেন, 'দেখুন, আমি আজকের ইনটারভিউএর একজন একসপার্ট, আজকে এখানে এরনটিক্যাল এনজিনীয়ারদের সিলেকশন হবার কথা ছিল…'

তিনজনেই একবার পরস্পরের দিকে তাকাল, কিন্তু নিশ্চয়ই বিরক্তি, ব্যঙ্গ বা তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল না। একজন পুরুষ উঠে এসে অম্বরকে দরজার কাছে নিয়ে এল, 'আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি বলুন…' কিন্তু অম্বরের কথাগুলো আগেই তার কানে গিয়েছিল, তারই উত্তর দিয়ে বলল, 'দেখুন, ইনটার-ভিউ কথাটা পুরনো, এখন এখানে স্ব-নির্বাচন কথাটা ব্যবহার করা হয়। সেটা কিন্তু চলছে, এক ঘণ্টা আগেই আরম্ভ হয়েছে…দেখুন না। দলে দলে ছেলে-মেয়েরা আসছে বেরিয়ে যাচ্ছে…' বলে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চত্বরের দিকে অম্বরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'ছেলেমেয়েরা ক্যানডিডেট তো? ওরা আসছে বুঝলাম, কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে যে? ওরা ইনটারভিউ—মানে, ওই স্ব-নির্বাচন…'

'ইনটারভিউ' কেউ দেয় না এখানে…মনে হয় কোথাও একটা ভুল হচ্ছে আপনার। আচ্ছা, আপনি কেন এসব জিজ্ঞেস করছেন বলবেন কি?'

'আমি আজকের একজন একসপার্ট, এরনটিক্যাল এনজিনীয়ারদের ইনটারভিউ আছে…'

লোকটির চোখে একটা সংশয় ফুটে উঠল, কিন্তু বেশিক্ষণ অম্বরকে নিয়ে পড়ে থাকারও সময় ছিল না তার, সংক্ষেপে বলল, 'আপনি বারো নমবর শেডে

যান, সব বুঝতে পারবেন। আমি যতদূর জানি, সেখানে তো আগেই একজন এক্‌সপার্ট আছেন, গাইড করছেন তিনি, তাঁকে রেফারিও হতে হয়…'

লোকটি নয়, অম্বরই বিরক্ত হয়ে উঠলেন, ক্রুদ্ধও হলেন, ডেকে এনে তাঁকে এইরকম অবস্থায় ফেলা কেন? 'আচ্ছা, যাচ্ছি ওখানে…' ফিরে বলতে আরম্ভ করলেন অম্বর। পিছন থেকে লোকটি বলল, 'মনে হয়, কিছু একটা ভুল হয়েছে…'

'ভুল না কচু। এ হচ্ছে আমাকে অপদস্থ করা…', না, কথাগুলো উচ্চারণ করলেন না, মনে-মনে বললেন, 'আর এ হচ্ছে পিএসসি-র সেক্রেটারি শ্রীরামনের কাজ। বেটা আমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে নি কিনা…'

বাড়িটার থেকে বেরিয়ে সজোরে হাঁটছিলেন অম্বর, গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। এটা গুরুতর চক্রান্ত—একটা প্রতিবাদ জানাতেই হবে।

গেট প্রায় পেরিয়েই গিয়েছিলেন, এমন সময় তাঁর ভাবান্তর হল। আচ্ছা, এই যে বাড়িটাকে ঘিরে এত বড়ো চত্বর, এত ছেলেমেয়েরা আসছে যাচ্ছে, ব্যাপারটা হচ্ছে কী? একটু দেখে যেতে ইচ্ছে হয় যেন। একপা দুপা করে চত্বরে ফিরে এলেন তিনি। এবং ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

অম্বর চ্যাটার্জি এর আগে অনেক ইনটারভিউ নিয়েছেন, যারা ইনটারভিউ দিতে আসে তাদের ভালো করেই চেনেন। শুকনো মুখ, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, প্রাণটি যেন কণ্ঠার কাছে ধুকধুক করছে। কিন্তু এসব ছেলেমেয়ে বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ, প্রাণবন্ত তো বটেই। যারা ফিরে যাচ্ছে তাদের দু-একটি কথা কানে এল—

'এই, কী হল, তোর নাম কোন্ গ্রেডে?…'

'সি। নাঃ, এখানে হল না, এ-তেই সতেরো জনের নাম…'

'কোথায় ফেলল তোকে দেখলি?…'

'না তো…' ছেলেটি থমকে গেল, মনে হল এখনই ফিরে গিয়ে চার্টটা ফের একবার দেখে আসবে। তবে তার দরকার হল না। পাশে হাঁটছিল যে মেয়েটি খিক করে হেসে উঠল, 'তুই এত বোকা কেন, অজয় নাম হলে কী হবে, অজ হয়ে উঠলি যে…'

ছেলেটা আরো একটু বোকা বনে গেল, 'মানে?…'

'আচ্ছা, চার্টে এ গ্রেডে নাম উঠল না এইটে দেখেই কেউ ফিরে আসে? কোথায় দিয়েছে সেটা দেখতে হবে না? শোন্, আমি দেখেছি, বি গ্রেডের সেক্‌টর থ্রি-তে তোকে দিয়েছে, আমারও তাই…'

'ও…'

অম্বর চ্যাটার্জি কম বুদ্ধিমান নন, তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলেন : অর্থাৎ কোনো একটা পদে কারুর স্থান হল না বলে সে বাতিল আবর্জনা হয়ে গেল না, তার জন্যে অন্য পদ আছে। বেশ তো। অম্বর যেন একটু উৎসাহিত হলেন। ছেলেমেয়েরা যে শেড থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেখানে তাড়াতাড়ি গিয়ে ভিড়ের পিছন থেকে উঁকি মারলেন। দেখা দেখা মাত্র বুঝলেন, কমপিউটারে চার্টটা তৈরি হয়েছে।

চার্টটা বেশ বড়ো, লেকচার থিয়েটারে অম্বররা যে রকম বোর্ড ব্যবহার করেন, কতকটা সেই রকম। সেই বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে হাতে লম্বা একটা কাঠি নিয়ে এক ব্যক্তি চার্টের এখানে-ওখানে ছুঁয়ে যাচ্ছেন, ঠিক যেন বিজ্ঞান-মেলার কোনো গাইড।

অম্বর একটি ছেলেকে প্রায় কানে-কানে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, উনি কে? ইনটারপ্রিটার?'

ছেলেটি মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, দেখছিলও। পিছন না ফিরেও বলল, 'উনি এক্‌সপার্ট…হ্যাঁ, ইনটারপ্রিটার তো বটেই…'

'ও…'

মাঝবয়সী লোকটি বোঝাচ্ছিলেন, 'আপনারা নিজেদের নামের পাশে এই কালামগুলো দেখুন।

বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, শারীরিক মান, মানসিক প্রবণতা…কেমন, এইসব তো? কমপিউটার এসবের পারমিউটেশন কমবিনেশন করে দিয়েছে, এ. বি. সি. গ্রেড। তিনশ সাঁইত্রিশ জন নিজেদের নাম এনট্রি করেছিল, সতেরো জন লোকের দরকার, তাই এ গ্রেডে সতেরো জনেরই নাম। বি. আর সি. গ্রেডের নামগুলোর পাশে আর-একটা কালাম আছে দেখে নিন, কাকে কোথায় যেতে বলা হয়েছে…'

ওঃ, কেউই তাহলে বাতিল না, সবারই বিকল্প কর্মসংস্থান আছে। চমৎকার তো। অম্বর এত খুশি হলেন যে তৎক্ষণাৎ কয়েকটা প্রশ্ন না করে পারলেন না। বলে উঠলেন, 'স্যার, এই যে এ গ্রেড করেছেন, এতে কোনো সংরক্ষণ নেই?'

'সংরক্ষণ…সেটা আবার কী?'

'এই ধরুন, বাঙলার কোটা, বিহারের কোটা, মিনিসটারের কোটা, তপশীলী জাতি বা উপজাতি, নিদেন পুরুষ আর নারী…'

প্রার্থীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল, 'পাগল নাকি লোকটা!…'

একসপার্ট বললেন, 'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না…'

'বলছিলাম, বারো নম্বর শেডটা কোন্ দিকে বলতে পারেন, যেখানে এরনটিক্যাল ইনজিনীয়ারদের —ওই যে কী বলে, স্ব-নির্বাচন চলছে?…'

'তাই বলুন। চত্বরের একেবারে বিপরীত দিকে চলে যান…'

'ধন্যবাদ…'

৫.

অম্বর চ্যাটার্জি বুঝলেন, মানে-মানে কেটে পড়াই ভালো। যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে বারো নমবর শেডের কাছে হাজির হলেন। এখানে ভিড় একরকম নেই, তার মানে অনেকেই নিজের নিজের পজিশন জেনে নিয়ে চলে গেছে। ব্যাপারটা খুব ইজি—মনে মনে ভাবলেন অম্বর। ধরাধরি নেই, অকারণ চাপ নেই, পরস্পরের সুতো ধরে পরস্পরকে বাঁচিয়ে রাখার সুপার-স্ট্রাকচার নেই। ঠিকই তো—কর্মপ্রার্থী আর কর্ম, এ দুয়ের যোগ হওয়া উচিত একেবারে সোজা সড়ক।

এখানে বোর্ডের পাশে একসপার্ট ছিলেন বটে, তবে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দিচ্ছেন না। তিনি এখানে রেফারির ভূমিকায় অবতীর্ণ। একটু দেখেই তীক্ষ্ণধী অম্বর বুঝলেন একটা টাই হয়েছে। সিতাংশু আর সুধীর নামে দুই যুবক প্লেন চালানো নিয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করছে, উত্তরও দিচ্ছে। একজন অপরকে পাঁচটি প্রশ্ন করবে। উত্তর ঠিক হচ্ছে কিনা, সেটা তারাই বিচার করবে—না পারলে একসপার্ট তো আছেনই।

অম্বর একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি একজন একসপার্ট নিযুক্ত হয়েছি…'

'ভালোই, শুনুন তো ওরা ঠিক উত্তর দিচ্ছে কিনা…'

অম্বরের ভালো লাগল যে তাঁকে এখানে একটা ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। তিনি ওদের দুজনের উত্তর-প্রত্যুত্তর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। শেষে বলে উঠলেন, 'ট্রাই এগেন…', তার মানে, কমপিউটার চার্টে এ গ্রেডে, ওরা সমান-সমান হয়েছে তো বটেই, প্রত্যেকে অন্যের পাঁচটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরও দিয়েছে। একসপার্ট তাঁর হাতের কাগজে কিছু লিখলেন, মৃদু হেসে বললেন, 'তাহলে পারফরম্যান্স…আজ বিকেল তিনটেয় প্লেন চালিয়ে তোমরা ডেমনস্ট্রেশন দেবে…'

'ঠিক আছে…' দুজনে হাসিমুখে স্বীকার করল।

অম্বর বলে উঠলেন, 'কেন, কেন, আপনি প্রশ্ন করুন না, আমিও করতে পারি। ওদের আলাদা-আলাদা ডেকে, যেখানে একজনকে কী প্রশ্ন করা হল অন্যে জানবে না, এও জানবে না আমরা ওদের কাকে কী নমবর দিলাম…'

এই রে, সম্পূর্ণ ভুল জায়গায় হাত দিয়ে

ফেলেছেন, অভ্যেস যাবে কোথায়। আগেকার একসপার্ট চকিতে অম্বরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, এর আগে আগন্তুকের মুখও দেখেন নি—'এখানে তো এসব নিয়ম নেই। আপনি কে?'

'আমি একসপার্ট, ড. এ. চ্যাটার্জি…'

'কে আপনাকে পাঠিয়েছেন?'

'কেন, পিএসসি-র সেক্রেটারি শ্রীরামন…'

ওরে বাবা! একসপার্টের চোখে আগুন জ্বলে উঠল, 'হু ইজ দ্যাট ফেলা?'

অম্বর প্রমাদ গুনলেন, 'একটা ভুল হয়েছে স্বীকার করছি…' বলে পালাবার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু সভয়ে দেখলেন, তাঁকে সবাই ঘিরে ফেলেছে। দোতলা থেকে সেই দুজন ঝি—ঝি ছাড়া আর কী, সিঁড়ির পাশের ঘরের তিনজন মহিলা পুরুষ, যে শেডে আগে গিয়েছিলেন সেখানকার একসপার্ট আর প্রার্থীরা, উপরন্তু এখানকার সবাই—সবার চোখেই আগুন ঝলকাচ্ছে, সবারই উদ্যত তর্জনী তাঁরই দিকে।

'হু আর ইউ', 'ইউসার্পার', 'ভণ্ড', 'ধান্দাবাজ', 'স্বার্থপর',—কথাগুলো যেন বুলেটের মতো তাঁকে ঝাঁঝরা করতে লাগল। শুধু তাই নয়, ছেলেমেয়েরা অম্বরের কলার ধরে তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। দু-চার ঘা দিল না এইটেই রক্ষে। কিন্তু গেট পর্যন্ত নিয়ে এসে একযোগে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে রাস্তায় ছিটকে দিল।

একটা প্রাণান্ত চিৎকার দিয়ে মুখ গুঁজে পড়লেন অম্বর।

'এই, এই, ওঠো ওঠো, কী হল…' প্রতিভা স্বামীকে ঠেলা দিয়ে বললেন, 'চিৎকার করছ কেন?…'

'ওরে বাবারে, মেরে ফেললে রে…অ্যাঁ…' অম্বর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন, সর্বাঙ্গ ঘামে নেয়ে গেছে। একটুখানি নিঃঝুমের মতো বসে রইলেন তিনি। তারপর হেসে উঠলেন, এবং দমক দিয়ে-দিয়ে হাসতেই থাকলেন।

'আঃ, কী হল, বলবে তো। আমি ভয়ে মরি, তুমি যা চিৎকার করে উঠলে। এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে আছে? দুঃস্বপ্ন দেখবেই তো…'

'আজ কত তারিখ বলো তো, আজই পিএসসি-র ইনটারভিউ না?…ঠিক আছে, সব গুছিয়ে রেডি হতে সময় লাগবে। গাড়ি এলে বোলো…দুঃস্বপ্ন? স্বপ্ন একটা দেখছিলাম, দারুণ স্বপ্ন…'

'সে পরে শুনব, তুমি বাপু চায়ের টেবিলে এসো তো আগে…'

অম্বর বাথরুমে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। ট্যাপ থেকে জল পড়া শুরু হল, তার আওয়াজের সঙ্গে রামপ্রসাদী সুরও মিলল। অম্বর গাইছেন—

বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মা গো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥

ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামে আলেমসমাজের দান

রশীদ আল ফারুকী

১৯৪৭ সালের পর থেকে আমরা দেখে আসছি, প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে, আমাদের দেশের আলেমসমাজ পাকিস্তানের সপক্ষতা করে এসেছেন এবং পাকিস্তানকে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন। এঁদের অনেকে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে শুধু যে সমর্থন করেন নি তা নয়, বরং কিছু অংশ তার বিরোধিতা করতেও কুণ্ঠিত হন নি। ফলে তাঁদেরই প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে এদেশে সংগঠিত হয়েছে পৃথিবীর ঘৃণ্যতম নরহত্যাযজ্ঞ, যাতে প্রাণ হারিয়েছেন এদেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক এবং শিল্পী। এই অধ্যায়টি আরবি-শিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের পক্ষে যত কলঙ্কময় হোক না কেন, তা তাঁদের অতীত কার্যাবলীর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। তাঁদেরও রয়েছে একটি গৌরবজনক ভূমিকা যা এদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এদেশে প্রথম ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন আমাদের আলেমসমাজ—বহু বিসর্পিল পথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে যা পর্যবসিত হয়েছিল। যার জন্যে এই সমাজের বহু সদস্যকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল, হতে হয়েছিল নির্যাতিত, নিষ্পেষিত এবং কখনো-কখনো নির্বাসিত। বর্তমানে আমাদের আলেমসমাজের আচরণ দেখে মনে হয় না তাঁরা তাঁদের 'শানদার মা'জি' (গৌরবময় অতীত) সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল।

১৭৫৭ সালের পর থেকেই এদেশে অধীনতার অভিশাপ নেমে আসে। সম্রাট ঔরঙ্গজিবের (১৬১৮-১৭০৭) মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের প্রতিকূলে যে শক্তির অভ্যুদয় ঘটে তার ভেতর মারাঠারা ছিল প্রধান। ঔরঙ্গজিবের সময় মারাঠা নেতা শিবাজির (১৬২৭-১৬৮০)[১] সঙ্গে তাঁর যে বিরোধ ঘটে তাতে এই শক্তির অভ্যুদয়ের আভাস রয়েছে। একারণে মারাঠাদের সঙ্গে বিরোধকে

দুই বাঙলার সুপরিচিত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ এবং সংস্কৃতিসেবী ড. রশীদ আল ফারুকীর অকালপ্রয়াণে আমরা মর্মাহত। মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৮৭ তারিখে ঢাকায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ড. ফারুকী ছিলেন আমাদের পরম সুহৃদ। মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগে চতুরঙ্গ দপ্তরে "স্বাধীনতা সংগ্রামে আলেমসমাজের অবদান" শীর্ষক নিবন্ধটি পাঠিয়ে লিখেছিলেন, 'আমার ধারণা এঁদের সম্পর্কে আপনাদের ওখানে দুয়েকটি লেখা ছাপা হওয়া প্রয়োজন।' বলা বাহুল্য, ড. ফারুকীর এই ধারণা অত্যন্ত সংগত। তাঁর এই অন্তিম ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে নিবন্ধটি প্রকাশ করে সদ্যপ্রয়াত এই সুপণ্ডিত মানুষটির প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সম্পাদক

মুসলমানেরা জাতীয় বৈরিতার অন্তর্ভুক্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত রাখে। মারাঠা দমনের উদ্দেশ্যে ভারতের বিশিষ্ট মুসলিম ধর্মবিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬৩) কর্তৃক আহমদ শাহ আবদালিকে আমন্ত্রণ[২] একারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ শাহ ওয়ালিউল্লাহ একজন বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি 'মুসলমানের রক্ষণশীল মধ্যযুগীয় মনোভাবকে বহুক্ষেত্রেই বিপ্লবীর সাহস নিয়ে আঘাত করেছেন।'[৩] তবু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১) জয় যাঁরই হোক না কেন, মুসলিম-মারাঠা উভয়ই হীনবীর্য হয়ে পড়েছিল —যা প্রকারান্তরে ইংরেজের ভারতবিজয়ের পথকে সুগম করে দেয়।[৪] এই বিরোধ আর বিসংবাদ শাহ ওয়ালিউল্লাহর মনে যে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়ে তুলেছিল তার পরিপূর্ণতা লক্ষ করা যায় তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি শাহ আবদুল আযিযের (১৭৪৬-১৮২৪) মধ্যে। তিনিই প্রথম ইংরেজ শাসনের নেতিবাচক দিক উপলব্ধি করেন এবং ভারতবর্ষকে 'দার উল হরব' বলে অনুশাসন জারি করেন।[৫] এই অনুশাসন প্রকারান্তরে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে জেহাদে অনুপ্রাণিত করে যা বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করেন তাঁরই যোগ্য শিষ্য সৈয়দ আহমদ বেরিলভি (১৭৮৬-১৮৩১)।

শাহ ওয়ালিউল্লাহর সময় মুসলমানেরা যেভাবে মারাঠাদের প্রতিকূলতা লাভ করেছিলেন, তেমনি শাহ আবদুল আযিযের সময় তা লাভ করেছিলেন শিখদের দ্বারা। শিখরাজ রণজিৎ সিংহের (১৭৮০-১৮৩৯) সঙ্গে গোড়া থেকেই মুসলমানদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই বিরোধের পরিণতি হল প্রসিদ্ধ বালাকোটের যুদ্ধ (১৮৩১)। এই যুদ্ধে শাহ আবদুল আযিযের শিষ্য সৈয়দ আহমদ বেরিলভি তাঁর বহু অনুসারী সহ নিহত হন। বঙ্গদেশে এই জেহাদ পরিচালিত হয় সৈয়দ নেসার আলি ওরফে তিতুমীরের (১৭৮২-১৮৩১) নেতৃত্বে। প্রথমদিকে এসব আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মসংস্কার সম্পৃক্ত হলেও পরবর্তী কালে ধীরে-ধীরে তা ব্রিটিশবিরোধী রূপ পরিগ্রহ করে[৬]—যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আলেমসমাজ। এই বিরোধের সর্বগ্রাসী রূপ লক্ষ করা যায় সিপাহি বিপ্লবের সময়।

সিপাহি বিপ্লবে ভারতবর্ষের আলেমসমাজের একটি বিরাট অংশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং তার জন্যে নানা ধরনের নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। এই নির্যাতিত আলেমদের অনেকে নিজ-নিজ স্মৃতিচারণে এই জুলুম আর নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র ধরে রেখেছেন। এসব আলেমের ভেতর মাওলানা ফজল হক খয়রাবাদী (১৭৯৭-১৮৬১), হাজী ইমাদুল্লাহ (১৮১৭-১৮৯৬), মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহি (১৮২৯-১৯০৫), সুফি নূর মোহাম্মদ, মাওলানা মোহাম্মদ কাশেম নানাতাবী (১৮৩৩-১৮৮০) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এসব আলেম প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন—যা ছিল সংকীর্ণ-সাম্প্রদায়িক-চিন্তামুক্ত। তাঁরা শুধু মসিই হাতে নেন নি, বরং ইংরেজের বিরুদ্ধে অসিচালনাও করেছিলেন। এঁদের অনেকে ইংরেজের কারাগারে অশেষ নির্যাতন ভোগ করে যেমন মৃত্যুবরণ করেছেন, তেমনি অনেকে পরবর্তী কালে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের ধারা শুধু অব্যাহত রাখেন নি, বরং তাতে নেতৃত্ব দিয়ে নতুন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করেছিলেন।

১৮৫৭ সালের বিপ্লবে স্বাধীনতাকামী শক্তির পরাজয় ঘটে। এই পরাজয়কে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হোক না কেন, এক্ষেত্রে মুসলমানদের ভূমিকা অনস্বীকার্য[৭], এবং যার বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে ভারতের আলেমসমাজের ভূমিকা। একারণে ইংরেজের নির্যাতনের একটা বড়ো অংশ মুসলমানদের উপর নেমে আসে। ইংরেজের এই নির্যাতনে মুসলমানেরা গোড়া থেকেই কেন লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে তা আমরা আগে দেখেছি। তবে এর একটা নেতিবাচক দিকও রয়েছে। তা হল এই ক্রমবর্ধমান নির্যাতনের পরিণতি। এক শ্রেণীর মুসলমান ১৮৫৭ সাল থেকে

এ সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকেন। তাঁদের সামনে দুটো বিষয় স্পষ্ট ছিল। একটা হল ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের উপর নির্যাতন—যা ফকির বিদ্রোহ, ওয়াহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলনে যেমন দেখা গেছে, তেমনি দেখা গেছে সিপাহি বিপ্লবে। অন্যটি হল ইংরেজের সঙ্গে সার্বিক অসহযোগিতার কারণে আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অধোগতি। একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়গুলো ভেবে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। উত্তর ভারতের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৫-১৮৯৮) অনুরূপ শঙ্কার বশবর্তী হয়ে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং এই চিন্তা ও চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি ১৮৭৫ খ্রী আলিগড়ে একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন—যা ১৮৭৭ সালে মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েনটাল কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১৯২০ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের এই প্রয়াস ইতিহাসে আলিগড় আন্দোলন নামে খ্যাত—যার মূল উদ্দেশ্য মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে ইংরেজের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য।

অন্যদিকে শাহ আবদুল আযিযের অনুসারীদের যে অংশটি ইংরেজ আর শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরা স্যার সৈয়দ আহমদের এই আপোসনীতির প্রতিকূলে তাঁদের যাত্রা অব্যাহত রাখেন। ১৮৫৭ সালের পরাজয় তাঁদের ভেতর খানিকটা হতাশা সৃষ্টি করলেও তাঁরা একেবারে হীনবীর্য হয়ে পড়েন নি। বিশিষ্ট আলেম হাজি ইমাদউল্লাহ ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে যোগ দেওয়ার অপরাধে সরকারের রোষানলে পতিত হন এবং সরকারি নির্যাতন এড়ানোর উদ্দেশ্যে মক্কা শরিফ পালিয়ে যান। সিপাহি বিপ্লব স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পর তাঁরই শিষ্য মাওলানা মোহাম্মদ কাশেম নানাতাবি ১৮৬৭ সালে মধ্য-

প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে এক মাদ্রাসা স্থাপন করেন। সমগ্র বিশ্বে এই প্রতিষ্ঠানটি 'দেওবন্দ মাদ্রাসা' নামে খ্যাত। ইসলামি চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রসিদ্ধ মিশরের আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়েরই সমতুল্য। শ্যামলীতে প্রতিষ্ঠিত হাজি ইমাদউল্লাহর মাদ্রাসার সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে শ্যামলীতে যেখানে অসির প্রাধান্য ছিল বেশি, সেখানে দেওবন্দে প্রাধান্য লাভ করেছে মসি।[৮] পরে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, হাজি ইমামউল্লাহর অন্যতম শিষ্য মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহিও এই মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। মাওলানা গাঙ্গোহিও ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবে যোগদান করেছিলেন এবং সরকার-কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। এই মাদ্রাসার যেসব বৈশিষ্ট্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার ভেতর প্রধান হল সরকারের কাছ থেকে কোনপ্রকার সাহায্য গ্রহণ না করা, সরকারবিরোধী জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে ছাত্রদের উৎসাহিত করা, শাহ ওয়ালিউল্লাহর উপদেশাবলী দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করা এবং আভিজাত্যবোধ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বাণী বাস্তবায়নের চেষ্টা চালানো। এই মাদ্রাসার শিক্ষক আর ছাত্রদের একটি বড়ো অংশ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদবুদ্ধ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, গোড়া থেকেই কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং নানাভাবে তাঁদের এই প্রতিষ্ঠানে যোগদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করে তোলে।[৯] কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহি দেওবন্দ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারতীয় জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর শিষ্যদের স্যার সৈয়দ আহমদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে কংগ্রেসে যোগদান করতে অনুপ্রাণিত করেন বটে কিন্তু যেহেতু কংগ্রেস পূর্ণ

স্বাধীনতার কর্মসূচি গ্রহণ করে নি, সেহেতু স্বাধীনতার পূজারী মাওলানা গাঙ্গোহি নিজে কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্রব রাখেন নি।[১০] পরবর্তী কালে তাঁরই শিষ্য মাওলানা মাহমুদুল হাসান (১৮৫১-১৯২১) ভারতের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর এই তৎপরতা ব্রিটিশ সরকারের গোচরীভূত হয়ে গেলে তিনি ভারত ত্যাগ করে মক্কা শরিফ চলে যান। মক্কা থেকে সিল্কের কাপড়ের উপর পত্র লিখে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। পরে এই ব্যবস্থা ধরা পড়ে যায়এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয় তা ইতিহাসে সিল্ক লেটার কন্‌স্‌পিরেসি মামলা নামে খ্যাতি লাভ করে।[১১] কিন্তু মক্কার শরিফ হোসেন তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দেন। তাঁদের মাল্টা দ্বীপে আটক রাখা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে আসার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জামেয়া মিল্লিয়ার উদ্বোধন করেন। তাঁর অন্যতম কীর্তি হল জমিয়ৎ ই ওলামায়ে হিন্দ্ প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠান পরবর্তী কালে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

মাহমুদুল হাসানের ছাত্র মাওলানা ওবায়দউল্লাহ সিন্ধি (১৮৭১-১৯৪৪), মুফতি কিফায়েৎউল্লাহ (১৮৭২-১৯৫২) ও মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানিও (১৮৭৯-১৯৫৭) ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। মাওলানা ওবায়দউল্লাহ সিন্ধি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং দেশ থেকে ধনতন্ত্র উচ্ছেদ করে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণের জন্যে কাজ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে মাওলানা মাহমুদুল হাসানের নির্দেশে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন।[১২] রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এবং মৌলভি বরকতউল্লাহর উদ্যোগে ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে ভারতের যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় তাতে তিনি স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[১৩] মাওলানা সিন্ধি রুশ বিপ্লবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[১৪] তাঁর নেতৃত্বে কাবুলে কংগ্রেসের একটি শাখা গঠিত হয়—যা ভারতের বাইরে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম শাখা হিসেবে পরিগণিত।[১৫]

মুফতি কিফায়েৎউল্লাহ দীর্ঘদিন জমিয়ৎ ই ওলামায়ে হিন্দের সভাপতি ছিলেন। তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনকেই ভারতে স্থায়ী শান্তির একমাত্র পথ বলে মনে করতেন—যার ভিত্তি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ।[১৬] তিনি ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন এবং তার জন্যে ছুবার কারাবরণ করেন। ১৯৪০ সালে যেখানে সঙ্কীর্ণমনা মুসলিম সম্প্রদায়বাদীরা দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার চক্রান্তে লিপ্ত, সেখানে মুফতি কেফায়েৎউল্লাহ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

মাওলানা মাহমুদুল হাসানের শিষ্যবর্গের ভেতর যেসব আলেম ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের ভেতর মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানির নাম নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয়। তিনি শুধু আবেগ দিয়ে রাজনীতিকে দেখতেন না, বরং তাঁর রাজনীতিচর্চাতে যুক্তি আর বিশ্বাসের সম্মেলন ঘটেছিল। মাদানি তাঁর গুরু মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে একটি দ্বীপে আটক ছিলেন। তিনি ইংরেজের বিরোধিতাকে ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। একারণে এই বিরোধিতাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর জোর দেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে ফেলেন। 'তিনি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এদেশের হিন্দু ও মুসলমানকে সম্মিলিত জাতি হিসেবে দাঁড় করাতে হবে এবং উভয় পক্ষে যা কল্যাণকর এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে।'[১৭] এই মনোভাবের পেছনে যে বিশ্বাস কাজ করেছে তা হল 'আধুনিক

যুগের জাতীয়তার ভিত্তি দেশের ভৌগোলিক সীমা-রেখা', অতএব 'ভারতীয় মুসলমানদের এই মতবাদ গ্রহণ করা উচিত।'[১৮] তিনি "কওম" বলতে ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তা মনে করতেন এবং "মিল্লাত"-কে ধর্মীয় ঐক্যের সমার্থক বিবেচনা করতেন।[১৯] এর সহজ অর্থ হল অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতীয়তাবাদ—যা কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে আসছে ১৮৮৫ সাল থেকে। লীগ-প্রবর্তিত দ্বিজাতিতত্ত্বের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিল সুস্পষ্ট। তিনি মনে করতেন, মুসলিম লীগের দাবি অনুসারে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে মুসলমানদেরই ক্ষতি হবে বেশি। শুধু তাই নয়, এতে করে উভয় রাষ্ট্রই দুর্বল হয়ে পড়বে এবং বিদেশী শক্তির উপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় থাকবে না। বিভাগোত্তর পাকিস্তানের অবস্থান এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা-সংগ্রাম তাঁর এই উক্তির সত্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর পাকিস্তানবিরোধী ভূমিকার জন্যে তাঁকে স্বদেশবাসী মুসলমানদের দ্বারাও নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল।

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের (১৮৮৮-১৯৫৮) ভূমিকা বিতর্কের ঊর্ধ্বে। মাওলানা আযাদের পূর্বপুরুষ ভারতের বাইরে থেকে এখানে এসেছেন। কলকাতাতেই তাঁর কর্মময় জীবনের সূচনা। তরুণ বয়সে তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা মুসলমানদের বিশ্বাস করতেন না বলে তাঁদের পক্ষে এই পথে আসা খুব অসুবিধেজনক ছিল।[২০] তবু এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় এই আন্দোলনে যোগদাতাদের খিদিরপুর কবরস্তানে গিয়ে কোরআন স্পর্শ করে মাতৃভূমির জন্যে মৃত্যুবরণ করার শপথ গ্রহণ করানো হত।[২১] মাওলানা আযাদ আজীবন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তার জন্যে ব্রিটিশ সরকারের বহু নির্যাতন ভোগ করেছেন। তিনি একটানা চার বছর জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯০৬ সালে যে মুসলিম লীগ গঠিত হয় তার প্রধান দাবি ছিল একমাত্র মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার রাখে। মাওলানা আযাদ বরাবরই এই মতামতের বিরোধী ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঘোরতর সন্দিহান ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন দুটি জনপদের অধিবাসীদের শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে ঐক্যবদ্ধ রাখা যায় না।[২২] একারণে তিনি গোড়া থেকেই দেশবিভাগের বিরোধী ছিলেন, এমন-কি হিন্দু নেতৃবৃন্দ মেনে নেওয়ার পরও। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে তাঁর ধারণা যথার্থ ছিল যে তাঁরা কখনো স্বাধীনতার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করেন নি, অথবা সুশৃঙ্খল সংগ্রামী ঐতিহ্যও ছিল না, কারণ তাঁরা হয় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন, অথবা তাঁদের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনীতিতে টেনে আনা হয়েছে।[২৩] দেশবিভাগের পর তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে ব্যাপক বাস্তত্যাগের যেমন বিরোধী ছিলেন, তেমনি সামরিক ব্যক্তিবর্গের রাজনীতিতে যোগদানেরও বিরোধী ছিলেন।[২৪] এর পেছনে যে গভীর প্রত্যয় তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তা হল এই যে, ভারত এক-জাতি, তার সাংস্কৃতিক জীবনও এক এবং তা একই থাকবে।[২৫]

মাওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানি (১৮৯২-১৯৫৬)-ও একজন সুপরিচিত জাতীয়তাবাদী আলেম। তিনি একটি সংগ্রামী পরিবারের সদস্য। তাঁর পিতা শাহ মুহম্মদ আলিগড় আন্দোলনের হোতা স্যার সৈয়দ আহমদের ব্রিটিশ-তোষণনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানের সহ-অবস্থানের পক্ষে এক ফতোয়া জারি করেন।[২৬] মাওলানা হাবিবুর রহমান প্রথম দিকে মুসলিম লীগের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু

মুসলিম লীগের ব্রিটিশ-তোষণনীতির প্রতিবাদে তিনি সদলবলে মজলিসে আহরার নামে একখানা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটির সভাপতি মনোনীত হন মাওলানা লুধিয়ানি। কংগ্রেসের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী সদস্যদের দ্বারা গঠিত এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল, (ক) মুসলমানদের অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, ও সামাজিক উন্নয়নের জন্যে কাজ করা; (খ) ইসলামি মূল্যবোধ সৃষ্টি করে মুসলমানদের রাজনীতিসচেতন করে তোলা; এবং (গ) শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করা।[২৭] মজলিসে আহরারের সদস্যরা সুযোগ পেলেই সরকার-এর বিরোধিতা করতেন এবং এই চেতনার বশবর্তী হয়ে তাঁরা ভারতবর্ষকে 'দার উল হর্‌ব' হিসেবে বিবেচনা করতেন।[২৮] পরবর্তী কালে আয়াতুল্লাহ শাহ বোখারির চরম হিন্দুবিরোধী ভূমিকার জন্যে এই দলে মতভেদের সূচনা হয়। এই মতভেদ তীব্র আকার ধারণ করে অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে। মাওলানা হাবিবুর রহমান লুধিয়ানি ও এম দাউদ গজনভি কংগ্রেসের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন, পক্ষান্তরে মযহার আলি আযহারের নেতৃত্বে এই দলের আর-এক অংশ কোনো বিকল্প নেই মনে করে মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[২৯] লাল রঙের পতাকাধারী এই দলের পোশাক ছিল খদ্দর।[৩০]

অবশ্য সেদিন যেসব আলেম ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন তাঁদের অনেকে পরবর্তী কালে মুসলমানদের স্বার্থ বিবেচনা করে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। আলেমদের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যবাদের সূচনা করেন মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরি (১৮০০-১৮৭৩)। সমগ্র ভারতবর্ষকে দার উল হর্‌ব ঘোষণা করে উনবিংশ শতাব্দীর আলেমসমাজ যখন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ব্যাপৃত, তখন মাওলানা জৈনপুরি ইংরেজ-সমর্থক পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের অনুরোধে ভারতকে দার উল ইসলাম বলে ঘোষণা করে ফতোয়া জারি করেছিলেন।

প্রধানত দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দের চেষ্টায় জমিয়ৎ ই ওলামায়ে হিন্দ্‌ সমগ্র ভারতবর্ষে যে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায় তা বঙ্গদেশে সম্পন্ন হয় আনজুমান ই ওলামায়ে বাঙ্গালা নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। ১৯১৩ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি 'একদিন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করেছিল।'[৩১] এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি ছিলেন ফুরফুরার পীর মাওলানা শাহ সুফি মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকি (১৮৪৬-১৯৩৮) ও বর্ধমানের মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মুসা। সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম-সম্পাদক পদে বৃত হন যথাক্রমে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) ও মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০)। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত বিভিন্ন প্রকার আন্দোলনে যোগদান করে সরকারের হাতে নানাভাবে নিগৃহীত হন। এই প্রতিষ্ঠানটি মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনপদ্ধতির উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে "আল এসলাম" (১৯১৫) আত্মপ্রকাশ করে। ছয় বছর পর্যন্ত এই পত্রিকাটি সাহিত্য, সমাজ ও ধর্মসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। পরে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।[৩২]

মাওলানা আকরম খাঁ বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) আন্দোলনে যোগদান করেন। প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের মাধ্যমেই তিনি রাজনীতিতে পদার্পণ করেন,[৩৩] এবং কংগ্রেসের সংস্পর্শে আসেন। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বে তিনিও মাওলানা আবুল কালাম আযাদের মতো গোপন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[৩৪] কংগ্রেসের সংস্পর্শে আসার পর তিনি অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি উর্দু ভাষায় "জামানা" এবং বাঙলা ভাষায় সাপ্তাহিক "মোহাম্মদী" (১৯১০) ও দৈনিক "সেবক" (১৯২১) পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা-সদস্য হিসেবে কর্মরত থাকলেও ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অতঃপর নেহরু রিপোর্ট-এর প্রতিবাদে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।[৩৫]

মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী আনজুমান ই ওলামায়ে বাঙ্গালার একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবেই শুধু সুনাম অর্জন করেন নি, বরং তাঁর সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ধ্যানধারণার জন্যে অনেকের প্রিয় ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় জমিয়ৎ ই ওলামায়ে হিন্দের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি সাপ্তাহিক "সোলতান", দৈনিক "সোলতান", দৈনিক "আমীর", এবং মাসিক "আল এসলাম" পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং খেলাফত, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদানের অপরাধে একাধিকবার কারাবরণ করেন। ইসলামাবাদী মনে-প্রাণে হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বিশ্বাসী ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর মতামত ছিল 'হিন্দু ও মুসলমান ভারত-মাতার যুগল-সন্তান। তাঁহারাই দেশের প্রধান অধিবাসী। মাতৃভূমির প্রকৃত সুখসম্পদ ও সমৃদ্ধি গৌরব যে এই উভয়ের সমবেত চেষ্টা, পরস্পর একতা ও সম্প্রীতির উপর নির্ভর করে, তাহা চিন্তাশীল ও জ্ঞানীলোক মাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন।'[৩৬] ইসলামাবাদী জানেন, 'বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের লিখিত ভারতের অলীক ও ভিত্তিহীন ইতিহাস, এবং তাঁহাদের আদর্শ-অবলম্বনে রচিত এতদ্দেশীয় অনুকরণ-প্রিয় লেখকগণের কল্পনা-কাহিনী বেনামে ভারতের ইতিবৃত্ত, এসকলই হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টির মূলীভূত কারণ।' অতএব, 'ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করিয়া জাতীয় সং-সাহিত্য ও মাতৃভাষার সাহায্যে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধনের চেষ্টা করাই দেশবাসী ও সাহিত্যসেবকগণের প্রধান কর্ত্তব্য।'[৩৭]

বঙ্গদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে দুজন আলেমভ্রাতা বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁরা হলেন মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকি (১৮৮৬-১৯৫২) ও মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী (১৯০০-১৯৬০)। আবদুল্লাহেল বাকি আনজুমান ই ওলামায়ে বাঙ্গালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন এবং ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের দায়ে কারাবরণ করেন। নিজের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে ১৯৩২ সনে আবারো কারাবরণ করেন।[৩৮] এছাড়াও তিনি কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গেও সংযুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। আবদুল্লাহেল কাফী বি-এ ক্লাশে পড়ার সময় খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করেন।[৩৯] সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল। তিনি উর্দু দৈনিক 'জামানা' ও সাপ্তাহিক 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি জমিয়ৎ ই ওলামায়ে হিন্দের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সহকারী সম্পাদক হিসেবে কিছুকাল কর্মরত ছিলেন। অতঃপর তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের দায়ে কারাবরণ করেন। তিনিও বড়ো ভাইয়ের মতো নিজের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে বক্তৃতা দেওয়ার

অপরাধে কারারুদ্ধ হন।[৪০] মাওলানা কাফীর জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯৪০ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী মুসলিম কনফারেনসে যোগদান। পরবর্তী কালে তিনি কৃষক-প্রজা আন্দোলনেও যুক্ত হয়েছিলেন।

জাতীয়তাবাদী আলেম হিসেবে মাওলানা ফররোখ আহমদ নেজামপুরীর (১৮৮৭-১৯৮৪) নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫ সালে বিখ্যাত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩৭) ও আবদুল গফুর সিদ্দিকীর (১৮৭৯-১৯৫১) বঙ্গভঙ্গবিরোধী প্রচারই মাওলানা নেজামপুরীকে রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করে।[৪১] যুক্ত অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন চলার সময়ে তিনি খেলাফত কমিটির প্রচার-সম্পাদক ছিলেন। এই আন্দোলনের প্রচারকার্য উপলক্ষে তিনি অবিভক্ত বঙ্গদেশ, আসাম ও আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন এবং দেশবাসীকে অসহযোগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেন। এই পর্যায়ে তিনি ১৯২১ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তিনবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।[৪২] সাংবাদিক হিসেবেও মাওলানা নেজামপুরী যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "ইসলামাবাদ" (১৯২৪) এবং রেঙ্গুন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "বাংলা গেজেট" (১৯২৬) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এ ছাড়া কলকাতার "আল এসলাম" (১৯১৫) ও "সত্যাগ্রহী" (১৯২৪) এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত মাসিক "সাধনা" (১৯১৯) পত্রিকার সম্পাদনায় সহযোগী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

উপরে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে আলেমসমাজের রাজনৈতিক কার্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কন করা হল। এসব আলেমের অনেকেই নানাভাবে সরকার-কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন। আজ অনেকে এঁদের কার্যকলাপকে আধুনিক চিন্তাধারার পরিপন্থী ছিল বলে প্রচার চালাচ্ছেন এবং মুসলমানদের পরবর্তী অধোগতিকে তার জন্যে দায়ী করেছেন। এই প্রচার সর্বাংশে সত্য নয়।

একথা ঠিক যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যেসব মুসলমান ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে ইংরেজি শিক্ষারও বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের ভেতর কিছু আলেমও ছিলেন। একথাও ঠিক, আলেমদের একাংশের ইংরেজিবিরোধিতা প্রায় সম্পূর্ণ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তবু তাঁদের অনেকেই যে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন একথাও অস্বীকার করা যায় না। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতে শাহ আবদুল আযিযের মতো গভীর-জ্ঞানসম্পন্ন তাত্ত্বিকও ইংরেজি শিক্ষা সমর্থন করে ফতোয়া জারি করেছিলেন।[৪৩] উপরন্তু তাঁদের অনেকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্যে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাতে তাঁরা আর্থিকভাবে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন।[৪৪] শুধু তাই নয়, তাঁরা বিভিন্ন প্রকার জনহিতকর কাজের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এত ব্যাপক দান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি একথা সত্য। যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে তাঁরা একটি সুখী ও মুক্ত স্বদেশ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন তা ১৯৪৭ সালে কঠোর বাস্তবের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। অনেকে জানেন না সেদিন যেসব তত্ত্বজ্ঞ ও জ্ঞানবান আলেম ব্রিটিশবিরোধী চেতনার দুর্মর আবেগ নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের দেশবাসী শুধু প্রত্যাখ্যানই করেন নি বরং নানাভাবে অত্যাচারে-অপমানে জর্জরিত করে তুলেছিলেন। কথিত আছে যে, আমাদের দেশের কিছু অপরিণামদর্শী ব্যক্তি মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর মাথার পাগড়ি নিয়ে ফুটবল খেলতে পর্যন্ত দ্বিধা করেন নি। দেশের অনেক স্থানে তাঁদের শারীরিক নির্যাতনও করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা-যুদ্ধ এসব জাতীয়তাবাদী আলেমের চিন্তা ও চেতনার আনুকূল্য করলেও আজ তাঁদের ব্যর্থতা সম্পর্কে ভেবে দেখা প্রয়োজন। কারণ তাঁদের ব্যর্থতার ভেতর সমকালীন কিছু জটিল বিষয় জড়িত ছিল—যা প্রকারান্তরে আমাদের জাতীয় চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কারণ তাঁদের কাজে আর আচরণে এমন কিছু দুর্বলতা ছিল যা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি।

তাঁদের ব্যর্থতার কারণগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করা যায় :

(ক) যেসব আলেম ইংরেজের বিরোধিতাকে তাঁদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত করেছিলেন তাঁদের ভেতর এক ধরনের ধর্মীয় সংস্কারবোধও কাজ করেছিল—যার দরুন সৈয়দ আহমদ বেরিলভির জেহাদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ যেসব উপজাতীয় যোদ্ধাকে নিয়ে তিনি জেহাদ পরিচালনা করেছিলেন তাঁরা তাঁর সংস্কারপ্রয়াসকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন।[৪৫] ইংরেজ অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে এই সন্দেহকে ভারতীয় মুসলমানদের ভেতর চারিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে দেওবন্দ মাদ্রাসার ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব এবং তার পাশাপাশি আলিগড় আন্দোলনের প্রভাব। এই প্রভাবকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা দান করে ১৭৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দ। যদিও মাদ্রাসাটি শুধু প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল,[৪৬] তথাপি পরবর্তী কালে এই মাদ্রাসার ছাত্ররা পরিপূর্ণভাবে ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করে। চতুর ইংরেজ সরকার একদিন এঁদেরই ধর্মীয় বিভেদের দোহাই দিয়ে ওয়াহাবি আলেমদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাদের ব্যাপক প্রচারের ফলে জনসাধারণের মধ্যে দেওবন্দপন্থীদের প্রভাব ধীরে-ধীরে হ্রাস পেতে থাকে।

(খ) ১৮২৯ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো আরাবিক বিভাগ খোলা হয় এবং এই শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বাড়তে থাকে।[৪৭] এসব ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমান পরবর্তী কালে যেসব বৈষয়িক সুযোগসুবিধে লাভ করে তাও এই আলেমদের কর্মধারার বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে মুসলমানেরা ধীরে-ধীরে এসব আলেমের ভাবধারা পরিত্যাগ করে।

(গ) ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের সরকারতোষণ-নীতিও এসব আলেমের কর্মধারার বিরুদ্ধে যায়। এসব আলেম সর্বভারতীয় ধ্যানধারণা থেকে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের পক্ষে যেসব কথা বলতেন তা সার্বিকভাবে মুসলিম স্বার্থের প্রতিকূল—যা প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজের স্বার্থকেও হুমকির মুখোমুখি নিক্ষেপ করে। কারণ এসব আলেমের প্রভাব যেভাবে হ্রাস পাক না কেন, এদেশের সরল ও সহজ মানুষেরা তাঁদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এই শ্রদ্ধাবোধকে খণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ নতুন ভাবধারার আলেম সৃষ্টি করেন এবং ১৯৪৫ সালের নভেমবর মাসে কলকাতায় এসব আলেমকে "জমিয়ৎ ই ওলামায়ে ইসলাম" নামক সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত করেন।[৪৮] তাঁদের ভেতর এমনসব আলেমও ছিলেন যাঁরা দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া করেছেন। এসব আলেম ওয়াহাবিদের ধর্ম এবং রাজনীতি নিয়ে এমনভাবে চারিদিকে প্রচারে নামেন যে, তার ফলে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানের ভেতর নানা ধরনের সন্দেহ আর অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠে। এসব আলেমের ভেতর উল্লেখযোগ্য হলেন মুফতি মোহাম্মদ সফি, মাওলানা এহতেশামুল হক থানভি, মাওলানা আবদুল হামিদ বাদায়ুনি, মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানি। সবচেয়ে মজার কথা হল, এসব আলেম সেদিন মুসলমানদের একটা বড়ো অংশের নিকট হিন্দুদের দালালরূপে আখ্যায়িত হন।[৪৯] মুসলিম লীগের নিয়োজিত এই আলেমেরা প্রচার চালান যে, পাকিস্তানকে ভোট দেওয়া অর্থ ইসলামকে ভোট দেওয়া এবং মুসলিম লীগের বিরোধিতা করা

কুফরি।[৫০] এসব ফতোয়ায় বিভ্রান্ত হয়ে গ্রামের অশিক্ষিত ও অমার্জিত জনসাধারণ পাকিস্তানের পক্ষে তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করে।

(ঘ) জাতীয়তাবাদী আলেমেরা কংগ্রেসের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে যোগদান করলেও তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। একারণে একই কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করলেও তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার রক্ষার ব্যাপারে প্রায়ই মুসলিম লীগের মতোই কথা বলছিলেন। জাতীয় সংহতি ও রাজনৈতিক স্বাধিকারের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ভেদ করে মুসলিম লীগের সঙ্গে তাদের যে পার্থক্য চোখে পড়ে তা অনুভব করার মতো শিক্ষা ও অনুশীলনগত যোগ্যতা সাধারণ মানুষের ছিল না। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে জমিয়ৎ, মুসলিম কনফারেনস ও খেলাফত কমিটির উদ্যোগে পেশ করা চোদ্দ-দফা দাবি প্রায়ই কায়েদে আযম জিন্নাহর প্রদত্ত চোদ্দ দফারই অনুরূপ।[৫১]

(ঙ) ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে রত এসব আলেম মাতৃভাষাচর্চাকে তাঁদের মিশনের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন—সে উর্দু হোক কি বাঙলা। উপরন্তু তাঁরা আরবি ও ফারসি ভাষায়ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। একারণে তাঁদের কথাবার্তা, চালচলন, সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। একমাত্র প্রচারের আধুনিক কৌশল এই দুর্বোধ্যতার বেড়া অতিক্রম করতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এসব কৌশল সম্পর্কে তাঁরা অনবহিত ছিলেন। এজন্যে তাঁদের বাণীর সঠিক ব্যাখ্যা বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে পৌছিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি।

(চ) আগে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রিটিশবিরোধী এসব আলেম বিশুদ্ধ ইসলামি তত্ত্বের পুনর্বিন্যাস এবং ইসলামি জীবনপদ্ধতির পুনঃপ্রচলনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা এসব বিশ্বাস আগাগোড়াই অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁদের নানাভাবে হিন্দুদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হচ্ছিল বলে তাঁদের মধ্যে খানিকটা হতাশা ও নির্লিপ্ততা সৃষ্টি হয়েছিল। এর মধ্যে তুরস্কের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের দরুন খেলাফত আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে যায়। ফলে এসব আলেমের অনেকে যেমন তানজিন-তবলিগ-জাতীয় সংস্কার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন, তেমনি কেউ কেউ শিয়া-সুন্নি বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। এভাবে ধীরে-ধীরে আন্দোলনকারীদের একটা অংশ এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হন যে তা অবশেষে কোনো-কোনো স্থানে রক্তক্ষয়ী হাঙ্গামায় পর্যবসিত হয়।

এভাবে ধীরে-ধীরে মুসলিম লীগ তার প্রাধান্য বিস্তার করে এবং এসব আলেমের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

পাদটীকা:

১. শিবাজির জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যদুনাথ সরকার ১৬২৭ সালের ১০ এপ্রিল তাঁর জন্মদিবস বললেও কেউ-কেউ ১৬২৮ বা ১৬০০ সালে তাঁর জন্ম বলে মনে করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার 'ভারতকোষ' পঞ্চম খণ্ড (কলকাতা, ১৯০৩) ৪৮৯ পৃ।

২. ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি, 'শাহ ওয়ালিউল্লাহর ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা', নুরউদ্দিন আহমদ অনূদিত (দ্বি-স; ঢাকা, ১৯৭৯) ১২২ পৃ। M. A. Karandikar, 'Islam in India, Transition to Modernity' (Bombay, 1969) p 128.

৩. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, "ভারত ওহাবী আন্দোলন", 'সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস' (ঢাকা, ১৯৭১) ১২১ পৃ।

৪. কোকা আন্তোনোভা, গ্রিগোরি বোনগর্দি লোভন, গ্রিগোরি কতোভ্‌স্কি, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' দ্বিজেন শর্মা অনূদিত (মস্কো, ১৯৮২) ৩৭৩ পৃ।

৫. আবদুল মওদুদ, 'ওহাবী আন্দোলন', (ঢাকা, ১৯৬৯) ১২ পৃ।

৬. অমলেন্দু দে, 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ', (কলকাতা, ১৯৭৪) ১১৪ পৃ। Aziz Ahmed, 'Islammi Modernism in India and Pakistan, (London, 1967) p 20.

৭. আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য', (ঢাকা, ১৯৬৪) ৫১ পৃ।

৮. Dr. Faruquee, 'Deoband and the Demand for Pakistan', p. 50 Quoted in Santimoy Ray, 'Freedam Movement and Indian Muslims' (New Delhi 1979) p 27.

৯. S. N. Banerjee, 'A Nation in Making' (Calcutta 1963) pp. 72-73.

১০. P. Hardy, The Muslims of British India (London 1972) p 174. সত্যেন সেন, বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা (ঢাকা ১৯৮৬) ৪০ পৃ।

১১. S. N. Roy, op. cit. p. 36.

১২. 'মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর রোজনামচা', সংকলন ও অনুবাদ, মওলানা মুজিবুর রহমান (ঢাকা, ১৯৮৪)।

১৩. Pradyot Kumar Ghosh, "The Revolutionary Movement During World War-I", 'Freedom Struggle and Anushilan Samity, edited by Budhadeva Bhattacharya (Calcutta 1979) p 105.

১৪. মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধির রোজনামচা, প্রাগুক্ত, ৪৪ পৃ।

১৫. ঐ, ৭ পৃ।

১৬. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, ১৮৬ পৃ।

১৭. ঐ, ২০২ পৃ।

১৮. খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম (ঢাকা, ১৯৮৪) ২৬ পৃ।

১৯. P. Hardy, op. cit. p. 243-44, Quoted from Millat aur Quami (Multan 1938).

২০. A. K. Azad, India Wins Feedom (Cal. 1959 p. 4)

২১. Santimoy Roy, op. cit. p 39.

২২. A. K. Azad, op. cit. p. 227.

২৩. ঐ ২২৫ পৃ।

২৪. ঐ, ২০১ পৃ।

২৫. ঐ, ১৯৭ পৃ।

২৬. সত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, ২৪১ পৃ।

২৭. S. B. Mathur, 'Muslims and Changing India' (New Delhi 1972) p 109.

২৮. ঐ, ১১১ পৃ।

২৯. ঐ, ১১৬—১৭ পৃ।

৩০. ঐ।

৩১. আবুল ফজল, "অঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা", 'সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র (ঢাকা, ১৯৬৮) ১১২ পৃ।

৩২. আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র', (ঢাকা ১৯৬৯) ১৩৬ পৃ।

৩৩. বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত (ঢাকা) ১৯৭২, ১০৮ পৃ।

৩৪. Surendra Mohan Ghosh, Reminiscenee of Non-cooperation উদ্ধৃতি Santimoy Ray, op. cit. p. 52.

৩৫. বাংলা বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ১০৮ পৃ।

৩৬. এসলামাবাদী, "মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার", 'আল এসলাম', আশ্বিন ১৩২২।

৩৭. ঐ।

৩৮. বাংলা বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ১৬৯ পৃ।

৩৯. ঐ।

৪০. ঐ।

৪১. এম এ মামুন, "মাওলানা ফররোখ আহমদ নেজামপুরীর কর্মময় জীবন", সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মারক পুস্তিকা' (চট্টগ্রাম ১৯৭৬)।

৪২. ঐ।

৪৩. আবু মুহাম্মদ হবিবুল্লাহ, প্রাগুক্ত, ১৩০ পৃ।

৪৪. আবুল ফজল, প্রাগুক্ত, ১২২ পৃ।

৪৫. Azizur Rahman Mallick, 'British Policy and the Muslims in Bengal' (2nd edn, Dhaka 1977) p 124. আবদুল মওদুদ, 'ওহাবী আন্দোলন', (ঢাকা ১৯৬৯) ১১৮ পৃ।

৪৬. আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য', প্রাগুক্ত, পৃ ১২।

৪৭. Anil Seal, 'The Emergence of Indian Nationalism' (London 1971) p 307.

৪৮. P. Hardy, op. cit., p 242.

৪৯. ঐ, ২৪৫ পৃ।

৫০. ঐ, ২৪৩ পৃ।

৫১. ঐ, ২৪৬, পৃ।

তন্মাত্র

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সুভাষ ঘোষাল

অফিসের নীচে একটা ঘড়ির দোকান ছিল। এখন যে ঘড়ির দোকানটা আছে তা সেই আগের দোকান-এর পরিবর্তিত সত্তা। আগের দোকানের সঙ্গে এখনকার দোকানের গুণগত এবং রূপগত কোনো মিল কেউ খুঁজে পাবে না। শশীদা ছিলেন আগের দোকানের শুধু মালিক নন, প্রাণপুরুষ। তাঁরই কথা ভেবে তাঁরই দিকে তাকিয়ে অঞ্চলের মানুষ তাঁদের যাবতীয় ঘড়ি নিয়ে নিশ্চিন্তে চলে আসতেন। ঘড়ির অনেক সূক্ষ্ম কাজ কেবল কর্মচারীর ওপর ছেড়ে না দিয়ে তিনি নিজে বসে-বসে করতেন। শহরতলির বাড়িতে ফিরে যেতে তিনি প্রায় প্রতিদিন শেষ বাসের সাহায্য নিতেন। আমি মাঝে-মাঝে তাঁর দোকানে গিয়ে বসতাম। পুরোনো চেহারার সম্ভ্রম-জাগানো সব ঘড়ি দেখতে ভালো লাগত। শশীদা তখন দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিয়েছেন। পরিচিত মানুষদের কখনও-কখনও বুকে জড়িয়ে ধরছেন। খুবই সূক্ষ্ম কাজ করতে-করতে শাণিত আলোর সামনে থেকে উঠে এসে অন্যত্র বসে পড়ে আমাকে বলছেন —নতুন গান লিখেছি, সুরও দিয়েছি, শোনো। —আমার দিকে না তাকিয়ে গানের কথা বলেই গান শুরু করে দিচ্ছেন। তাঁর গান শুনে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারতাম—কোথাও কিছু একটা খুলে যাচ্ছে আর তিনি ছড়িয়ে পড়তে চাইছেন।

একদিন সকালবেলায় আমার অফিসে গিয়ে হাজির হলেন।

—নালীক, তোমার কাছে এলাম। আমার একটা উপকার করতে হবে।

—কী উপকার, শশীদা ?

—তুমি বোধ হয় জান তোমাদের এই অফিস প্রথম যেদিন খোলা হয় সেদিন আমিই প্রথম অ্যাকাউনট খুলেছিলাম। আমার অ্যাকাউনট নম্বর এক। তাই এর আগে যখনই অ্যাকাউনট বন্ধ করব ভেবে ব্যাঙ্কে এসেছি তোমাদের ম্যানেজার হাত ধরে

বাধা দিয়েছেন—এক নম্বর অ্যাকাউনট বন্ধ করবেন না। তাঁর অনুরোধে আমি আর বন্ধ করে দিতে পারি নি। কিন্তু আজ আর কোনো অনুরোধ রক্ষে করার ক্ষমতা আমার নেই। আমাকে বন্ধ করতেই হবে। এ বন্ধন আমি আর রাখব না। কী করতে হবে তুমি আমাকে বলে দাও।

আমারও ইচ্ছে ছিল তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এ ব্যাপারে ক্ষান্ত করা। তাঁর গলার স্বর শুনে বুঝতে পেরেছিলাম কোনো লাভ হবে না।

—শশীদা, আমি একটা দরখাস্ত লিখে দিচ্ছি। আপনি তাতে সই করে দিয়ে যাবেন। দশদিন বাদে আপনার প্রাপ্য টাকা পেয়ে যাবেন, আর অ্যাকাউনট বন্ধ হয়ে যাবে।

—তুমি আমাকে বাঁচালে। তাহলে দরখাস্ত লিখে দাও, আমি সই করে দিয়ে যাচ্ছি।

তিনি সই ক'রে দিয়ে চলে গেলে আমি একটু পরিণত রাতে বাড়ি থেকে তাঁর দোকানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। পরিণত রাতে যাবার সুবিধে এই যে সন্ধ্যেবেলার লোকজন তখন চলে যেতে থাকে। এমন-কি সদ্য-সাবালক কর্মচারীকে তিনি বাড়ি যাবার অনুমতি দিয়ে দেন। সেদিন আমি উপস্থিত হয়েই তাঁকে একা পেয়ে গিয়েছিলাম। তিনি একটা হাতঘড়ি নিয়ে আলোর দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

আমার পদশব্দে তিনি একবার আমাকে দেখে নিয়ে আবার নিবিষ্ট হয়েছিলেন। এই নিবিষ্ট থাকার পর্বটি একেবারে স্বল্পায়ু ছিল না। তখন দেখেছিলাম বহুদিন ধরে পড়ে-থাকা একটা বড়ো ঘড়িতে স্পন্দন শুরু হয়েছে। ঘড়িটি আমার উলটো দিকের দেয়ালে টাঙানো ছিল।

তিনি কাজ শেষ করে উঠে এলেন। আমাকে একবার দেখে নিয়ে আস্তে-আস্তে বললেন—প্রেমাশ্রু চোখের কোন্ কোল দিয়ে ঝরে বলো তো ?

—কোন্ কোল দিয়ে ? আমি তো জানি না।

—বাঁ চোখের বাঁ কোল দিয়ে আর ডান চোখের ডান কোল দিয়ে।

দোকান বন্ধ করে তিনি আমাকে নিয়ে বাস-রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। পদাতিকের সংখ্যা অত্যন্ত কমে গেছে। গাড়ি যাচ্ছিল মাঝে-মাঝে। যে-কোনো সময় তাঁর বাস এসে পড়বে। তিনি আমার হাত চেপে ধরে সাশ্রুনয়নে মিনতির সুরে বললেন—ভাই, একটা কথা মনে রেখো। কে কোন্ ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে তা চোখ দিয়ে না দেখে বোধ দিয়ে দেখবে।

অফিসেই সাতসকালে একদিন চলে এল অংশুময়।

—অংশু, তুমি এখন ?

—আমার এক পিসিমার কথা তোমাকে তো অনেক বার বলেছি। তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না। নব্বই বছর বয়স হল। এখন যে-কোনো দিন চলে যেতে পারেন। আমি আজ বিকেলের দিকে দেখতে যাব ভাবছি। তুমি যাবে ?

—নিশ্চয়ই যাব। তুমি দুপুর-দুপুর আমার অফিসে চলে এসো। এখান থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ব।

অংশুময় কয়েকবার আমাকে তার স্বরচিত পিসিমার কাছে নিয়ে যাবার কথা বলেছে। শুনেছি অত্যন্ত অল্প বয়সে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাহাড় পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর সমস্ত যৌবন পথে-পথে কেটেছে। কোনো এক উচ্চতা থেকে একবার তাঁকে ঠেলে নীচে ফেলে দিয়েছিল কিছু ঈর্ষান্বিত পাণ্ডা। তিনি বেঁচে যান, কিন্তু তাঁর মেরুদণ্ড দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে পিঠের ওপর কুঁজের মতো একটা পিণ্ডের সৃষ্টি করে। আমি সেদিন গিয়ে সেই প্রাচীন অত্যাচারের স্মারক দেখেছিলাম। তার আগে দেখেছিলাম একটি পরিব্যাপ্ত বিকেল-স্বচ্ছতা যেখানে অংশুময় আমাকে নিয়ে দাঁড় করাল। সামনে এমন একটা পুকুর ছিল যা জলময় ও স্নেহভাজন। একজন অবগাহন স্নান করছিলেন। সমস্ত জায়গাটা তাঁর অবাধ উচ্চারণে ভরে উঠেছিল :

ন জানামি দানং ন চ ধ্যান-যোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র-মন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ভবানি॥

আমরা তাঁর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।
—কাকে খুঁজছেন!

—পিসিমা আছেন?

—একটু আগে এখান দিয়ে যেতে দেখেছি। দেখুন তো ঘরে আছেন কিনা। অংশুময় আমাকে নিয়ে বড়ো উঠোন পার হচ্ছিল। তখনই সে পিসিমাকে পেয়ে যায়। এক বৃদ্ধা কুঁজো হয়ে লাঠি ভর দিয়ে প্রসারিত বারান্দার একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিলেন। তাঁর খোলা চুলে তখনও ছিল দৈর্ঘ্য এবং প্রাবল্য। অংশুর ডাকে তিনি থেমে ধীরে-ধীরে পেছন ফিরলেন।—কে?

—আমি অংশু, পিসিমা। আমার বন্ধু নালীককে নিয়ে এসেছি।

—ভালো করেছ। তোমরা আমার ঘরে গিয়ে বোসো। আমি আসছি।

একটি পুরোনো ঘরের সমস্ত জানলা খোলা ছিল। কোনো এক জানলার পাশে মেঝেতে বিছানা এত ছোটো করে পাতা ছিল যে যখন-তখন হাতে নিয়ে চলে যাওয়া যায়। সমস্ত ঘরের এক কোণে যে সংকোচময় শয্যা তাকে ঘিরে দু-একটা কৌটো ছিল। এ-ছাড়া আর কোথাও কোনোরকম জিনিসপত্র দেখি নি। তিনি লাঠি ঠুকে-ঠুকে ঘরে ঢুকলে আমরা তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি তাঁর হাত আমাদের মাথায় রেখেছিলেন এবং বিছানায় গিয়ে বসেছিলেন। খুবই কম সংলাপ আমাদের মধ্যে এসেছিল। যতদূর মনে পড়ে তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। নাম কার রাখা তাও তাঁর প্রশ্নের মধ্যে ছিল। এবং উঠে আসবার আগে এমন একটা সময় এসেছিল যখন কোনোপক্ষ থেকেই কোনো শব্দ আসে নি। আমরা বলেছিলাম—আজ তবে আসি, পিসিমা? তিনি বলেছিলেন—এসো। বহু সুকৃতির ফলে মানবতনু লাভ করেছ। একে হেলায় হারিও না।

কে খবরটা দিয়েছিল? বোধহয় পাড়ার ওষুধের দোকানের নিখিল। আমি তখন তেমন-তেমন খবর পেলে ছুটতাম। এক্ষেত্রেও ছুটেছিলাম। শহরের সব-চেয়ে বড়ো ফুলের বাজারের কাছে শত-শত মানুষ বসেছিলেন। এঁদের লক্ষ্য এক, কিন্তু পথ আলাদা। এঁরা জলপথে দূরে চলে যাবার জন্য জলযানের অপেক্ষায় ছিলেন। বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মত ও পথের অংশীদারেরা দলবদ্ধ হয়ে বসেছিলেন। এক জায়গা একেবারে ঘিরে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সেই আবেষ্টনীর মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেবলমাত্র কৌপীনধারী ও ভস্মাচ্ছাদিত। কোথাও গভীর কালো পোশাক পরা পাঁচজনের একটি ছোট্ট উদ্ভাস রচিত হয়েছিল। আবার কোথাও জটাদ্বিত কিছু শরীরের সঙ্ঘবদ্ধ উপবেশন ছিল। আর-একটা দিক ছিল যেখানে কিছু মানুষ বসেছিলেন যাঁর-যাঁর ব্যক্তিগত মুদ্রায়। সেখানে কোনো গোত্র চেনার উপায় ছিল না। আমি কোথায় কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে ঠিক বুঝতে না পেরে একদিক থেকে অন্যদিকে বিশৃঙ্খল। দেখছিলাম কোনো কোনো অগ্নিকুণ্ড। গৃহস্থেরা নির্ভয়ে এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে ফোঁটা নিচ্ছে। উপবিষ্টদের কাউকে-কাউকে আলু পুড়িয়ে খেতে দেখা যাচ্ছিল। আমি হঠাৎ লক্ষ করলাম যে দিকটাতে ঠিক সম্ভব নেই, ব্যক্তিগত সব উপবেশন আছে সেদিকের একজন হাত-ছানি দিয়ে আমাকে ডাকছেন। তক্ষুনি সেখানে না গিয়ে অন্যদিকে ইচ্ছে করেই চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় সেই একই হাতছানি দেখে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি ইশারায় তাঁর পাশে আমাকে বসতে বললেন। আমি বসতে যাচ্ছি, অত্যন্ত অনুচ্চ স্বরে নির্দেশ পেলাম—'চপ্পল খোলো।' চটি খুলে তাঁর পাশে বসে আছি। কোনো কথা নেই, কোনো বিচলন নেই। আধুনিক পোশাকের এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ চেহারার একজন এসে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন।—'আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?' তাঁর প্রশ্নের মধ্যে জালের ওপারে টেনিস-বল পাঠানোর তৃপ্তি ছিল। যাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি বিন্দুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে অন্যমনস্কভাবে এবং নির্ভার হাসির সঙ্গে উত্তর দিলেন।—'ইয়হ্ তো এক সেন্স্ হ্যায়।' প্রশ্নকর্তা স্থান ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু আমি কিছুক্ষণ বসেছিলাম। বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ বাঁদিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম আমার থেকে ঠিক তিন-চার হাত দূরে বিশাল গঙ্গা। সেদিন খোলা আকাশের নীচে গঙ্গার পাশে এবং মৌনের পাশে মাটিতে বসে-বসে কিছু না বলে উঠে আসার মধ্যে আমি কিছু মাতৃভাষা পেয়েছিলাম।

গত বছর দিদির বাড়ি কদিন ছিলাম। ফেরার পথে আমাদের ট্রেনের কামরায় একটি ছোটো মেয়ে বাঙ্কে উঠে রাত কাটানোর বায়না ধরেছিল। সে যে বাঙ্কটা চাইছিল সেখানে আমার রাত কাটানোর কথা ছিল। তার মা-বাবার সম্মিলিত নিষেধও তাকে নিরস্ত করতে না পারায় আমি নেমে এসে তাকে উঠিয়ে দিয়ে-ছিলাম। অবশেষে সে খুশি হয়ে হাসতে পেরেছিল। আমি তার হাসি দেখে নীচে জানলার কাছে তার বাবার কাছে গিয়ে বসেছিলাম। এবং রাত গভীর হয়ে উঠছিল। আমি যে কখন তন্দ্রাস্থ হয়েছিলাম জানি না। মেয়েটির বাবার ডাকে শেষ পর্যন্ত চোখ খুলে যায়। —ও মশাই, যমুনার ওপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে, দেখুন, দেখুন। দেখলাম। ঘাটে নৌকো বাঁধা রয়েছে। প্রতিটি নৌকোর নিজস্ব আলো ফুটে-ফুটে সেই অনাহত জলরাশির ওপর রাত্রির দরবার দেখিয়ে দিয়েছিল নীরবে।

শুধু অফিসেই নয়, প্রতিদিন সন্ধের ঠিক পরেই যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাব নিজেও ঠিক বুঝতে পারি না, তখন এই ধরনের কয়েকটি নীরবতার স্মৃতি আমাকে পা ফেলে এগিয়ে চলার সামর্থ্য যুগিয়ে যায়। কখনও-কখনও কারও কাছে বা কারও বাড়িতে না গিয়ে যে পথগুলিকে জ্ঞান হবার পর থেকে দেখে আসছি সেগুলির পরিমণ্ডলে ডুবে যাবার ইচ্ছে হয়। বাড়ির পেছন দিকে এমন কয়েকটি পথ আছে যা এত রূপান্তরের যুগেও রূপে রয়ে গেছে। সেসব পথ দিয়ে হাঁটলে এখনও বিস্ফারিত বরাহদের আপনমনে রাস্তা পার হতে দেখা যাবে। এদের যারা পালন করে তাদের বড়ো-বড়ো বস্তি দেখা যাবে। আর বস্তির শুরুতে এবং পথের পাশে এমন একটা ছোট্ট ঘর দেখা যাবে যা আমি কখনও খোলা দেখি নি। ঘরের ওপরে ভুল বানানে কোনোমতে ঘোষণা করা হয়েছে যে কেউ তাজা শূকরমাংসের সন্ধানে থাকলে সে এই ঘর থেকে তা ঠিক পেয়ে যেতে পারবে। কয়েকদিন আগে সকালবেলায় এই রুদ্ধ ঘরের দরজায় আমি স্বচক্ষে শোণিতচিহ্ন দেখে গিয়েছিলাম। বহু পুরোনো বিবাদের সূত্র ধরে ঠিক এই ঘরের সামনে একটি ছেলেকে শেষ করা হয়েছিল। হত্যাস্থলের পেছন দিকে একটু যদি কেউ এগিয়ে যায় তবে সে জলের যে গলিটাকে দেখবে তাকে আজও গঙ্গার মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। তাকে আমি যখনই দেখি তখন আমার একবার করে দিদিমার কথা মনে পড়ে যায়। দিদিমা চিরকাল এমন একটা অঞ্চলে থেকে জীবন কাটিয়ে দিয়ে গেছেন যার খুব কাছে যে আপূর্যমানতা ছিল তাকে শহরগঙ্গার শ্রেষ্ঠ বিস্তার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আমি বহুদিন তাঁর সেই বড়ো গঙ্গা-স্নান দেখেছি। আমাকে পেলে তিনি আমার হাত ধরে সাবধানে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতেন। আমি তেল মাখতে-মাখতে বহু দূরে স্টীমার দেখতে পেতাম। আর ঘাটের কাছেই থেমে থাকা নৌকোগুলির ভেতরে চলত রান্নার আয়োজন। দিদিমা আমাকে তেল মাখাতে-মাখাতে তাঁর বহু বান্ধবীর সঙ্গে প্রাত্যহিক কথাবার্তা সেরে নিতেন। মনে আছে আমাকে ঘাটে দাঁড় করিয়েই দিদিমা মামার বিবাহের প্রাথমিক পর্ব শেষ করেছিলেন। এখানে দাঁড়িয়েই

তিনি ভাবী পুত্রবধূর সন্ধান পেয়ে যান। আমাকে স্নান করানোর আগেই দিদিমা তাঁর ডুবস্নান একবার করে রাখতেন। তারপর শুরু হত আমাকে হাত ধরে টেনে নামানোর মতো কঠিন কাজ। আমার ডুবে যাবার ভয় আর আমাকে তিনবার ডুবিয়ে আবার তিনবার তুলে নেবার জন্য দিদিমার প্রযত্ন অনেকক্ষণ ধরে ঘটে যেত। দিদিমা আমাকে ডুবিয়ে আবার তুলে ধরে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এমন এক মুহূর্তের কথা বলতে গেলে তাঁর একটি বাক্যের কথাও বলতে হয়। তিনি সান্ত্বনাদানে ব্যস্ত থেকে বলেছিলেন —'তুই গঙ্গার কাছে সাহস যাজ্ঞা কর। তা-লে তোর এত ভয় কেটে যাবে।' আমি স্নান সেরে সিঁড়িতে বসে দিদিমার স্নান দেখতে-দেখতে প্রশ্ন করেছিলাম —'দিদিমা, যাজ্ঞা মানে কী?' দিদিমা বিস্ময়ের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন—'তুই নাকি পরীক্ষায় ভালো ফল করিস। আর যাজ্ঞা মানে জানিস না।' সেদিন ফেরার পথ দিদিমার তিরস্কারে পূর্ণ ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় বাড়ির পাশের এই জলধারা ছোটো হলেও প্রাণবন্ত ছিল। ছিল না এখনকার মতো শুধুমাত্র কলুষে আবদ্ধ। চূড়ামণি-যোগে এই গঙ্গার দুপাশে ভিখারিরা বসেছিল। দিদিমা সেবার আমাদের বাড়িতে ছিলেন। তিনি এক-কৌটো খুচরা পয়সা নিয়ে আমার সঙ্গে বিকেল-বেলায় এই ছোটো গঙ্গার দিকে যেতে-যেতে ডাইনে বাঁয়ে পয়সা রেখেছিলেন। আমাকে নিয়ে ডুব দেবার সময় তাঁর সমস্ত মুদ্রায় ফুটে উঠেছিল বৃহতের প্রতি অর্পিত অনুরাগ। তিনিই প্রথম সক্রিয়ভাবে আমাকে প্রতীকের মূল্য দেখিয়ে দিয়ে যান। জলের গলির পাড় ধরে যেতে-যেতে নির্ভয়তা যাজ্ঞা করি গঙ্গার কাছে।

জলরেখা ধরে চলে যাওয়া যায় বহুদূর। বুবুন এই জলরেখা ধরে একদিন দৌড়েছিল। তার দুপাশ দিয়ে চলে যায় গুলি। আমি যখন এই জলরেখা ধরে হাঁটি আমি জানি বাইরের কোনো বিপদ নেই। জলরেখায় হয়তো একটাই নৌকো, কিন্তু জলপথের তুলনায় এত বিস্তৃত যে মনে হয় দুপাড় জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেন যে অপেক্ষা করে জানি না। তবে কি মাঝি মাঝে-মাঝে এসে দেখে যায় এমন কিছু যা না দেখলে তার বড়ো-বড়ো জলযাত্রা শূন্য হয়ে যেতে পারে? কিছুদূর হেঁটে গেলে ঘাট পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। প্রথম ঘাটে সাধারণত শাঁখা ভেঙে ভাসিয়ে দেবার প্রচলন আছে। শাড়ি ছেড়ে থান পরে উঠে আসার দৃশ্য আছে। দ্বিতীয় ঘাটে ডুব দিয়ে উঠে পুরুষ সব-কিছু ছেড়ে ধুতি পরে। গলায় ধড়া ঝুলিয়ে আনমনা হয়ে বাড়ির পথ ধরে। তৃতীয় ঘাটের মাথায় মাটির মেয়ের কোলে মাটির পুরুষ শুয়ে আছে। সধবারা দল বেঁধে এসে এই মাটির মেয়ের মাথায় থোকা-থোকা সিঁদুর দিয়ে চলে যায়। মাটির পুরুষও চর্চিত হয়ে উঠেছে ঝরে-পড়া সিঁদুরের সামর্থ্যে। শুধু কি এইটুকু? শুধু কি মৃন্ময়ীর কোলে বসে আছে মৃন্ময়? আর কিছু নয়? দিদিমা আমাকে প্রতীকের মূল্য দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই এই পৃথিবীতেই চিন্ময়-চিন্ময়ীর সহাবস্থানের কথা মনে পড়ে যায়। এই পৃথিবীকে বাদ দিয়ে কোনোরকম বাদানুবাদে যাবার ইচ্ছে যেন শেষ হয়।

হাঁটতে-হাঁটতে কখনও-কখনও ইমারতের মধ্যে চলে যাওয়া যায় সহজে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙে সর্বোচ্চ তলায় উঠে গেলে বৈষ্ণবশাসিত গ্রন্থাগার। প্রায় জনহীন। প্রথমদিন আমি গ্রন্থের বহু স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে সমৃদ্ধির গন্ধ পেয়েছিলাম। তখনই তো শুরু হয়েছিল নীচের অন্তত ছুটি তলায় সংকীর্তন। সেই শব্দ সর্বোচ্চ তলায় উঠে এলে আমি ধীরে-ধীরে মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকধারী এক প্রবীণের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।—এখানে বই পড়তে গেলে কী করতে হবে?

—তেমন কিছু করতে হবে না। একটা ফর্ম দেব, সেটা পূরণ করতে হবে। তারপর তাক থেকে বই নামিয়ে এখানে বসে পড়তে পারবেন।

কথা শেষ করে আবার আমি গ্রন্থ থেকে গ্রন্থের কাছে গিয়ে-গিয়ে সমৃদ্ধির মাপ নেবার চেষ্টা করেছিলাম কিছুক্ষণ। তখনও সংকীর্তন চলছে। শব্দের ঊর্ধ্বে উঠে আসার বিরাম নেই। এক সময় লম্বা টেবিলের ওপর পড়ে থাকা কিছু স্মারক-পত্রিকা উলটে দেখে নিলাম। এইভাবে কিছু সময় কাটিয়ে পরিচালকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি কিছু একটা টাইপ করছেন। টাইপ করতে-করতে আমাকে আবার দেখে ফেলতে তাঁর আটকায় নি। —আপনি কিছু বলবেন? জ্ঞাতব্য কিছু থাকলে নিশ্চয়ই বলবেন।

—আমি এখানকার সভ্য হতে চাই। আমাকে সেই ফর্ম দিলে আমি এখনই যা লেখার লিখে দিতে পারি। খুব ভালো-ভালো বই আছে। আমি আর দেরি করতে চাই না।

—শুনুন, আপনাকে একটা কথা বলা হয় নি। ফর্ম কিন্তু চাইলেই আমরা দিই না। আপনি নিয়মিত-ভাবে কিছুদিন এখানে আসুন। টেবিলের ওপর যেসব পত্রিকা আছে ওগুলি পড়তে থাকুন। আমাদের বুঝতে দিন যে আপনি সত্যিই আগ্রহী। তা না হলে তো ফর্ম দিতে পারব না।

আমি লজ্জিত হয়েছিলাম।—আচ্ছা, আজ তাহলে আসি?

—আসুন। তবে অনুরোধ, মাঝে-মাঝে আসবেন কিন্তু। দেখবেন ভালো লাগবে। আনন্দ পাবেন। মনকে আমরা ঠিকমতো খাদ্য দিতে পারি না। এখানে মনের খাদ্য পাবেন। কিছুদিন আসুন না, ফর্ম পেতে অসুবিধে হবে না।

ছেলেবেলায় যেখানে খাটাল দেখেছি এখন সেখানে যে ইমারত উঠে গেছে তাতে আশিটি পরিবার বাস করছে। ভেতরে ঢুকতে গেলে দারোয়ানের প্রশ্নের জবাব দিতে হতে পারে। দারোয়ান পেরিয়ে লিফট। সেখানে সব সময় মানুষ থাকে না। নিজেকেই বোতাম টিপে সাততলায় চলে যেতে হয়। আমার কলেজ-জীবনের এক অধ্যাপক এই বাড়ির সাততলায় চলে এসেছেন। এই বাড়িতে আসার আগেই তাঁর স্ত্রী আমাকে স্নেহভাজন করেছেন। বহু পাখির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—জানো নালীক, জীবনে অন্তত একটা দিক খোলা রাখতে হয়।—তাঁর কাছে বহু পাখির নাম আমি প্রথম শুনেছি। তিনিই আমাকে প্রথম বলে-ছিলেন, ডোডো পাখি মানে অবসান। তাঁর ফুটফুটে মেয়ের গা থেকে জামা খুলতে-খুলতে তিনি একদিন আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। পাঁচ বছর আগে আমাদের বাড়ি থেকে মার প্রিয় টিয়াটি উড়ে যায়। বাড়ির যেসব কাজ মা ছাড়া হবে না মা সেসব সেরে ফেলে টিয়াটিকে নিয়ে বসতেন। তাকে মানুষের ভাষা শেখানোর জন্য তাঁর অক্লান্ত সব প্রয়াস ছিল। কেউ খেয়াল করে নি, খাবার দেবার সময় বা স্নান করানোর সময় কখন যে খাঁচার দরজা খোলার পর বন্ধ করার কথা ভুলে যাওয়া হয়েছিল। উৎপিঞ্জর হবার এই সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে টিয়া খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথমে খাঁচার ওপরে বসেছিল। অপর্ণা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ছুটে যায়। তখন সে উড়ে ঘরে এসে বসে। অপর্ণার ঘরে যেতে দেরি হয় নি। কিন্তু সে তখন ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে গেছে। আড়ষ্ট ডানা থেকে মুক্ত পক্ষে নীলিমার দিকে। মা খুব ভেঙে পড়েছিলেন। আমি খাঁচা সাবধানে রেখে নতুন পাখির সন্ধানে ছিলাম, যদিও পরাধীনতার অভিষেক নিয়ে নিজস্ব অপরাধবোধ ছিল। তখন বউদি দু-একটা পাখির নাম করেছিলেন। —জানো, এসব পাখি খাঁচায় থাকতে ভালোবাসে। তা ছাড়া খাঁচায় তাদের বংশবিস্তার হয়। —মাঝে-মাঝে সাততলায় গিয়ে পড়লে বউদিদের দরজার সব জটিলতা দেখে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, তাঁরা ভিতরে আছেন নাকি বাইরে বেরিয়েছেন। মাঝে-মাঝে তাঁরা ভিতরে থাকলেও দরজায় তালা লাগানোর ব্যাপারটা থাকেই থাকে। কী যে অস্বস্তিতে পড়ি। ভ্রমরের মতো কালো ঘণ্টাটি টিপব কি টিপব না—এই চিন্তায় কিছু সময়

যায়। একই অস্বস্তিতে পড়ে যাই আজকাল জয় যখন জিজ্ঞেস করে—বাবা, জয় মানে কী? 'জয়' মানে কি এগিয়ে যাওয়া বলব, নাকি দুহাত ভরে কিছু পাবার কথা বলব, নাকি বলব জয় মানে একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়া, আমি কিছুতেই কিছু বুঝতে পারি না। বউদি ঘরে থাকলে আমাকে তাঁর বুদ্ধিমতী মেয়ে ও তার পড়ার বইয়ের পাশে বসিয়ে রান্নাঘরে চলে যান। কাজের মেয়েটিকে নির্দেশ দিয়ে ফিরে আসতে বেশি সময় খরচ হয় না। এবার তিনি আমাকে মেয়ের কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে বারান্দায় এনে বসান। বারান্দায় চা আর খাবার আসে। তিনি সামান্য কিছু চানাচুর নিয়ে চানাচুর, বিস্কুট আর শোনপাপড়ির ডিশ আমার দিকে ঠেলে দিয়ে চায়ে চুমুক দেন আর প্রশ্ন রাখেন। —নতুন কিছু লিখছ? তোমার দাদা বলছিল তুমি কোথাও যাও না, কারও সঙ্গে যোগাযোগ কর না, এভাবে কিছু হওয়া কঠিন। ছুটির সকালগুলো তুমি কাজে লাগাতে পার। যাদের কাছে গেলে কাজ হয় তাদের কাছে যেতে পার।

আমি হয়তো সাততলার বারান্দা থেকে পথ আর খচিত নক্ষত্র কেমন তা দেখে নিয়ে চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে লক্ষ করি, বউদি আলখাল্লার মতো এমন একটা পোশাক পরে বসে আছেন যার নাম আমি ঠিক জানি না, কিন্তু যার প্রয়োগ স্টল আলো করে ছড়িয়ে থাকা বহু পত্রিকার প্রথম পাতায় দেখেছি। বউদি আমাকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে কখনও ভোলেন না। তিনি নিজেই বোতাম টিপে লিফটকে আহ্বান করতে থাকেন। ঠিক সেই সময় তাঁর মনে পড়ে যায় —তুমি তো অফিসের পরীক্ষাতেও বসছ না। এটা কিন্তু ঠিক নয়। নিজেকে প্রমাণ করা দরকার। আমি লিফটের মধ্যে ঢুকে গেলে হাত নাড়াতে-নাড়াতে তাঁর শেষ কথা তাঁর হাসির সঙ্গে বেরিয়ে আসে। —নালীক, একটা কিছু করো।

কোনো-কোনো দিন পথ আর ইমারত কোথাও তেমন করে যাওয়া হয়ে ওঠে না। অথচ বাড়িতেও থাকি না। বেরিয়ে পড়ি। হয়তো দুপাশে বহুবর্ণ ভিখারিদের রেখে এমন কোথাও ঢুকি যেখানে ধুতি আর গেঞ্জি পরে মানুষ শিকারের জন্য বহু মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের সামনে পেছনে পাত্রের পর পাত্রে দোকানের পর দোকান জুড়ে সাজানো থাকে হলুদ বর্ণ, নানা আকার এবং এক রকমের মিষ্টি। তারা সমস্বরে আমাকে ঘিরে ধরে বলে ওঠে—ভিতরে যাবেন নাকি? ভিতরে গেলে আমি একাই ভিতরে যাব, কাউকে নিয়ে কখনোই নয়, এ-কথাটা বোঝাতে কোনো-কোনো দিন ভিতর পর্যন্ত চলে যেতে হয়। ভিতরে আমি দেশ আর কালের অনেক পরিচিত মানুষকে পেয়ে যাই। তারা সবাই নানা দিক থেকে এসে একটি ছোটো ঘরের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে তাকিয়ে নত হবার চেষ্টা করে। কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে ত্রিনয়ন আছে, উদ্গত জিভ আছে, আছে লোহিত অবস্থান শত-শত বছর ধরে। কেন্দ্রবিন্দুর সামনে বড়ো-বড়ো প্রদীপ জ্বলে, ঘণ্টাধ্বনি হয় এবং প্রতিষ্ঠিত মানুষও গলা খুলে গেয়ে ওঠে—'বসন পরো মা।' পেছনে যূপকাষ্ঠ। তার পাশে মোম জ্বলে, কে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় দেখতে পাই না। তবে এই সেদিন গিয়ে দেখলাম একজন প্রায় নিঃশব্দে একপাশে বালি আর সিমেন্ট রেখে খুবই মনোযোগের সঙ্গে যূপকাষ্ঠের চারদিক বাঁধিয়ে দিচ্ছে।

আজ সকালে আমি তখনও বিছানা ছাড়ি নি, কিন্তু জয়ও অপর্ণার সঙ্গে উঠে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওকে সবাই মিলে কদিন ধরে বুঝিয়েছে, তুমি ট্রেনে চেপে কু-ঝিক্-ঝিক্ করে সমুদ্র দেখতে যাবে। জয় ভোরবেলায় জেগে গিয়ে মাকে জাগিয়েছিল।—মা, ওঠো ওঠো, কু-ঝিক্-ঝিক্ করে সমুদ্র দেখতে যাবে না?

ঘুমচোখে অপর্ণার বিরক্তি বেশি।—মাম্পি চুপ করে শুয়ে থাকো। আমরা তো বিকেল বেলায় যাব।

কী হচ্ছে কী। বিরক্ত করলে তোমাকে নেব না কিন্তু।

জয় তখন মাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমি প্রশ্ন করি—মাম্পি, আমাকে সমুদ্রে নিয়ে যাবে তো?

—না না, তোমাকে নেব না।

—কেন, আমি কী করলাম, আমাকে নেবে না কেন?

—বাবারা সমুদ্রে যায় না। বাবারা সমুদ্রে গেলে ডুবে মরে যায়। বড়ো-বড়ো ঢেউ আছে কিন্তু।

এর কিছু পরে অপর্ণা বাধ্য হয়েছিল বিছানা ছাড়তে। জয় তাকে অনুসরণ করে। আমি শুয়ে-শুয়ে আলস্যে ডুবে থাকি। তখনই গলির মধ্যে কেউ ঢুকে পড়ে আমার শোবার ঘরের দরজার কড়া নেড়েছিল।—কে?

—একটু শুনবেন?

জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি এক লম্বা আর সুদর্শন যুবক। সুসজ্জিত এবং শ্মশ্রুল। হাতে ব্যাগ। —আমি কিছু বই এনেছি, একটু দেখবেন?

আমি একটু বিস্মিত হয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলাম। ফলে জানতে পারলাম বিশ্বজোড়া একটি দেশের স্থানীয় প্রতিনিধি হয়ে তিনি শিশু আর যুবতীদের জন্য কিছু বই নিয়ে এসেছেন। তাঁকে ভেতরে এনে বসাতে বাধ্য হয়েছিলাম।—আপনার ছেলে যদি ইংলিশ-মিডিয়ামে পড়ে এই বইগুলো তার কাজে লাগবে।

—আমার ছেলে এখনও খুবই ছোটো। আর একটু বড়ো না হলে এসব বই ঠিক কাজে লাগবে না।

—মেয়েদের ওপর কিছু ভালো বই আছে, পত্রিকা আছে। গ্রাহক হলে একটা নতুন ক্যালেনডারও পাবেন। আপনি একটু বউদিকে ডেকে দিলে ভালো হয়।

অপর্ণা বাথরুমে ছিল। বেরিয়ে এলে তাকে বাইরের ঘরে বই দেখতে যাবার কথা বলি। সে চুল বেঁধে পাউডার মেখে শাড়ি পালটে তবে যায়। ফলে বেশ কিছুটা সময় ওই প্রতিনিধিকে বসে থাকতে হয়েছিল একা-একা। কিন্তু অপর্ণা ঢুকলে তিনি অক্লান্তভাবে এবং হাসিমুখে কাজ শুরু করে দেন। শোবার ঘরের দরজায় ঠিক তখনই কড়া-নাড়ার শব্দ পেয়েছিলাম আবার। —কে?

—একটু শুনবেন?

উঁকি মেরে দেখি গৈরিকে ঢাকা বৃদ্ধ। হাতে বাঁধানো খাতা।

—কিছু সাহায্যের জন্য এসেছি।

—কোথা থেকে আসছেন?

উত্তরে তিনি যে আশ্রমটির নাম করলেন হিমালয়ের প্রবেশদ্বারে তার নাম কে না জানে? আমি তাঁকে ভেতরে এসে বসতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি রাজি হন নি। বরং রৌদ্রে দাঁড়িয়ে খাতা খুলে অবাধ গতিতে আমার নামটিকানা আর সাহায্যের পরিমাণ লিখে গিয়েছিলেন।

ট্রেন ছাড়তে কোনো দেরি হয় নি। এই তো কয়েক ঘণ্টা আগে মামা-মামীর পাশে অপর্ণা আর জয়কে বসিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছি। যে বাসটাতে ফিরি তা বাড়ির মাইল খানেক আগে এসে অন্যদিকে চলে যায়। আমি নেমে পড়ে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। তখনই ট্রাফিক আলোয় দাঁড়িয়ে-থাকা গাড়িগুলোর কোনো একটা থেকে ডাক আসে। —নালীক, কোথায় যাচ্ছ? পেছন ফিরে সঠিক গাড়ির দিকে তাকাতে একটু সময় লাগে। গাড়ির মধ্যে অংশুময়। তার পাশে একটি মেয়ে, কিছুটা স্থূল কিন্তু অনেকটা উজ্জ্বল। আমি বোধ হয় এর কথা কিছুদিন ধরে শুনে আসছি। এত বছর বাদে একে নিয়েই বোধ হয় অংশুময় বিন্যস্ত হবার কথা মন দিয়ে ভাবছে।

—বাড়ি ফিরছি, অংশু।

—এসো, উঠে এসো। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।

—এই না না। আমি দু-একটা কাজ সেরে বাড়ি

ফিরব।

—গৌরী, এই হচ্ছে নালীক।

দুজনেই হাত জোড় করে হেসে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে চলতে শুরু করে গাড়ি।

কয়েক ঘণ্টা আগে সোজা বাড়ি ফিরতে পারি নি। মাসিমা বলেছিলেন ফেরার পথে অপর্ণাদের ভালোভাবে রওনা হতে পারার খবরটা দিয়ে যেতে। সুজনদা এখন শহরে নেই। সে এখন পর্বতারোহণে তত ব্যস্ত নয়। বরং পাহাড় থেকে নেমে এসে পাহাড়ের পাদদেশে যারা থাকে সেইসব আদিবাসীর তরুলতা নদনদী এবং জীবন নিয়ে তাকে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। এই তো সেদিন তার প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক রূপায়ণে শহর থেকে অনেক দূরে গিয়ে দু-একজন মন্ত্রীও তাঁদের বক্তব্য বলে এসেছেন। এমন-কি প্রকৃতির নানা দিক নিয়ে আলোচনার সূত্রে সেখানে শিক্ষাময় সব শিবিরবাসও ঘটেছিল। শিবির ভাঙার আগে উঁচু টিলায় উঠে আগুন জ্বালিয়ে অন্তত পঞ্চাশ-জনের একটি দল যে সমস্বরে একটি অঙ্গীকারপত্র পাঠ করেছিল তা আমি শুনেছি। এই অঙ্গীকারপত্র আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নেবার সময় সুজনদা বলেছিল—'নালীক, এমনভাবে লিখবি যাতে স্তোত্র-স্তোত্র ভাব ফুটে ওঠে।' চেষ্টা করেছিলাম। —'আমার উত্তরে আমার দক্ষিণে আমার পূর্বে আমার পশ্চিমে আমার শব্দে আমার নৈঃশব্দ্যে যা বিরাজিত এবং যা বিস্তৃত তারই নাম প্রকৃতি···।'

মাসিমাকে ওদের নিরাপদে ট্রেনে ওঠার খবর দিয়ে শোণিমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

—শোণি বোধ হয় ছাদে আছে, ছাখো তো।

বহুদিন বাদে ছাদে উঠেছিলাম। শোণিমা এখন পড়া শেষ করে পড়াতে গেলে কী করতে হয় সেইসব পড়া পড়ছে। ছাদের দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে সে ঝুঁকে পড়েছিল।

—পুরোনো বাড়ি, অত ঝুঁকে পোড়ো না, শোণি।

শোণিমা চমকে পেছন ফিরল।

—তুমি কখন এলে?

—এইমাত্র।

—দিদিদের ট্রেন কখন ছাড়ল? মাম্পি কান্নাকাটি করে নি?

তার সমস্ত প্রশ্নের যথাসাধ্য জবাব দিয়ে আমি অনাবরণ মেঝেতে বসে পড়ে আমার প্রশ্নের অবতারণা করার জন্য শোণিমাকে বসতে বলেছিলাম।

—নালীকদা, কী গো তুমি, ওই ধুলোর মধ্যে বসে পড়লে। আমি ওখানে বসতে পারব না। কিছু মনে কোরো না, এখানেই বসে পড়লাম।

শোণিমা আমার থেকে একটু দূরে ছাদের দেয়ালের কাছে কাঠের বাক্সের ওপর বসলেও আমরা মুখোমুখি আসীন হতে পেরেছিলাম।

—শোণি, তোমার সেই বন্ধুর নাম কী ছিল যেন? ওই যে, যে এয়ারপোর্টের কাছে থাকত?

—তুমি সুতপার কথা বলছ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সুতপা। মনে আছে সুতপা তোমাকে একটা ফুলের কথা বলেছিল? খুব সুন্দর দেখতে, খুব সুন্দর গন্ধ। আর কাণ্ডের শরীর ফুঁড়ে ফুলের স্তবক বেরিয়ে আসে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নাগলিঙ্গম। রাজভবনের সামনে নাকি নাগলিঙ্গমের গাছ আছে।

—নাকি নয়, সত্যিই আছে। আমি এই কিছুদিন আগে একটা বইতে এর উল্লেখ পেয়েছি। সরকারি অনুদানে বইটা বেরিয়েছে। বইটার মধ্যে নাগলিঙ্গম-এর কথা বলতে গিয়ে লেখক রাজভবনের কথা বলেছেন।

—সুতপা তখন অনেক খবর রাখত। গত বছর ওর বিয়ে হয়ে গেছে।

—শোণি, এই রোববারে আমার সঙ্গে যাবে?

—কোথায় নালীকদা?

—রাজভবনের সামনে। নাগলিঙ্গম দেখে আসব।

শোণিকে রাজি করাতে একটু কষ্ট হয়েছিল। সে তার স্বাভাবিক এক শারীরিক অস্বস্তির কথা

তুলেছিল। বলেছিল কদিন পরে যাবে। কিন্তু আমি আর দেরি করতে চাইছিলাম না। আমার উৎসাহ আমার অসহায়তার দ্বারা রঞ্জিত দেখে শোণি শেষ পর্যন্ত না করতে পারে নি।

রবিবার মানে তো পরশুদিন। পরশুদিন বিকেলে আমি শোণিকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করব। শহর এখন বাইরের দিক থেকে শুধু নয়, ভিতরের দিক থেকেও উত্তপ্ত। হয়তো বাস-রাস্তায় গিয়ে দেখব নানা বয়সের পুরুষ আর নারী পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত যানবাহন বন্ধ। আমরা হয়তো তখন বাসের চলমানতার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে না থেকে হেঁটে কিছুটা এগিয়ে যেতে চাইব। মিছিলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে কিছুদূর গিয়ে আমরা কোনো পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে পরবর্তী বাস-রাস্তা সংক্ষিপ্ত করতে চাইব। তখন কোনো অশ্বারোহী পাড়ার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার মাঠের দিকে যদি এগিয়ে যেতে থাকে তবে ছোটো-ছোটো ছেলেরা ঘোড়াকে বিভ্রান্ত করার জন্য হাততালি দিয়ে যেতে থাকবে। আর সেই অব্যাহত শব্দের পটভূমিতে কোনো গাজনের সন্ন্যাসী তার থালা পেতে কোনো দোতলা থেকে নিক্ষিপ্ত মুদ্রা সংগ্রহ করে নেবে ঠিক। আমাদের এই যাত্রাপথের প্রথম পর্ব বাধায় সমাচ্ছন্ন হলেও হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্বে নিশ্চিত থাকবে ঋতুমতী কুমারীর উচ্ছ্বাস —এই তো তোমার নাগলিঙ্গম! এই তো নালীকদা!

আর রাজভবনের সামনের সেই গুহ্য উজ্জ্বলতার কথা ভেবে আমার এই রাত্রিজাগরণের মধ্যে সত্যিই কি কোনো ক্লেদ থাকতে পারে?

সমাপ্ত

চতুরঙ্গ মার্চ সংখ্যায়

প্রকাশিতব্য তিনটি বিশেষ প্রবন্ধ

বাঙলা উপন্যাসে প্রগতি-শিবির : পিছিয়ে ভাবা আর এগিয়ে দেখা

ড. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসচর্চা ও সাম্প্রদায়িকতা

খাজিম আহ্‌মেদ

দেশবাসী আর আদিবাসী

কমলেন্দু ধর

বেনামী প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

১

আমাদের উনিশ শতকের ক্ষীণ এবং ক্ষণজীবী রেনেসাঁসকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্রপূজা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় বক্তব্য : 'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।'

বিদ্যাসাগরের নামের সঙ্গে একটি বিশেষ চরিত্রের মানুষের রূপকল্প আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ; সে রূপকল্প একটি অজেয় পৌরুষের, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি অক্ষয় মনুষ্যত্বেরও। এই দুই বৈশিষ্ট্যের সমাহারে যে ব্যক্তিত্ব, তিনি আজীবন সব রকম সামাজিক, প্রশাসনিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিরাপস সংগ্রাম করেই গেছেন। এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কখনো বিশ্রাম নিতে জানতেন না।

বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা করার সময় তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মনে রাখা দরকার।

২

শিক্ষা ও সমাজ, এই দুটি ক্ষেত্রের মধ্যেই তাঁর জীবনবৃত্ত আবর্তিত, এবং তাঁর সাহিত্যকর্মও মূলত শিক্ষা- ও সমাজ-কেন্দ্রিক। যে পাঁচটি বেনামী প্রবন্ধের ওপর আমাদের এই আলোচনা, তাদের বিষয়বস্তু সমাজগত—বিধবাবিবাহ এবং পুরুষের বহু-বিবাহ। বেনামী রচনা লেখার প্রায় দুই দশক আগেই কিন্তু তিনি উত্তর-তিরিশের পরিণত যৌবনে একই বছরে (১৮৫৫) বিধবাবিবাহের সপক্ষে শাস্ত্র থেকে যুক্তিপ্রমাণসহ তখনকার প্রচলিত নৈয়ায়িক রীতিতে দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তারপর পঞ্চাশোত্তর বয়সে পুরুষের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে ওই শ্রেণীরই দুটি রচনা প্রচারিত করেন (১৮৭১, ১৮৭৩)।

যুগান্তকালের অবক্ষয়দুষ্ট অচলায়তন সমাজে আঘাত দেওয়ার প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই তীব্র আকারে প্রকাশ পেয়েছিল। ধর্মভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট তথা -কথিত পণ্ডিত সমাজপতিরা বিদ্যাসাগরকে যে ভাব আর ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন, তা অবশ্য তাঁদের জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংযতভাষী এই ব্যক্তিটি দ্বিতীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, 'এদেশে উপহাস ও কটূক্তি যে ধর্মশাস্ত্র-বিচারে প্রধান অঙ্গ, ইহার পূর্বে আমি অবগত ছিলাম না।'

তিনি কিন্তু কটূক্তির পথ ত্যাগ করে সংযতভাবে সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের পথে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপক্ষের প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক প্রতিটি বিরুদ্ধ মত শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ খণ্ডন করেন এবং ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত, প্রতিটি প্রশ্নেরও যথাযথ উত্তর দিয়ে নিজের কর্তব্য শেষ করেন। এমনি করে বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ বিষয়ে পাঁচটি প্রবন্ধে যে বিদ্যাসাগরের পরিচয় পাই, তিনি এক বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের অধিকারী, তাঁর পৌরুষ অজেয়, ব্যক্তি-মানসে তিনি সংবেদনশীল, আচারে-আচরণে সংযত, পরিমার্জিত। এবং স্বনামে এই পাঁচটি নিবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনের এক পর্বের সমাপ্তি।

স্বনামে এই শ্রেণীর শেষ প্রবন্ধ—পুরুষের বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাব (মার্চ, ১৮৭৩)। এটি প্রকাশের পরের মাস থেকেই কিন্তু বিভিন্ন কৌতুককর ছদ্মনামে পর-পর যে পাঁচখানি বেনামী রচনা প্রায় এক যুগ ধরে তিনি প্রচারিত করতে থাকেন, তার মধ্যে এতদিন আমাদের কাছে অপরিচিত আর-এক বিদ্যাসাগরের আত্মপ্রকাশ। এই রচনাগুলির শিরোনাম "অতি অল্প হইল" (এপ্রিল ১৮৭৩), "আবার অতি অল্প হইল" (অগস্ট ১৮৭৩), "ব্রজবিলাস" (সেপটেম্বর ১৮৮৪), "বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা" (অকটোবর ১৮৮৪), এবং "রত্নপরীক্ষা" (জুলাই ১৮৮৬)। প্রথম তিনটির স্বাক্ষরকারী 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য', চতুর্থের 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ', এবং পঞ্চমের 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য প্রণীত'। এর মধ্যে প্রথম দুটি প্রস্তাবের বিষয়বস্তু পুরুষের বহুবিবাহ, অপর তিনটির —বিধবাবিবাহ।

ছদ্মনামের আড়ালে মেঘনাদের কুশলতায় পরম অধর্মাচারী "টিকিদাস ভট্টাচার্যদের" বিরুদ্ধে তাঁর অন্তরের পুঞ্জীভূত যত ক্রোধ, যত ঘৃণা, সবই যেন এক নিষ্ঠুর, উন্মত্ত প্রতিহিংসার বশে বিদ্যাসাগর এই বেনামী পঞ্চকে উজাড় করে দিয়েছেন। আত্মসর্বস্ব দোষদর্শীদের বিরুদ্ধে তাঁর অস্ত্র এখানে শুধুমাত্র স্বনামের রচনার সংযত ব্যঙ্গ-রসিকতা নয় ; তিনি যেন রুদ্রমূর্তি নটরাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ, অনেক সময়ই তাঁর হাতিয়ার অমার্জিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সীমা ছাড়িয়ে রূঢ়, গ্রাম্য রসিকতা, এবং কখনো বা নিরাবরণ ব্যক্তিগত কটূক্তি, এমন-কি শালীনতাহীন গালাগালির রূপ নিয়েছে। অথচ ধর্মশাস্ত্রবিচারে বিরুদ্ধবাদীর 'উপহাস ও কটূক্তি' প্রয়োগের কথা তিনিই একদা ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করেন।

৩

বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহনিবারক প্রথম প্রস্তাবের সমালোচক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক, পণ্ডিত ও গ্রন্থকার বলে পরিচিত তারানাথ বাচস্পতি। তিনিই এই বেনামী রচনাগুলির প্রথম প্রেরণা জুগিয়েছেন। একদিন তিনি বস্ত্র- ও অলঙ্কার -ব্যবসায়ী ছিলেন, শুধুমাত্র বিদ্যাসাগরের কল্যাণেই তাঁর শিক্ষায়তনে প্রবেশ এবং প্রতিষ্ঠা। জাত ব্যবসায়ী এই বাচস্পতি মহাশয় বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষতাকালে তাঁর অনুগত ভক্ত এবং সহকর্মী। কিন্তু তাঁর পদত্যাগের পরেই তিনি স্বার্থের খাতিরে আনুগত্যটা পালটে

ফেলেন, বিদ্যাসাগরের বিপক্ষ দলে যোগ দিয়ে হয়ে ওঠেন তাঁরই কট্টর সমালোচক।

এই বাচস্পতির কর্মজীবনের কুলজি ঘেঁটেছেন বিদ্যাসাগর তাঁর দ্বিতীয় বেনামী রচনা "আবার অতি অল্প হইল"-তে :

> খুড় এখন মানুন না মানুন, তাঁর মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি সকলের মূলে বিদ্যাসাগর। ...বিদ্যাসাগর যেরূপ অদ্ভুত চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করিয়া, খুড়কে কালেজে অধ্যাপকের তক্তে বসাইয়া ছিলেন, তাহা কাহার সাধ্য নহে। খুড় আমার মহাশয় ব্যক্তি; এখন, বড় লোক হয়ে, সে সকল ভুলিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, খুড়র গায়ে মানুষের চামড়া নাই। যাতে বিদ্যাসাগরের মর্মান্তিক হয়, পিতাপুত্রে সে চেষ্টায়, ক্ষণকালের জন্যও, অলস ও অমনোযোগী নহেন। বিদ্যাসাগরের কুৎসা করা, খুড় কুলতিলক জীবানন্দ ভায়ার শরীর ধারণের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। শাস্ত্র বলে, মিত্রদ্রোহীর নিষ্কৃতি নাই। যথা,
>
> মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ
> এতস্তে নরকঃ যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥
>
> মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, ও বিশ্বাসঘাতক, এই তিন, যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, নরকভোগ করিবেক।

এহেন শয়তান-শিরোমণি বাচস্পতি মহাশয় বিদ্যাসাগরের স্বনামে প্রকাশিত বহুবিবাহের ওপর প্রথম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে লেখেন, এবং তা করেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ভঙ্গিতে দেবভাষায়। বিদ্যাসাগরও তার যথাযথ উত্তর দিয়েছেন তাঁর দীর্ঘ দ্বিতীয় প্রস্তাবে (মার্চ, ১৮৭৩), এবং তা করেন তাঁর আদর্শ অনুযায়ী বাঙলা ভাষায়। কিন্তু স্বনামে তাঁর অনুসৃত মার্জিত পদ্ধতিতে ওই ভণ্ড পণ্ডিতটির সংস্কৃত বিদ্যার বহর ও তাঁর চরিত্রের স্বরূপ সকলের সামনে উদ্ঘাটন করার সুযোগ ছিল না। তা না করে তাঁর সংগ্রামী সত্তাটি বোধহয় ঠিক শান্তি পাচ্ছিল না। তাই তিনি এবার ছদ্মনাম ধারণ করে বাল্যকালের পরিচিত কবিয়াল, হাফ-আখড়াই দলের অনুসরণে উতোর-চাপানের আসরে মহা-উল্লাসে নেমে পড়লেন।

এমনি করেই দেখা দিল সাহিত্যের মাধ্যমে বিদ্যাসাগরের অপর সত্তাটির সাধারণ্যে প্রকাশ। তাঁর স্বনামের দ্বিতীয় প্রস্তাবটির বাচস্পতির সমালোচনার উত্তর দেবার এক মাস পরেই "অতি অল্প হইল" এই শিরোনামে এবং "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোয়্য প্রণীত" এই বেনামে মাত্র পাঁচ-ছয় পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায় আগের জের টেনে এইটি পুনরায় উতোর হিসাবে ছাড়লেন।

প্রথম বেনামী রচনা থেকেই তাঁর ভাষা, ভাব আর ভঙ্গি মেঠো তরজার, রচনার আঙ্গিক ও অঙ্গরূপ স্থূল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের, সূচনা থেকেই প্রত্যক্ষভাবে নাম ধরে যেন খেউড় গাওয়া। গোড়াতেই মঙ্গলাচরণের ধারায় দশ পঙক্তি পয়ারের একটি উপযুক্ত নাম-লিপিসহ বাচস্পতিকে উদ্দেশ করে :

> অত্যুচ্চৈঃ পতনায়
> এতকাল পরে সব ভেঙ্গে গেল ভুল।
> হতদর্প হৈলে বাচস্পতি বাহাদুর॥ ১॥
> ... ...
> দর্পে ফেটে পড় সবে কর তৃণ-জ্ঞান।
> অহঙ্কারী নাহি কেহ তোমার সমান॥ ৪॥
> তুমি গো পণ্ডিতমূর্খ বুদ্ধিতদ্ধিহীন।
> অতি-অপদার্থ তুমি অতি অকীর্তিন॥ ৫॥

অতঃপর তারানাথের সংস্কৃতে লিখিত এটির উত্তর থেকে দশটি উদাহরণ নিয়ে বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন, ব্যাকরণের অধ্যাপকের ব্যাকরণের জ্ঞানই শূন্য-পরিমাণ। ভবিষ্যতে এইভাবে সংস্কৃতের বিদ্যা প্রকাশ করে খুড়ো যেন আর-সকলের অবজ্ঞার পাত্র না হন, উপযুক্ত ভাইপো সেই আবেদন জানিয়েছেন,

> 'আমার ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, খুড় আর যেন সংস্কৃত লিখিয়া বিদ্যা খরচ না করেন। খুড়র লজ্জাসরম কম বটে। কিন্তু লোকের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়। দোহাই খুড়। তোমার পায়ে পড়ি; এমন করে আর চলিও না; এবং 'শত বর, মা লিখ', এই অমূল্য উপদেশবাক্য লঙ্ঘন করিয়া আর কখনও চলিও না।'

অন্ধ রক্ষণশীলদের পক্ষচ্ছায়ায় আশ্রিত বাচস্পতি

৪

এমন মোক্ষম পাশুপতের আঘাতে তারানাথকে সম্ভবত ভূলুণ্ঠিত দেখে উপযুক্ত ভাইপো তাঁকে নিষ্কৃতি দেন। তারপর এক দশকের ওপর বেনামী যোদ্ধার বিশ্রাম, এবং পুনরায় অস্ত্রধারণ তিনি করেছেন বহু-বিবাহ নয়, পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধেই বিধবাবিবাহের সমর্থন নিয়ে। এ পর্যায়ের প্রথম প্রতিবাদী নবদ্বীপের স্বর্গত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করে যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভায় সংস্কৃত ভাষায় তিনি একটি বক্তৃতা করেন। তার প্রকাশিত বয়ানের উত্তরে এই প্রস্তাবের নামকরণ 'ব্রজবিলাস', উপনাম 'যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব্ব মহাকাব্য', এবং 'কবিকুল-তিলকস্য উপযুক্ত ভাইপয্য প্রণীত' (সেপটেম্বর ১৮৮৯)। রচয়িতার নামের কিছু পরিবর্তন হলেও ভাবে, ভাষায়, আঙ্গিকে, অঙ্গরূপে এটি আগেরগুলির শুধু সোদরপ্রতিমই নয়, লেখকের দৃষ্টি যেন এখানে প্রতিপক্ষের অজ্ঞতা, শঠতা থেকে তাঁর নৈতিক অধঃপতনের ওপরই বিশেষ নিবদ্ধ।

দিলখোলসা ভাইপো এবার যে অবলীলায় 'টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশদের' ইঙ্গিত করে সেবাদাসী-সহবাস, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদির কদর্য কাহিনী তৃতীয় প্রস্তাবটির 'বিজ্ঞাপন' থেকেই একের পর এক রসালো ভাষায় আর নাটকীয় ভঙ্গিতে বিবৃত করে চলেছেন, মনে হয় এ বুঝি হাফ-আখড়াইকালের এক ধরনের দিগম্বরী প্রলয়-নাচন।

'বিজ্ঞাপনে' উপযুক্ত ভাইপো মন্তব্য করেছেন, 'বিদ্যাবাগীশ খুড়দের শাস্ত্রেও যেমন দখল, পাপেও তেমনি প্রবৃত্তি; সুতরাং, তাঁহাদের পাপের সংখ্যাও অধিক, এবং সমস্ত পাপই জ্ঞানকৃত। এমন স্থলে, তাঁহারাই নরক একচেটিয়া করিয়া ফেলিবেন, সে বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই।' উক্তিটির প্রমাণস্বরূপ এই 'বিজ্ঞাপন' অংশেই জনৈক শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী-সহবাসের একটি কাহিনীর অবতারণা করে তাঁদেরই মতো তর্জন-গর্জনে বিশ্বাসী, সুতরাং সহজে দমবার পাত্র নন। তিনি ঝটিতি প্রত্যুত্তর যেমন দিলেন, বিদ্যাসাগরেরও চটির নর্তন আর টিকির স্পন্দন তেমনি দ্রুততর হল, প্রকাশিত হল প্রায় চল্লিশ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় বেনামী রচনা, "আবার অতি অল্প হইল।" ভাবে, ভাষায় এটি প্রথম জাতকেরই অনুজ, কিন্তু অমার্জিত প্রকৃতিতে সম্ভবত বেশ কিছু নীচে।

উপযুক্ত ভাইপো এখানেও ঘোষণা করেছেন, 'খুড়র উপর আমার অনুমাত্র আক্রোশ নাই' এবং তিনি লেখনী ধারণ করেছেন স্রেফ 'আপন ধর্মরক্ষার্থে এবং খুড়র ঐহিক পারলৌকিক হিতার্থে,' সুতরাং পাইকপাড়ার রাজবাড়ির শ্রাদ্ধের সময় খুড়ো কোনো দুর্বল মুহূর্তে কী কী বস্তু 'কিছু তঞ্চকতা সহকারে' হস্তগত করেছিলেন, তারই অনুপুঙ্খ বর্ণনা রসিয়ে-রসিয়ে দিয়ে উপযুক্ত ভাইপো এই দ্বিতীয় কিস্তির মুখবন্ধ করেছেন। বাচস্পতির ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর এমনি করে তিলাঞ্জলি দিয়েও ভাইপোর চিত্ত যেন ঠিক ভরে উঠল না, তাই প্রস্তাবটির শেষের দিকে খুড়োর সংস্কৃতবিদ্যার বিষয় আবার নিয়ে এলেন,

> তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সংস্কৃতবিদ্যা কেবল তাঁর পেটেই অন্তঃসলিলা বহিতেছে। খুড় অনেক আহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াছেন, যথার্থ বটে; কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যা নিরতিশয় গুরুপাক দ্রব্য, হজম করিতে পারেন নাই; সুতরাং অপচার ও উদরাময় হইয়া রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে যে নিঃসরণ হইতেছে, তাহার সৌরভে সমস্ত দেশ আমোদিত করিতেছে।

খুড়োর চরিত্রের রেখাচিত্রটি পূর্ণ করবার জন্যেই যেন এই কদর্য বক্রোক্তির পর তাঁকে 'চালাক ও ফচকিয়া' 'ডেফো ও অহঙ্কারিকা' ইত্যাদি অলংকারে ভূষিত করে এবং তাঁকে 'ছুঁচ, ইন্দুর, চামচিকা বরাবর জ্ঞান' করে ভাইপোর সমাপ্তিতে এসেছেন। পরিশেষে মন্তব্য, 'হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়।'

যেমন পালা, তার তেমনি সমাপ্তি। প্রতিপক্ষকে লজ্জা দেবার জন্যে ধিকারসূচক এই ছুয়ো দেবার ধ্বনি কবিয়াল, হাফ-আখড়াই যুগকে স্মরণ করায়।

শেষে বলেছেন, 'এই বলিয়া, অভয়প্রদান ও প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক, শয্যায় লইয়া গিয়া গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে, পূর্ব্ববৎ, চরণসেবায় প্রবৃত্ত করিলেন।'

পাঁচটি 'উল্লাস' ও দুটি 'পরিশিষ্টে' অনধিক চল্লিশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই প্রস্তাবটির পঞ্চম 'উল্লাস' ব্যভিচার এবং ভ্রূণহত্যার নিরলঙ্কার ব্যাখ্যানে পরিকীর্ণ। ব্রজনাথের প্রতিটি অনুযোগের শাস্ত্রসম্মত উত্তর এবং সেই সঙ্গে এই শ্রেণীর সমাজপতিদের চরিত্রের নিকুচি করে মাঝে-মাঝে অমার্জিত গালগল্পের সমাবেশে এই প্রস্তাবটি বেনামী-পঞ্চকের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে উপভোগ্য খেউড়ে পরিণত হয়ে উঠেছে।

এই তিনটি নিবন্ধের বাকি দুটিতেও সেই শাস্ত্র থেকে উক্তি, নানা ঢঙের কবিতা, সরস-বিরস শালীনতাহীন গালগল্প, রঙ্গরসিকতায় ছয়লাপ, এই একই আঙ্গিক ও অঙ্গরূপের উদাহরণ। অনেক সমালোচক বেনামী পঞ্চকের এই অংশগুলির নিন্দা করেছেন, আবার অনেকে এদের ব্যঙ্গরসিকতার প্রশংসায় মুখর হয়েও উঠেছেন। কৃষ্ণকমল "পুরাতন প্রসঙ্গে" বলেছেন, 'এরূপ উচ্চ রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে।···যদি য়ুরোপ হইত, তাহা হইলে এ প্রকারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা ব্যঙ্গপরিহাসের তরঙ্গ বহিয়া যাইত, এবং বিদ্যাসাগরের নাম এক্ষণে বিদ্যাবত্তার জন্য যে প্রকার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, রসিকতার জন্য তদ্রূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিত, সন্দেহ নাই।' "বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস" পুস্তকে অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, এই রচনাগুলিতে বিদ্যাসাগরের 'উষ্মা নাই, সরস ব্যঙ্গ' ইত্যাদি।

৫

বেনামী-পঞ্চকের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে আগে এদের স্বরূপ নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

স্পষ্টত এগুলি ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনা। ইংরাজি সাহিত্যের তুলনায় এখনো আমাদের এই শ্রেণীর রচনার দৈন্য বিস্ময়কর, এ বিষয়ের আলোচনাও স্বাভাবিকভাবেই অপ্রতুল। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, রঙ্গ-রসিকতা, ঠাট্টা-তামাসা, এমন কি ভাঁড়ামি গালাগালি পর্যন্ত সবকিছুই আমরা "হাস্যরস" এই একটিমাত্র শব্দের আশ্রয়ে এনে আলোচনা করে থাকি। এই পদ্ধতিটি খুবই শিথিল, বিজ্ঞানসম্মতও ঠিক নয়, কিন্তু ইংরাজি উইট, হিউমার, স্যাটায়ার ইত্যাদি শব্দগুলি অনেক স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত, ব্যঞ্জনাময়, আমাদের কাছে আজ সুপরিচিত। "রস" সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রের সূক্ষ্ম, জটিল বিচারবিশ্লেষণ যখন অপ্রচলিত হয়ে এসেছে, তখন আলোচনার সুবিধার জন্যে অন্যান্য সহজবোধ্য ইংরাজি শব্দের মতো এই শব্দগুলিই এখানে আমরা সংস্কারমুক্ত মনে ব্যবহার করব।

হিউমার, উইট, স্যাটায়ার ইত্যাদির লেখকরা মানুষ এবং সমাজের কিছু বিকৃতি বা অসঙ্গতি আবিষ্কার করে কৌতুক বা হাস্যরস উপভোগ করেন। কিন্তু এই তিনের মধ্যে হিউমার-লেখকের মন সংবেদনশীল, মুখে তাঁর হাস্যকৌতুকের রেশ, চোখ তাঁর কিন্তু বেদনায় অশ্রুসজল। উইট- আর স্যাটায়ার-লেখকরা ভিন্ন প্রকৃতির শিল্পী। মমতাহীন অন্তর আর শুষ্ক, বুদ্ধিচালিত দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা অসংগতি সন্ধান করে বেড়ান। উইটশিল্পী কোনো বিকৃতি বা অসংগতির ওপর তির্যক ভঙ্গিতে আলোকপাত করেই নিজের উন্নত বুদ্ধির গরিমায় উৎফুল্ল হয়ে জয়ের হাসি হাসেন। এতেই তিনি পরিতৃপ্ত।

কিন্তু স্যাটায়ার-শিল্পী?

তিনি এই বর্গেরই আরো উচ্চমার্গের ব্যক্তি, তাঁর উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক, আরো গভীর। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি শুধু দোষত্রুটির উদ্‌ঘাটন বা তার ওপর আলোকপাতই করেন না, উপহাসের আঘাতে সেই বিশেষ বস্তুটির সংশোধন করাই তাঁর চরম লক্ষ্য। তাঁর দৃষ্টি দোষদর্শী হলেও কিন্তু কখনো

প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণে সে দৃষ্টি অবনমিত নয়, কারণ ব্যক্তিগত আক্রমণ সাহিত্যসৃষ্টির সহায়ক হয় না। 'লোকরহস্যে'র বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্য-লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। ব্যক্তিবিশেষের যে দোষ, তাহাতে রহস্য-লেখকের কোন অধিকার নাই।'

সুতরাং 'ব্যক্তিবিশেষের' দোষ যখন কোনো রচনার বিষয়বস্তু হয়, এবং তার বিদ্যাসরীতে যখন গ্রাম্য বা প্রাকৃত স্তরে নেমে যায়, তখন সে রচনা সাহিত্যের বৃত্তের বাইরে চলে যায়। বিদ্যাসাগরের বেনামী-পঞ্চকের মৌল উপাদান পরিকল্পিতভাবে গালাগালি শ্রেণীর; ভাবে, ভাষায় তাদের অনেক অংশই শালীনতাহীন; সেখানে আবার অনেক সময় যেন মেছোহাটার দুর্গন্ধ! English Satire and Satirists গ্রন্থে হিউ ওয়াকার বলেছেন, Billingsgate is not satire···Billingsgate is simply abusive। Billingsgate অর্থ লনডনের মেছোহাটা, অর্থাৎ মেছোহাটার ভাষা, প্রকারান্তরে যা অশ্লীল গালাগালির নামান্তরমাত্র।

প্রসঙ্গত বলা যায়, সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্যে'র স্যাটায়ারগুলি রচনা করেন। "হনুমদ্বাবুসংবাদ" ইত্যাদি আলেখ্যগুলি যেখানে তাঁর লেখনী কিছু স্থূল, তীব্রভাবে আক্রমণাত্মক, সেখানেও তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত, সমাজভিত্তিক; আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বিশেষ কোনো ব্যক্তি, কোনো বাচস্পতি বা বিদ্যারত্ন নয়, হনুমান বলে বর্ণিত বাবুটি সমাজের এই শ্রেণীর প্রতীক বা টাইপমাত্র। এই আখ্যানটিতে নাটকীয় অঙ্গরূপের আবরণ এবং অতিরঞ্জন বা ক্যারিকেচার আঙ্গিকের ব্যবহারের ফলে স্থূল বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা অনেক মোলায়েম হয়ে উঠেছে, নিবন্ধটি পড়তে-পড়তে আমরা নিঃশঙ্কে বলি, দোষী সাবধান!

অষ্টাদশ শতকের ইংরাজ স্যাটায়ার কবি ড্রাইডেন তাঁর বিশেষ পরিচিত Absolam and Achitophel কবিতায় বিচারক-রাজনীতিবিদ একিটোকেলের চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গে লেখেন, The statesman we abhor but praise the judge। ড্রাইডেন তাঁর রাজনৈতিক সত্তাকে ঘৃণা করেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর বিচারক-সত্তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরী কবি পোপ-এর লেখনী প্রায়ই ব্যক্তিগত আক্রমণে কলঙ্কিত, Dunciad-এর বোধ হয় প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে রূঢ়, অমার্জিত শ্লেষাত্মক উক্তি। তবু মনে রাখা দরকার, এইসব স্যাটায়ার-শিল্পীরা সরাসরি কোনো ব্যক্তিগত নামকে নয়, নিজেদের উদ্ভাবিত প্রতীকী নামকে উদ্দেশ করে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চালিয়েছিলেন। 'উপযুক্ত ভাইপ' কিন্তু প্রতিটি প্রস্তাবে প্রথম থেকেই প্রতিবাদীর নামেই তিলাঞ্জলি দিয়েছেন। এ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে স্যাটায়ার-সাহিত্যের নিয়মবিরুদ্ধ।

আজকের সমালোচকের নির্মোহ দৃষ্টিতে এই রচনাগুলির রঙ্গ-রসিকতা শিল্পসার্থক বলে সম্ভবত মনে হবে না।

৬

এই বেনামী নিবন্ধগুলির পশ্চাদ্‌ভূমিতে এক চরম অবক্ষয়গ্রস্ত সমাজ, বিতর্কের অপর পক্ষের কুশীলবদের স্বভাব-চরিত্র সেই সমাজ-অনুবর্তী। বোধহয় অনেকটা সেই কারণেই লেখকের বাচনভঙ্গি অমার্জিত, তাঁর রচনার স্বাভাবিক নান্দনিক স্বাদ এখানে অদৃশ্যপ্রায়।

কিন্তু আজকের সংবেদী সমালোচক সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বেনামী-পঞ্চকের দিকে তাকালে তাদের বিষয়বস্তুর শালীনতা-অশালীনতার ওপরে দেখবেন, দেশকালের সীমানায় বন্দী এক রসজ্ঞ গদ্যশিল্পী সেই সময়ের সমাজপতিদের সায়েস্তা করতে বাঙলা ভাষাকে কী অবলীলায় তাঁর বিশেষ ভাব প্রকাশের উপযোগী বাহন করে তুলেছেন। তীব্র, সময়ে সময়ে কদর্য ব্যঙ্গ-শ্লেষাত্মক বাচনের উপযুক্ত একটি রচনাশৈলী গড়ে তুলতে তিনি সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষার, এমন-কি

প্রয়োজনে স্ল্যাঙ শব্দের অবাধ সংমিশ্রণ করে এখানের বিষয়-অনুগত একটি স্বতন্ত্র স্টাইল সৃষ্টি করেছেন। একেই বোধহয় ইংরাজিতে বলে, ভাষার ইডিয়ম বা বিশেষ প্রকাশভঙ্গি। শহুরে বচনের সঙ্গে গ্রাম্য স্ল্যাঙের মিশ্রণ, প্রচলিত প্রবন্ধের অঙ্গরূপের মধ্যে নতুন আঙ্গিক ও অঙ্গরূপের সমাবেশ, এই দুয়ের সমন্বয়ে উদ্ভূত প্রবন্ধে এক নতুন প্রকৃতির রূপকল্প, রচনাশৈলীর এক অসামান্য শিল্পসুষমা।

বেনামী-পঞ্চকের যত্রতত্র ছড়ানো শিল্পরীতির উদাহরণ :

১। সকল লোকেই অবাক হয়েছে ও কহিতেছে, তাইত হে! তারানাথটা কি! কিসের জারি করিয়া বেড়ায়। কথায় কথায় বলে, দুনিয়ার মধ্যে পণ্ডিত আমি; আমার সমান কে আছে; আমি বই, সংস্কৃত আর কে জানে? যাঁহারা বিশেষ জানেন, তাঁহারা কিন্তু বলেন, তারানাথ কেবল মুখে পণ্ডিত; তাঁর মুখের জোর যত, বিদ্যার জোর তত নয়। শুনিয়াছি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন; তিনি, তর্কবাচস্পতি খুড়র মত, আস্ফালন করিতেন না। যে রোগে আস্ফালন করায়, তাঁর শরীরে সে রোগ ছিল না;—

"অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে॥"

রুই মাছ অগাধ জলে বিহার করে, অথচ তাহার বিকার নাই। পুঁঠি মাছ গণ্ডূষমাত্র জলে ফর্ফর্ করিয়া বেড়ায়।

… … …

বলিতে কি, খুড় আমার বড় নির্বোধ; অকারণে, আপনার মান আপনি খোয়াইলেন। চালাকি করিয়া, বহি লিখিয়া, বাহাদুরি দেখাইতে না গেলে এ ফেসাৎ ঘটিত না। ইহাকেই বলে, নালা কেটে রোগ আনা। …খুড় আমার অহঙ্কারেই মারা গেলেন;—

"নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ"
অহঙ্কারের চেয়ে বড় শত্রু নাই।

যাহা হউক, খুড় কেমন সংস্কৃত লিখেছেন, ইহা দেখিবার জন্য, তাঁর পুস্তকের কিয়দংশ পড়িলাম; পড়িয়া, খানিকক্ষণ, গালে হাত দিয়া, ভাবিতে লাগিলাম; দেখিলাম স্মৃতিবিদ্যা, রচনাবিদ্যা, ব্যাকরণবিদ্যা, খুড় আমার তিন বিদ্যাতেই মূর্তিমন্ত। যদি আর আর বিদ্যাতেও এইরূপ হন, তা হলেই চূড়ান্ত। আমি তাঁর উপযুক্ত ভাইপো বটে, কিন্তু তাঁর মত বেহদ্দা পণ্ডিত নই। …খুড়র লেখা দেখিয়া, বোধ হইল, বাবাজী যত জারি করেন, লেখাপড়ায় তত দখল নাই। সংস্কৃত লিখিতে গিয়া বিলক্ষণ ছরকট করিয়াছেন।

—অতি অল্প হইল।

২। এ স্থলে, ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, লোকে, 'অতি অল্প হইল' পড়িয়া, বেয়াড়া আমোদ করিতেছেন দেখিয়া, আমার উচ্ছন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আহ্লাদে গদ্‌গদ্ হইয়াছি, অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়াছি। আমার আন্তরিক আশঙ্কা এই, বংশদোষে, অবশেষে, খুড়র মত, ডেফোঁ ও অহঙ্কারিয়া হইয়া না পড়ি। ভরসার মধ্যে এই, আমি নিতান্ত অঃসিয়ান ছোকরা নই; এবং এ পর্যন্ত, খুড় ও খুড়র কুলানন্দ জীবানন্দ ভায়ার মত, অভিমানে অন্ধ ও একবারে ভাল মন্দ বিবেচনায় রহিত হই নাই। সুতরাং, তাঁদের মত, উচ্ছন্ন না গিয়া, সামলাইতে পারিব, সে বিষয়ে নিতান্ত নির্ভরসা হই নাই।

—আবার অতি-অল্প হইল।

৩। যাঁহারা আমাকে জানেন, তাঁহারা মনে করেন আমি বড় চতুর, চালাক, বুদ্ধিজীবী জন্তু। তাঁহারা কেন আমাকে ওরূপ ভাবেন, তাহা আমি ঠিক জানি না। বোধ হয়, আমি বড় ফাজিলচালাক, তাঁহাদের চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপ করিয়া, অন্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাই তাঁহারা ওরূপ মনে করেন। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে, আমি, বিদ্যাবাগীশ খুড়দের মত গর্দভচূড়ামণি; নতুবা অকারণে, এত ফেচফেচ করিতেছি ও অগড়ম বগড়ম বকিতেছি কেন। অথবা, যাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহারা, এ দেশের সাধুসমাজে বড় আদরণীয় ও প্রশংসনীয় হন, ইহা দেখিয়া বিষম লোভে পড়িয়া, অসামাল হইয়া এরূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শ্রীল শ্রীযুক্ত ঘটকচূড়ামণি জনমেজয় বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়, বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা বিষয়ে, এক বিচিত্র বক্তৃতা পাঠ করিয়াছেন। সভাস্থ মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশের পাল, ঐ বক্তৃতা শ্রবণে মাত হইয়া, ঘটকচূড়ামণিকে শত শত বার ধন্যবাদ ও কবিরত্ন এই উপাধি দিয়াছেন; এবং শ্রীমতী সভাদেবীও প্রিয়তম নায়কের বক্তৃতারসে গলিয়া গিয়া, দেশের ধর্মরক্ষার দোহাই দিয়া, ঐ অদ্ভুত বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন।

—ব্রজবিলাস।

৭

সাধারণ পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে, এমন শিল্পসমৃদ্ধ বেনামী রচনাগুলির কেন এই অমার্জিত রূপকল্প? সেই পরিশুদ্ধ, সুসংস্কৃত সাহিত্যশিল্পীর কেন এই অবনমন? কেন রূঢ়, গ্রাম্য ভঙ্গিতে ব্যক্তিগত আক্রমণের এই নগ্ন উল্লাস?

প্রশ্নটি বিদ্যাসাগর-মানস ও সমকালীন পরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

বিদ্যাসাগরের জীবনের গতি সরলরেখ। এ ব্যক্তি-মানস কোনো অবস্থাতেই কখনো আপোস করে নি। রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত তাঁর অজেয় পৌরুষ কখনো খণ্ডিত হয় নি, জীবনের সরলরেখ গতি কখনো বক্র হয় নি। আমাদের মনে হয়, তাঁর চরিত্র-গঠনের উপাদানে দুর্বলতা বলে কোনো বস্তু সম্ভবত ছিল না।

কি কর্মজীবনে, কি সমাজ-জীবনে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর অনমনীয় মেরুদণ্ডের কথা আজো কিংবদন্তী হয়ে আছে। 'স্বরচিত জীবনচরিতে' তিনি রহস্য করে লিখেছেন, 'জন্মসময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া আমাকে এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর সময়ে সময়ে কার্য দ্বারাও এঁড়ে বাছুরের পূর্বোক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।'

বিনয় ঘোষ "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ"-এ বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে এই কথার উল্লেখ করেছেন, 'এঁড়েগোরুর একগুঁয়েমিই তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। পদে পদে প্রতিটি কাজে যত তিনি বাধা পেতেন, তত তাঁর পদক্ষেপ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠত, উন্নত ললাটের তলায় অপ্রশস্ত চিবুকটি নিরাপস, নির্মম রূপ ধারণ করত। ক্ষমার অযোগ্য যে তাকে তিনি কখনো ক্ষমা করতেন না। অন্যায় সহ্য করা তিনি সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে মনে করতেন। …জীবনের কর্মক্ষেত্রে কোনোদিন তিনি পরাজয় স্বীকার করেননি। যা ভেবেছেন, তা করেছেন। স্টীমরোলারের মতন পথের সব বাধা ঠেলে এগিয়ে গেছেন।'

ছেলেবেলায় পুত্রের এই একগুঁয়েমির জন্যে ঠাকুরদাস তার নাম দিয়েছিলেন, 'ঘাড়কেঁদো'।

আজীবন তিনি সংগ্রামই করে এসেছেন, যোদ্ধার চিহ্ন তাঁর সর্বাঙ্গে সুপরিস্ফুট। তখনকার বিপদসঙ্কুল গ্রাম্যজীবনে দস্যু আর জানোয়ারদের ঠাণ্ডা করবার জন্যে পিতামহ রামজয় তর্করত্ন ঘরে-বাইরে একটি লৌহদণ্ড হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করতেন, এবং প্রয়োজনে সে কাজ যে তিনি স্বচ্ছন্দে করতে পারতেন, তার প্রমাণ বারবার রেখে গেছেন। বিদ্যাসাগর একদিক দিয়ে এই পিতামহের সুযোগ্য উত্তরসাধক।

এই তো বিদ্যাসাগরের ব্যক্তি-মানস। কোনো মানুষই সমকালীন সমাজের পরিবেশ থেকে মুক্ত নয়।

বেনামী-পঞ্চকের রচয়িতা যে সময়ে বড়ো হয়ে উঠছেন, তখন কবির লড়াই, হাফ-আখড়াই যুগের প্রায় অপরাহ্ণকাল, সমাজজীবন অশালীন, কুৎসিত আচার-আচরণে কলঙ্কিত। ঈশ্বর গুপ্তের 'পাষণ্ডপীড়ন' ও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'রসরাজ'—দুই পত্রিকার মেঠো আখড়াই, অর্থাৎ পত্রিকা মারফত পরস্পরকে গালাগালির উল্লেখ করে শিবনাথ শাস্ত্রী "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" (১৯০৪) গ্রন্থে বলেছেন, 'তখন বঙ্গীয় আসরে প্রতি দিন কবির লড়াই, সাহিত্যক্ষেত্রে ঐ পত্রদ্বয়ে কবির লড়াই—ইতর, অশ্লীল, ব্রীড়াজনক উক্তি-প্রত্যুক্তির বিষয় স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা হয়।' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, রামতনু লাহিড়ীর জীবনকাল ১৮১৩-১৮৯৮।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যৌবনের প্রিয় কবি এবং সাহিত্যগুরু ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত—যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং সংবাদপত্র-সম্পাদক। প্রথম জীবনে তিনি কবিয়াল ছিলেন, তাঁর রচনায় 'ব্রীড়াজনক' উক্তির অভাব নেই। তাঁর মৃত্যুর পর পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবির কাব্যসংগ্রহের ভূমিকা লিখতে গিয়ে তাঁর গ্রাম্যতাদোষের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন, 'তখনকার

রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল।...সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কথাই অশ্লীল।'

আবার তাঁর পরম বন্ধু দীনবন্ধুর নাটকের ভাষার স্থূলতার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে একজাতীয় ব্যঙ্গপ্রণেতা ছিলেন। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত।'

বিদ্যাসাগরের ছাত্রাবস্থায় কবিগান, খেউড়, হাফ-আখড়াই ইত্যাদির আসর যথেষ্ট সজীব, সরব, সবল; কলকাতার আমোদ-প্রমোদে এদেরই মুখ্য ভূমিকা। বিদ্যাসাগর এক সময় মন্তব্য করেন, 'বাঙলাদেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতোম প্যাঁচার ন্যায় লেখক, আর ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব হওয়া বড়ই আবশ্যক।' বিনয় ঘোষও বলেছেন, বিদ্যাসাগরের কবিগানের প্রতি অনুরাগ ছেলেবেলায় প্রবল ছিল। আর হুতোমের নকশা তো সেই অমাবস্যা-দিনের নয়, নিরাবরণ সমাজচিত্র; এবং ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি বাদে সাধারণ কবিগানের আসর তো হাফ-আখড়াই আসর থেকে বিশেষ ভিন্ন গোত্রের ছিল না। আমাদের এই ধারণার আরো সমর্থন পাই যখন আমরা দেখি যে বিধবাবিবাহ - সমর্থক বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে উভয়ে একযোগে লেখনীধারণ করেছে। দ্বিতীয় বেনামী নিবন্ধটির শেষ অংশে উপযুক্ত ভাইপো তাঁর প্রিয় গুড়োর কাছে একটি সন্ধি প্রস্তাব দিয়ে তাঁদের এই উত্তর-প্রত্যুত্তরগুলি যে খেউড় পর্যায়ের, সে ইঙ্গিত তিনি নিজেই দিয়েছেন, 'গুড়র বেয়াড়া বিদ্যা ও আমার চাপা খেউড়, এ উভয়-এর যোগ দুর্ঘিবার হইয়া উঠিবেক।'

গালাগালি শ্রেণীর বাদানুবাদ প্রকাশের রীতি অবশ্য বিগত যুগের নৈয়ায়িকদের আমল থেকেই প্রচলিত, কিন্তু তার মধ্যে একই রকমের বস্তু আর বচনের বিন্যাস মনে হয় হাফ-আখড়াই প্রথা থেকে সংক্রামিত। খেউড়-হাফ-আখড়াই-এর চাপান-উতোর টেকনিকের সঙ্গে এ-বিদ্যাসাগর যে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন, এই বেনামী-পঞ্চকই তার পরিষ্কার উদাহরণ।

৮

দুঃখের বিষয় বিদ্যাসাগরের ব্যক্তি-মানসের এই দিকের আলোচনা সম্ভবত আজো কেউ করেন নি। তাঁর মার্জিত সাহিত্য-জীবন, অক্ষয় মনুষ্যত্ব ও নিরুপম সংগ্রামী কর্মজীবনের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। কিন্তু তাঁর যে একটি গ্রাম্য, অসংস্কৃত ব্যবহারিক জীবনও ছিল, তাঁকে যে এক চরম অবক্ষয়প্রাপ্ত সমাজের কুরুচি আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করতে হত, যার ফল এই বেনামী-পঞ্চক, সেই মানুষটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় কোথায়?

জীবনীকার বা জীবনীকেন্দ্রিক প্রবন্ধকাররা সাধারণত কোনো বিশেষ তত্ত্ব আশ্রয় করে একটি মানুষকে কিছু নির্দিষ্ট ছক বা থিয়োরিতে ফেলে তার বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকেন। এসব রচনার প্রায় প্রত্যেকটি আসলে এক-একটি তাত্ত্বিক প্রতিবেদন, এবং সেই মানুষটি সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণা এমনি সব প্রতিবেদন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, তাদের মধ্যেই আবর্তিত। চণ্ডীচরণ, বিহারীলাল সরকার থেকে রবীন্দ্রনাথ, বিনয় ঘোষ পর্যন্ত লেখকদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের জীবন সম্বন্ধে নানা মৌলিক তত্ত্ব এবং সেই অনুসারী অনেক তথ্যসমাবেশের অভাব নেই। অভাব শুধু একটি জীবনচরিতে যে জিনিসটির সর্বাধিক প্রয়োজন—রক্ত-মাংসে গড়া সেই ব্যক্তিটির একটি

পরিপূর্ণ জীবনালেখ্যের, তাঁর জীবনের সামগ্রিক রূপকল্পের একটি মূর্ত, জীবন্ত প্রতিচিত্র। আধুনিক বাস্তবধর্মী রীতিতে জীবনী লেখার পথিকৃৎ লিটন স্ট্রাচি রানী ভিকটোরিয়া, ড. টমাস আর্নল্ড ইত্যাদির প্রকৃত চরিতকথা এই পদ্ধতিকেই রচনা করে জীবনী-নির্মাণের এক নতুন শিল্পরীতির সূচনা করেছেন।

দুঃস্থ বিত্তহীনের সন্তান বিদ্যাসাগর। আমাদের ইতিহাসের সেই তমসাচ্ছন্ন দিনে অনন্যসাধারণ প্রতিভা নিয়েও যে সংসর্গে এবং পরিবেশে তাঁকে কাল কাটাতে হয়েছিল, কট্টর বাস্তববাদী সংগ্রামী এই মানুষটি স্বাভাবিক কারণেই তার প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না, মুক্ত হবার অবাস্তব চেষ্টা সম্ভবত তিনি কখনো করেনও নি। সে যুগের অন্যান্য পণ্ডিতদের মতো তাঁরও গ্রাম্য রসিকতা করার অভ্যাস ছিল, ছিল আদিরসাত্মক শ্লোক রচনার দক্ষতা, বন্ধুদের সঙ্গে মজলিসি আলাপে নিজের তোতলামির সঙ্গে অজস্র স্ল্যাং বা অভব্য কথা ব্যবহারের সহজ-পটুতা, স্বভাবকবি ধীরাজের মুখে বিধবাবিবাহের ওপর কুরুচিপূর্ণ গান উপভোগ করার দুর্বলতা। বিদ্যাসাগর-চরিত্র এই সকলের সমাহারেই গঠিত।

ধর্মপ্রাণ ভারতভূমিতে আমরা চিরকাল অসাধারণ মানুষকে হয় দেবতা বানিয়ে তাকে পুজো করে পরলোকের জন্যে পুণ্য সঞ্চয় করেছি, নয়তো শয়তান হিসেবে কল্পনা করে সরাসরি তাকে নরকে পাঠিয়েছি। এমন একটি দেশে সব পর্যায়ের সব মানুষকেই মানুষের দৃষ্টিতে দেখে তার ব্যক্তিমানসের বিজ্ঞান-ভিত্তিক মূল্যায়ন করার মানসিকতা আমাদের কোথায়? থিয়োরি-আশ্রিত সবকটি বিদ্যাসাগর জীবনচরিতে সেই নির্মল প্রকৃতির অকৃত্রিম, প্রাণচঞ্চল মানুষটির পরিচয় কোথায়?

আমরা আগেই তাঁর বেনামী-পঞ্চকে কবিয়াল যুগের উপাদানের কথা বলেছি। আমাদের মনে হয়, ভারতচন্দ্র-কবিয়াল-হাফ আখড়াই কালের একটি প্রাকৃত ধারা উনিশ শতকের শেষ পর্যায় পর্যন্ত জনজীবনে যথেষ্ট প্রভাবশীল ছিল। ১৮৩৫ সালে বিদ্যাসাগর যখন ১৫ বছরের কিশোর, তখন কলকাতার এক নামকরা 'বাবু' নবীনচন্দ্র বসু "বিদ্যাসুন্দর" অভিনয় করিয়ে এক রাত্রে লক্ষ টাকা খরচ করেন। কবিয়াল-হাফ আখড়াই দলের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঈশ্বর গুপ্ত এই শতকের পঞ্চাশের দশকে ভারতচন্দ্রের জীবনী এবং তাঁর অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা ও পদাবলী বহু পরিশ্রমে উদ্ধার করে নিজের "প্রভাকর" পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

বাঙলার অমাবস্যার শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র সেই আঠারো শতকের মধ্যকাল থেকেই প্রায় পরবর্তী শতকের শেষাংশ পর্যন্ত এমনিভাবেই সজীব, সক্রিয় ছিলেন, বটতলার ছাপাখানায় 'বিদ্যাসুন্দর' বঙ্কিমযুগেও বিশেষ জনপ্রিয় প্রকাশন। আর কৈশোরে যে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের উত্তর-সাধক ঈশ্বর গুপ্তের একান্ত বশংবদ কাব্যশিষ্য ছিলেন, পরবর্তী কালে তিনিও কি ঠিক গুরুর অশুভ প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছিলেন? "মৃণালিনী" উপন্যাসে "বিদ্যাসুন্দরে"র ছায়া প্রকট বলে মনে হয়; প্রথম প্রকাশিত "দুর্গেশ-নন্দিনী"র গজপতি-আশমানি সংলাপে এবং 'আনন্দ-মঠে'র শান্তি-জীবানন্দ খণ্ডচিত্রে যে গ্রাম্য রসিকতার সমাবেশ ছিল, তা সেই অমাবস্যার কালকেই স্মরণ করাবে।

গণমানসের সঙ্গে তখনো ওতপ্রোতভাবে জড়িত অনতিপূর্ব কালের একটি প্রাকৃতধারা যদি বিদ্যাসাগরের মধ্যেও সক্রিয় থাকে, তা অবাস্তবও নয়, দূষণীয়ও নয়। উপযুক্ত ভাইপোর জবানিতে তৃতীয় প্রবন্ধ 'ব্রজবিলাসে' রক্ষণশীল সমাজপতিদের ইঙ্গিত করে সেবাদাসী-সহবাস ও ভ্রূণহত্যার নিরাবরণ বিবরণ তিনি যেভাবে দিয়েছেন, তাতে তাঁর ওপর "বিদ্যাসুন্দরে"র ভূতের দৌরাত্ম্যের আভাস পাওয়া গেলে আজ যেন আমরা আর বিস্মিত নাই হই। 'ঘাড়কেঁদো' ঈশ্বরচন্দ্র আজীবন অনেক রকম ভূতের দৌরাত্ম্য বহন করে এসেছেন। সেই সময়ের

সেই পরিবেশে হীনচেতা পণ্ডিতদের শায়েস্তা করতে তিনি যে তাদের যোগ্যভাষায় উত্তর দেবার জন্যে স্বেচ্ছায় 'বিদ্যাসুন্দরে'র ভূত ঘাড়ে নেবেন, তাদের মাথার খুলি ফাটাবার জন্যে এবার মোটা লাঠির বাড়ি বসাবেন, —এসব ঘটনা সেই সংগ্রামে অজেয় পুরুষটির কাছে মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়। আবার যে ব্যক্তিটিকে কোনো নামকরা সাহেব তাঁর আপিসে টেবিলের ওপর পা তুলে বুটজুতো নাচিয়ে অভ্যর্থনা করলে তিনিও নিজের আপিসে তাঁকে পেয়ে ঠিক তেমনিভাবে টেবিলের ওপর পা তুলে চটিজুতো নাচিয়ে প্রতি-অভ্যর্থনা জানাতে যখন পারেন, তখন যে তিনি খেউড়-যুগের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রয়োজনে সহজেই খেউড়-গায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেও পারেন, এটিও প্রত্যাশিত ঘটনা।

সুতরাং চরম পাপাচারী প্রতিপক্ষের চাপানের মোক্ষম উতোর দিতে, 'ফোঁটাকাটা টিকিদাস'দের ঘ্যাঙানি চিরতরে বন্ধ করতে এবার তাঁর স্বাভাবিক সুভদ্র রীতি ত্যাগ করে ছদ্মনামে গ্রাম্য, অসংস্কৃতরূপে একটি লৌহদণ্ড হাতে শত্রুনিধনে নেমে পড়লেন। এ বিদ্যাসাগর সেই চিরপরিচিত মার্জিতরুচি সাহিত্য-সেবী নন,—তাঁরই অপর সত্তা, সমকালীন সমাজের প্রত্যহের ম্লানস্পর্শে লাঞ্ছিত, ব্যবহারিক জীবনের ধূলায় মলিন। এ বিদ্যাসাগরের সর্বাঙ্গে অমাবস্যা-যুগের কালিমা-ভূষণ।

তাঁর এ সত্তার প্রকৃতি প্রাকৃত, আমাদের কাছে প্রায় অপরিচিত। কিন্তু আজকের সংবেদী সমালোচক বলবেন, এ সত্তাও একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিমানসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এবং এখানেও তাঁর চালিকা শক্তি সেই অজেয় পৌরুষ, সেই অক্ষয় মনুষ্যত্ব।

অনুশীলন সমিতির ভূমিকা

বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনে অনুশীলন সমিতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা কারো অবিদিত নেই। ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান পরিচালক, সংগঠক তথা প্রাণপুরুষ পুলিনবিহারী দাসের কর্মবহুল জীবনকাহিনী কিন্তু অনেকেরই অজানা। বিভিন্ন গবেষণা-গ্রন্থে, আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলিতে এবং সরকারি রিপোর্ট ও অন্যান্য দলিলে পুলিনবিহারী সম্পর্কিত তথ্যাদি পাওয়া যায় বটে তবে তা কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিক্ষিপ্ত এবং পক্ষপাতদুষ্ট। ফলে পুলিনবিহারীর সাংগঠনিক দক্ষতা, বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড, দেশ ও কাল সম্পর্কে তাঁর ধারণা, ব্যক্তিজীবনের টানা-পোড়েন ইত্যাদি নিয়ে সামগ্রিক একটি মানুষের ছবি গড়ে তোলা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। অথচ বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসকে ভালোভাবে বোঝার জন্য পুলিনবিহারীর পূর্ণাঙ্গ রূপটি আমাদের প্রয়োজন। সম্প্রতি প্রকাশিত পুলিনবিহারী দাসের "আমার জীবনকাহিনী" গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই আত্মজীবনীতে তিনি তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন বা অন্যান্য বৈপ্লবিক সংগঠন সম্পর্কে যে ধারণা বিবৃত করেছেন—সেগুলিকে অন্যান্য তথ্য দ্বারা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তা সত্ত্বেও তাঁর জীবনকাহিনী থেকে সেই সময়ের বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্বরূপ, তার সাফল্য অসাফল্য সম্পর্কে সহজেই অবহিত হওয়া যায়। ড. অমলেন্দু দে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন। মূল গ্রন্থে ৩৯টি পাদটীকায় পুলিনবিহারী-কথিত বহু ঘটনার বিশ্লেষণ করে এবং তথ্য সংযোজন করে সর্বস্তরের পাঠকের কাছে গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। 'সম্পাদকের নিবেদনে' ড. দে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে বৈপ্লবিক আন্দোলনে পুলিন-বিহারীর প্রকৃত ভূমিকা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

আত্মজীবনী লেখার কৈফিয়ত হিসাবে পুলিনবিহারী তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন : 'বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে ১৯০৫ সন হইতে দেশব্যাপী যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, যাহার ক্রমপরিণতির ফলে দেশময় নানাবিধ

গ্রন্থসমালোচনা

বিপ্লব এবং বিভিন্নরূপ স্বাধীনতার স্পৃহা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল,—যাহার ফলে গান্ধীজী অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তারে সফলকাম হইয়াছিলেন,—সুভাষের শুভ অভ্যুদয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রৌঢ়, যুবক ও বালকের মধ্যে বিভিন্নরূপ নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল,—এবং যাহার ফলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিভিন্ন রূপ প্রতিকারের হেতু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ নূতন পদ্ধতি অবলম্বনে তৎপর রাখিয়াছিল,—সেই আন্দোলনের প্রথমভাগে ঘটনাচক্রে আমিও সামান্য ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম ;...আমার জীবন কাহিনীর সঙ্গে ঐ সমস্ত ঘটনাগুলির যতটুকু সম্পর্ক আমি তাহাই স্থূলভাবে লিখিয়া যাইব'—নিঃসন্দেহে তিনি ভারতের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সাক্ষী ও অংশীদার।

১৮৭৭ সালের ২৮শে জানুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার লোনসুর গ্রামে পুলিনবিহারীর জন্ম। তাঁর বৈপ্লবিক-রাজনৈতিক জীবন ১৯০৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯০৬ সালে ঢাকা অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র নামে সমধিক পরিচিত) পুলিনবিহারীকে ঢাকা অনুশীলন সমিতি গঠনের দায়িত্ব দেন। (১৯০২ সালে পি. মিত্র কলকাতায় অনুশীলন সমিতি স্থাপন করেন। বলা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের "অনুশীলন" নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ থেকে এই নামটি গ্রহণ করা হয়েছে।) ১৯০৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর অনুশীলন সমিতি বেআইনি ঘোষিত হয়। এই কালসীমার মধ্যে চোদ্দ মাস তাঁকে মনটোগোমরি জেলে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। ১৯১০-এর ফেব্রুআরি মাসে ওই জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ঢাকা অনুশীলন সমিতির কর্ণধারের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে তাঁকে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯১১ সালের ৭ই অগস্ট তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কলকাতা হাইকোর্টে আপীল করার পর এই দণ্ড হ্রাস করে তাঁকে সাত বছরের জন্য আন্দামানে কারাবাস দেওয়া হয়। ১৯১৮ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত মাদ্রাজ জেল, কৃষ্ণনগর জেল, ইলিসিয়াম রোডে

আমার জীবনকাহিনী—পুলিনবিহারী দাস। স. অমলেন্দু দে। অনুশীলন সমিতি, কলিকাতা, ১৯৮৭। সত্তর টাকা।

পুলিশ হেফাজত ইত্যাদিতে বিভিন্ন সময়ে আটক থেকে তিনি লোনসিংহ গ্রামে নিজের বাড়িতে অন্তরীণ থাকেন। ১৯২০ সালেই তিনি অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্ত হন। ভারতের রাজনৈতিক গগনে তখন গান্ধীজীর আবির্ভাব হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিনবিহারী গান্ধীজির অহিংস পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করতে পারেন নি। এই সময় নানা বিষয়ে অনুশীলন সমিতির মধ্যে সহকর্মীদের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি ১৯২২ সালে মূল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ১৯২২ থেকে ১৯৪৯—এই কালসীমায় 'বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি' (১/১/২ বিদ্যাসাগর স্ট্রীট) তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র হয় এবং লাঠিখেলা, অসিশিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে শরীর সুস্থ সবল করে "ক্ষাত্রশক্তি উজ্জীবনের" চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। এরপর তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে একেবারে সরে এসেছিলেন, একথা ঠিক নয়। হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আবাল্যলালিত দৃঢ়মূল ধারণার ফলে তিনি ১৯৩৯ সালে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন এবং কার্যকরী সভার সদস্য হন। ভারতের ওয়ার্কারস পার্টির প্রবীণ নেতা সমর বসুর পুলিনবিহারী সম্পর্কিত লেখার সূত্রে উদ্ধৃত করে ড. অমলেন্দু দে জানিয়েছেন যে, 'জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যখন তিনি মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করেন তখনই তাঁর জীবনাবসান ঘটল'। পুলিনবিহারী ১৯৪৯ সালের ৭ই অগস্ট মারা যান।

ঢাকার ম্যাজিসট্রেট অন স্পেশাল ডিউটি, পুলিনবিহারী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন : It is clear that the Anushilan is an extremely well organised revolutionary society, of which Pulin is the head, with dictatorial powers. From this it follows that the history of the Anushilan is the real history of Pulin.—'অনুশীলন সমিতির ইতিহাস হল পুলিনবিহারীর ইতিহাস'। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে (১৯১৮) বলা হয় : The Dacca Samiti was throughout the whole period the most powerful of these associations. The existence of this body alone, even if there had been no other, would have constituted a public danger. "আমার জীবনকাহিনী" প্রকাশিত হওয়ায় অনুশীলন সমিতি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি পুলিনবিহারীর কাছ থেকেই জানতে পারা গেল। গবেষকদের কাছে এর গুরুত্ব কম নয়।

পুলিনবিহারী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তাঁর রাজনৈতিক মতামত এবং সমাজ তথা ধর্ম সম্বন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যে স্পষ্টতা সংগত কারণেই তাঁকে তাঁর সমসাময়িকদের কাছে তো বটেই, এমনকি পরবর্তী প্রজন্মেরও কাছে অপ্রিয় করে তুলতে পারে। তাঁর এই স্পষ্টবাদিতার ফলে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। বাবা, মা, এমনকি নিজের সম্পর্কেও তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন তা বিস্ময়কর। মুসলমান ধর্ম, মুসলমানদের বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ না দেওয়া, সাম্যবাদ, এমনকি নারীপ্রগতি সম্বন্ধে তাঁর যে বিশ্লেষণ, তাতে তাঁকে সামাজিক দিক থেকে গোঁড়া হিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করা সহজ। ১৯০৯-এর জানুআরি মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে বাখরগঞ্জের দ্বাদশ বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমিতি বেআইনি ঘোষিত হয়। এই সমিতিগুলির বিশেষ করে যুগান্তরের কার্যকলাপ বিষয়ে এবং অরবিন্দ ও বারীন ঘোষ প্রমুখ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন বৈপ্লবিক দলগুলির মধ্যে বিবাদ এবং সন্দেহপরায়ণতার চিত্র ফুটে ওঠে, তেমনি পুলিনবিহারীকে মনে হয় অন্য সংগঠনের প্রতি অযথা অসহিষ্ণু। তিনি সামাজিক দিক থেকে ছিলেন প্রচণ্ড রক্ষণশীল কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে র‍্যাডিক্যাল। হিন্দুধর্মাশ্রিত স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। অনুশীলন সমিতি রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ গ্রহণ করে সেই ভাবেই পরিচালিত হোক—পুলিনবিহারীকে এই ধরনের উপদেশ দিলে তিনি বলেছিলেন ; 'রামকৃষ্ণ মিশন ধর্মপ্রতিষ্ঠান এবং অনুশীলন সমিতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সুতরাং উভয়ের এক আদর্শ ও একরূপ কর্মপদ্ধতি কখনও সম্ভব হইতে পারে না' (পৃ ২৯৭)।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়—নরমপন্থী, চরমপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক ধারা। পুলিনবিহারী শেষোক্ত ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রথম যুগে (১৮৭৬-১৯১০) বিপ্লবীরা এক ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন

ভারতের জন্য প্রয়াসী হলেও হিন্দুবৃত্তের বাইরে তাঁদের চিন্তাকে বিশেষ প্রসারিত করতে পারেন নি (অমলেন্দু দে : "ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও মুসলিম সমাজ" : চতুরঙ্গ নভেম্বর ১৯৮৭)। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র করে বাঙলাদেশে যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয় তাতে বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ আন্দোলিত হতে থাকে। এই পরিমণ্ডলের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই পুলিনবিহারীর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। বরিশালে থাকার সময় তাঁদের বাড়িতে ধর্ম বিষয়ে যেসব বিতর্ক হত এবং বাল্যাশ্রমের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে যেসব বক্তৃতা হত—এসব পুলিনবিহারীকে প্রভাবিত করে থাকবে (পৃ ১৩)। তবে সহপাঠী মুসলমান বন্ধুদের প্রতি তাঁর সদ্ভাবের অভাব ছিল না। মুসলমান বন্ধুর বাড়ি থেকে, এমন কি ফজলুল হকের বাড়ি থেকেও সরস্বতীপূজার ফুল তিনি আনতেন (পৃ ১৪)। ধর্মের উপর ভিত্তি করে বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতালাভ বিষয়ে দৃঢ়মূল ধারণা গড়ে ওঠায় অনুশীলন সমিতিতে তিনি মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন।

জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অনেক মুসলমান অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করতে চেয়েছিলেন এবং বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে যুক্ত অনেকেই এঁদের সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন। পুলিনবিহারী নিজেই এসব ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে আপত্তি করেছিলেন। আপত্তির কারণ হিসাবে তিনি ব্রিটিশ সরকারের মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লার স্বদেশী আন্দোলন বিরোধিতা এবং তাঁর প্ররোচনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের সমিতির কার্যকলাপের বিরুদ্ধাচরণকে দেখিয়েছেন। মনে রাখা দরকার, অন্য সব বিপ্লবী নেতাদের মতো তাঁর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের মানসিকতা এবং শক্তি ও ধ্বংসের দেবতা কালী, দুর্গা বা ভবানীর নিকট আত্মনিবেদন করে বিপ্লবীদের প্রতিজ্ঞা - গ্রহণ - পদ্ধতি মুসলমানদের অনুশীলন সমিতি থেকে দূরে রেখেছিল। এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে তিনি তাঁর মত দিয়েছেন।

'নিয়ম করিলাম সমিতিতে মুসলমান নেওয়া হইবে না। কেহ কেহ আপত্তি করিল, "মুসলমানগণকে গভর্ণমেণ্টই উত্তেজিত করিয়াছে ; আমরা সদ্ভাব রাখিলে মুসলমানগণও সদ্ভাব রাখিবে"—কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহই এই যুক্তি মানিতে পারিল না' (পৃ ১২০)।

'কখন কখন মুসলমান ছাত্র সমিতির সভ্য হইতে আসিত। কিন্তু তাহারা প্রতিজ্ঞাপত্র দেখিয়াই চলিয়া যাইত। অনেক স্থলে গ্রাম্য মুসলমানগণ আমাদের পদ্ধতিতে লাঠি শিখিতে নিতান্তই আগ্রহ প্রকাশ করিত ; মনে প্রাণে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ করিতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিত। কিন্তু আমি কখনও এ বিষয়ে স্বীকৃত হই নাই। নারায়ণগঞ্জের অভিভাবকগণ প্রথমতঃ আপত্তি করিয়াছিলেন যে সমিতিতে মুসলমান নেওয়া না হইলে তাহারা নারায়ণগঞ্জে সমিতি করিতে দিবেন না' (পৃ ১২১)।

মুসলমানদের সমিতিতে নেওয়া প্রসঙ্গে বিতর্ক দেখা দিলেও দুর্ভাগ্যের বিষয় পরিশেষে মুসলমানদের কাছে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথক বৃত্তে স্থাপন করলেও মুসলমানদের প্রতি তিনি 'বৃথা শত্রুতাভাব পোষণ করা বা কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার' সমর্থন করেন নি (পৃ ১৪৪)। যাই হোক, পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। নিম্নবর্গের হিন্দুদের উপরও পুলিনবিহারী প্রমুখ নেতারা বিশেষ আস্থা রাখতে পারেন নি। 'যে সমস্ত স্থানে জমিদার প্রভৃতি বিশিষ্ট সভ্যগণের নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, তথায় ঐ সমস্ত লোকের সাহায্য নিম্নশ্রেণীর লোকগণের মধ্যে দলগঠনের চেষ্টা দেখিতে হইবে' (পৃ ১৪৪)।

প্রথম অধ্যায়ের বৈপ্লবিক আন্দোলন হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্তের বৃত্তেই আবদ্ধ রইল। তাই এর ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে অরবিন্দ এবং যতীন্দ্রনাথের মতো নেতাদের ধর্মের আশ্রয়ে শান্তি পেতে হয়। "যুগান্তর" পত্রিকা ১৯০৬-এর ২২শে এপ্রিলে লিখেছিল : 'দেশের মুক্তির উপায় দেশের লোকেরই হাতে। দেশের ৩০ কোটি মানুষ যদি তাদের ৬০ কোটি হাত প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় তুলে ধরে তবেই বন্ধ হবে এ অত্যাচার। একমাত্র শক্তি দিয়েই শক্তির প্রকাশকে স্তব্ধ করা সম্ভব।' দুঃখের কথা, ৩০ কোটি মানুষকে একত্রিত করার চেষ্টায় বড়ো রকমের ত্রুটি থেকে গেল। পুলিনবিহারী দাসের জীবনকাহিনী পড়তে-পড়তে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পুলিনবিহারী নানাসূত্রে চিত্তরঞ্জন দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন ঘোষ, বীর সভারকার, সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে এসেছেন। এঁদের নীতি ও কার্যপ্রণালী প্রসঙ্গে অকপটে নিজের অভিমত দিয়েছেন। অনেকের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য প্রচলিত ধারণাকে নাড়া দেয়। গ্রন্থের সম্পাদক ড. দে এইসব ক্ষেত্রে পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন যে এইসব মন্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করার মতো তথ্য তিনি এখনও পান নি। পরবর্তী কালে বহু বিপ্লবী সাম্যবাদে দীক্ষা নিয়ে গণভিত্তিক বৈপ্লবিক সংগ্রামে বিশ্বাসী হন। কিন্তু পুলিন-বিহারী সাম্যবাদে বিশ্বাসী হতে পারেন নি—অনুশীলন সমিতির একাংশ আর-এস-পি হয়ে যাওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। সাম্যবাদ এবং নারীপ্রগতি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলি এখনকার পাঠকদের কাছে পীড়াদায়ক বলেই মনে হবে। তবে এসবই তাঁর নিজস্ববিশ্বাসপ্রসূত। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলিতে নিজের ভূমিকা এবং নিজ সমিতির কার্যকলাপকে গুরুত্ব দিয়ে অন্যদের কাজকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। পুলিনবিহারীর গ্রন্থ সম্বন্ধেও অনেকে হয়তো একই অভিযোগ আনতে পারেন।

অসহযোগ আন্দোলনে পুলিন-বিহারী যোগ না দেওয়ায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে কটাক্ষপাত করা হয়েছে। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি" গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে বলেছেন : 'অসহযোগ আন্দোলন এল ১৯২১ সালে। যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যাঁরা এক হয়েছিলেন সেই বন্ধুরা (যুগান্তরের শ্রেষ্ঠ অংশ) এতে যোগ দেন। অপর একদল পুলিন দাসের নেতৃত্বে একে বাধা দেন। এক বছর বাদে তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন—পুলিনবাবু ইংরেজ সদাগরের টাকা নিয়ে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করায় নিন্দনীয় হয়ে পড়েন। তাঁর অন্তরঙ্গ অনুচরেরা সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি দিয়ে তাঁর সংশ্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হন' (পৃ ৪২১)। পুলিন-বিহারী তাঁর গ্রন্থে রাজনৈতিক জীবনের শেষ পর্বের টানাপোড়েনের কথা বলেছেন, এমনকি সঙ্গীহীন হয়ে পড়েছেন একথাও জানিয়েছেন। তবে টাকা নিয়ে জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করার অভিযোগ পুলিনবিহারীর প্রতি অবিচার বলেই মনে হয়। কয়েক বছর বৈপ্লবিক হিংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থেকে এবং ব্রিটিশ সরকারের আক্রোশের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে তিনি যেসব কাজ করার পরিকল্পনা করেছিলেন তার আভাস তিনি দিয়েছেন (পৃ ৩২৪)। তাঁর লেখা তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি, পারলে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান হয়তো পাওয়া যেত।

সুসম্পাদিত এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কলকাতার অনুশীলন সমিতিকে ধন্যবাদ। আর ড. অমলেন্দু দে তো এই ধরনের গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য নজির স্থাপন করলেন।

দিব্যেন্দু হোতা

ধর্ম, জাতিসত্তা ও বাঙলাভাষা

বাংলাদেশের লেখকদের উপরোক্ত তিনটি বই একালের সবচেয়ে আলোচিত সমস্যা নিয়ে রচিত। বাঙলাভাষা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান ভূমি এখন বাংলাদেশ। এই স্বীকৃতি উপার্জনে বাংলাদেশের জনসমাজকে অনেক পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। বাংলাদেশ-নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভবে বাঙলা ভাষা এবং বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর অবিরাম এবং অবিচল সংগ্রামের ভূমিকা উপরোক্ত গ্রন্থগুলিতে বিশ্লেষিত হয়েছে।

রশীদ আল ফারুকী সুপরিচিত চিন্তাবিদ। তাঁর গ্রন্থের নামকরণেই বোঝা যায়, তিনি একটি বহু-উচ্চারিত বিতর্কে নিজের লেখনী যুক্ত করেছেন। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের কী সম্পর্ক থাকবে, এ নিয়ে বিতর্ক শেষ হয় নি। কিন্তু এটা দেখা গেছে যে ধর্মের নাম ভাঙিয়ে রাষ্ট্রপরিচালকগণ প্রায়শ নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধার করেন। এমন-কি, যে-সমস্ত রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ কবুল করে সংবিধানে তা লিপিবদ্ধ করেছে সেখানেও ধর্মধ্বজীরা সুযোগ বুঝেই ঝুলি থেকে কালো বেড়ালটি

ধর্ম ও রাষ্ট্র—রশীদ আল ফারুকী। অক্ষর, ৪ নিউ সার্কুলার রোড, ঢাকা-১৭। তিরিশ টাকা।

জাতীয়তাবাদ বিতর্ক—মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। ১১৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-২। পঁয়ত্রিশ টাকা।

বাংলাদেশে মাতৃভাষার অধিকার—হায়াৎ মামুদ। সাহিত্য সমবায়। ১০২/এ দীননাথ সেন রোড, ঢাকা-৪। চল্লিশ টাকা।

বের করে দেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রিক আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজপতিরা ধর্মের নামে যা-কিছু অপকর্ম করে থাকেন। ধর্ম নিয়ে যত বিরুদ্ধ আলোচনাই করা হোক না কেন, এখন পর্যন্ত দেশে বিদেশে ধর্ম বেশ জাঁকিয়েই রাজত্ব করছে। কিন্তু শিল্পবিপ্লব এবং রেনেসাঁসের ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে রাষ্ট্রের ওপর ধর্মের খবরদারি আর নেই। ধর্মাচরণকে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ধর্মযুদ্ধও আর তাদের করতে হয় না। ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা-মারামারির কুৎসিত দৃশ্যের অবতারণাও সেসব দেশে বিরল।

ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিতই ধর্মহীনতা বা ধর্মবিরোধিতা নয়। এই উপমহাদেশে ধর্ম নিয়ে যে বিরোধের উৎপত্তি, তার মূলে রয়েছে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এবং রাজনীতি। ধর্ম তার মুখোশ। একজন গরিব হিন্দু আর একজন গরিব মুসলমান একই শ্রেণী-শোষণের শিকার। কিন্তু তারা আসল শত্রুকে না চিনে যখন ধর্মের উলকি দেখে পরস্পরকে বৈরী বলে ভাবে তখন তা হয় ধুরন্ধর রাজনীতিকদের প্রবোচনায় যারা ধর্মকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের কালে কোনো ব্যাপক সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। কোনো-কোনো মুসলিম শাসক ব্যক্তিগতভাবে সংকীর্ণমনা থাকতে পারেন, কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে দুইজাতিতত্ত্ব প্রচারের কোনো নজির সে আমলে পাওয়া যায় না। ধর্মান্তরগ্রহণে বাধ্য করার জন্যও মুসলিম আমলে রাষ্ট্রীয় পোষকতার কোনো প্রমাণ নেই। ধর্মান্তরগ্রহণের অন্যান্য সামাজিক কারণ ছিল। সে জন্যেই দিল্লী থেকে অনেক দূরবর্তী প্রত্যন্ত প্রদেশ বাঙলায় মুসলিমদের সংখ্যা বেশি। নির্যাতিত বৌদ্ধদের ব্যাপকহারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ তাদের স্বেচ্ছাকর্ম। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের হাত থেকে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায় ইসলাম। সেই মুসলমান-ধর্মাবলম্বীরাই এখন প্রথম পরিচয়ে বাঙালি এবং দ্বিতীয় পরিচয়ে মুসলমান। পাকিস্তানিরা মুসলমানদের বাঙালি পরিচয় মুছিয়ে তাদের শুধুই মুসলমান আর পাকিস্তানি করার চেষ্টা করেছিল। ধর্মকে তারা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কাজে লাগায়।

ব্রিটিশ আমলে সাম্প্রদায়িকতাকে উশকে দেওয়া হত বিদেশী শাসকদের স্বার্থে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে হিন্দু মুসলিম উভয়েরই রক্ত ঝরেছে। কিন্তু অনিবার্যভাবেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হিন্দু সংস্কার আর চেতনা এমনভাবে এসে পড়ে যে তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিমদের ব্যাপক অংশ এ আন্দোলন সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করতে থাকে। এরই সুযোগ নিয়ে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্, ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন মুসলিম লীগের অধিবেশনে। ধর্মনিরপেক্ষতা বিসর্জিত হল রাষ্ট্রচিন্তা থেকে। উপমহাদেশের রাষ্ট্রনীতিতে এই ধর্মান্ধতার পরিণাম হল মারাত্মক। দ্বিখণ্ডিত হল ভারতবর্ষ। বাংলাদেশের অভ্যুত্থান সেই ধর্মান্ধতার প্রতিবাদ। রাষ্ট্রনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করল সাবেক পূর্বপাকিস্তানের বাঙালি জাতি—ধর্মে তারা কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ চাকমা। গ্রন্থকার মুজিব-পরবর্তী বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদ আমদানির তীব্র সমালোচনা করেছেন সঙ্গত কারণেই। বাঙালি জাতীয়তার বদলে এক ধরনের বাংলাদেশী জাতীয়তা প্রচলনের জন্য সুক্ষ্ম প্রচার চলে যার উদ্দেশ্য বঙ্গসংস্কৃতির মহান উত্তরাধিকার থেকে বাংলাদেশের মানুষকে বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত করে ধর্মীয় মতান্ধতার কীলক সমাজদেহে অনুপ্রবিষ্ট করা। এ বিষয়ে কোনো মতান্তরের অবকাশ নেই যে রাষ্ট্রদেহে ধর্মের অনুপ্রবেশই সমস্ত গণ-তান্ত্রিক এবং মানবিক মূল্যবোধের বিনষ্টির মূল। মহামতি মার্কস যে ধর্মকে আফিম বলেছেন তার সত্যতা এইসব ভেকধারী ধর্মধ্বজীরা ভালো-ভাবেই প্রমাণ করেন তাঁদের কাজকর্মে। ধর্মকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্বাস হিসেবে মর্যাদা দিয়ে তাকে রাষ্ট্রচিন্তা থেকে দূরে রাখা ছাড়া বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির কোনো বিকল্প নেই, ফারুকী সাহেবের এই বিচার যথার্থ। তাঁর মতামত তিনি খুব পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ধর্মের দোহাই দিয়ে আসলে বাংলাদেশের শাসকরা সমাজতন্ত্র, যুক্তিবাদ তথা মানবপ্রগতির ধারা অবরুদ্ধ করতে প্রয়াসী। এই শাসকদের বকলমে কতিপয় বুদ্ধিজীবী ও আলেম সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে বলেন যে, সমাজতন্ত্র ইসলামবিরোধী ও মানবতাবিরোধী মতবাদ। এই উক্তির পর কি আর কোনো সন্দেহ থাকে যে এইসব ইসলাম অনুরাগীদের আসল চরিত্র কী? রশীদ আল ফারুকীকে তাঁর মুক্তবুদ্ধির জন্য অভিনন্দন জানাতে হয় যখন তিনি এই মেকি ইসলামিদের ফতোয়ার প্রতিটি বক্তব্য নাকচ করে বলেন, সমাজতন্ত্র নয়—বরং যুগে-যুগে ধর্মই মানবতাবিরোধী ভূমিকা পালন করে এসেছে। নতুবা ধর্মের নামে একসময়ে আরবে করা হত শিশুহত্যা, আর

এদেশে হত নরবলি আর সতীদাহ। অন্যদিকে, সমাজতন্ত্রের মূল ভিত্তি মানবতাবাদ যার প্রধান অন্তরায় ব্যক্তিমালিকানা এবং সম্পদের অসম-বণ্টন। এর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করে বলেই কি সমাজতন্ত্র হয়ে গেল ইসলাম তথা সমস্ত ধর্মধ্বজাবাহীদের দুশমন? বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে এর উত্তর পাওয়া যাবে।

১৯৭৫ সালে মুজিবর রহমান মারকিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে সপরিবারে নিহত হবার পর বাংলাদেশের জাতিসত্তা-বিষয়ক প্রশ্নটি এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়। মুজিবের সময়ে বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে বলা হয়: 'ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।' বলা বাহুল্য, এই ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা বাংলাদেশের পরবর্তী শাসকদের ঠিক মনোমত হয় নি। এই জাতীয়তাবাদে ইসলামের কথা নেই, আছে একটি জাতীয় চেতনার কথা যা ইসলামী পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনে নির্যাতিত বাঙালিকে মুক্তিসংগ্রামে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। বাংলাদেশে যাঁরা ক্ষমতা দখল করে আছেন তাঁরা বাঙালি জাতীয়তাবাদে বৃহত্তর বাঙলাভাষী গোষ্ঠীর অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের সঙ্গে একাত্মতার শিকড় খুঁজে পান। এর বিস্তৃতি ঘটলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রিক সীমানা অতিক্রম করে এই উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে মহীরুহের আকার ধারণ করতে পারে, এই আশঙ্কায় তারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নামক একটা ভিন্ন শব্দ আমদানি করেন সংবিধানে। বর্তমান গ্রন্থে চোদ্দজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর আলোচনা সংকলিত হয়েছে। এই আলোচনায় বিভিন্ন দিক থেকে বাঙালির জাতীয়তাবোধ তথা জাতীয়তাবাদের মৌলিক প্রশ্ন বিচার করা হয়েছে। বাঙালি জাতিসত্তা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কোনো রাষ্ট্রশাসকের বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর সুবিধামত তার সংজ্ঞা-বদল সম্ভব নয়। উনিশ শতকের জাগৃতির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তার যা-কিছু সুফল পেয়েছিল বাঙালি হিন্দুসমাজ। চিন্তায় আর চেতনায় বাঙালি জাতীয়তাবাদে পড়েছিল হিন্দুত্বের প্রভাব। মুসলিম চিন্তা আর চেতনায় ছিল অভিমান এবং ক্ষোভ। এরই সুযোগে পরবর্তী কালে দেখা দেয় পারস্পরিক বিদ্বেষ। স্যার সৈয়দ আহমদের মতো ব্যক্তিরা হিন্দু-ভীতি তথা বিদ্বেষবশে মুসলিমদের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন ব্রিটিশপ্রীতি। হিন্দু এবং মুসলিমের বিরোধের সূত্রপাত হয়। প্রখ্যাত পণ্ডিত আহমদ শরীফ তাঁর "ইতিহাসের দর্পণে দুই শতকের বাঙালী" নিবন্ধে এই প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে যথার্থই প্রশ্ন উচ্চারণ করেন যে, আজকের বাংলাদেশে যেখানে শতকরা ৯৫ জন হল মুসলিম এবং স্বরাষ্ট্রে তারা সবদিক দিয়েই অপ্রতিদ্বন্দ্বী তখন বাঙালি জাতিসত্তার গৌরব প্রতিষ্ঠার বদলে ইসলাম বিপন্ন জিগীর তোলা হয় কার স্বার্থে? তিনি বলেন, 'তাহলে ইসলামের শত্রু হিসেবে শহরে মুমীনের ও সরকারের আতঙ্কের কারণ কারা? —যারা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, যারা শহরে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক দল—তারাই।' অবশ্য বাংলাদেশের শহুরে বুদ্ধিজীবীদের ওপর অত্যধিক ভরসা করার কোনো কারণ নেই। বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশে সাধারণ মানুষের দান অপরিসীম। ধর্মে তাঁরা মুসলমান বা হিন্দু যাই হোন না কেন, আর্য সভ্যতার যুগ থেকে শুরু করে মোগল-পাঠান-ইংরেজ শাসনকালেও এই ব্যাপক গণভিত্তির জোরেই বাঙালি জাতিসত্তা তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় তারই ঐতিহাসিক পরিণতি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিন্দু-আধিপত্যবশত প্রাক-স্বাধীনতা-পর্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে হিন্দু সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের ছাঁচে দেখবার এবং দেখাবার প্রবণতা ছিল প্রকট। ফলত, মুসলিমরা তাকিয়ে থাকত আরব-ইরান-তুরস্কের দিকে। এই মানসিকতা থেকেই স্বাধীন মাতৃভূমিতে বাঙালি মুসলমানকে বাংলাদেশী সত্তা নিরূপণে প্ররোচনা দেওয়া হয়। এর সঙ্গে ইতিহাস বা সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। রাজনৈতিক চাতুরির দ্বারা সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আদর্শের বিরোধিতাই এর উদ্দেশ্য। বদরুদ্দীন উমর দেখিয়েছেন যে, হাজার বছরের যে বাঙালি সংস্কৃতি সে সংস্কৃতি পশ্চিম বাঙলার জনগণের যেমন, পূর্ববাঙলার জনগণেরও ঠিক তেমনি। রাষ্ট্রব্যবস্থা পৃথক হলেও জাতিসত্তা পৃথক না হওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, জারমানি বিভক্ত হয়েছিল। কিন্তু তাদের জাতিসত্তার পরিচয় আলাদা হয় নি। সে কারণেই পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি এবং বাংলাদেশের বাঙালি নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বিচারে একই জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় আলাদা হলেও তারা উভয়েই বাঙালি। সুতরাং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকল্প বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হওয়া অনৈতিহাসিক এবং হাস্যকর।

একসময়ে হিন্দু জমিদার, মহাজন আর সুদখোরদের অত্যাচারে বিত্তহীন মুসলিম প্রজা-খাতক নিপীড়িত হবার ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল হিন্দুবিদ্বেষ। এর মূল কারণ ধর্ম নয়, অর্থনীতি। এরই প্রতিক্রিয়ায় দেশভাগ এবং মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ পৃথক রাষ্ট্র গঠন। সেই কারণ দূর হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশে সেই অর্থে কোনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আর থাকার কথা নয়। বরং বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের মনে ক্ষোভ রয়ে গেছে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য অংশীদারত্বের অভাবে। কিন্তু এটা যে জাতিসত্তার সংকট নয়, নিতান্তই একটা অস্থায়ী রাজনৈতিক সংকট, তা লেখকদের আলোচনায় স্পষ্ট হয়।

বাঙালি না বাংলাদেশী? এই প্রশ্ন উত্থাপনের পিছনে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা বৃহত্তর অর্থে ভারতীয়, কিন্তু তারা আদতে বাঙালি। সুতরাং বাঙালি জাতীয়তাবাদের চিন্তা সীমান্তের ওপারে দৃঢ়মূল হলে এপারের বাঙালিদেরও মানসিক সন্তুষ্টি। ভারতে বাঙালি জাতিসত্তার গরিমা তার ভারতীয়ত্বের প্রভাবে ভিন্নতর মাত্রা লাভ করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাতে পশ্চিমবঙ্গও হিন্দি-প্রাধান্যপুষ্ট দিল্লী প্রশাসন পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ভারতরাষ্ট্রের ফেডারেল চরিত্র বিকৃত হবার ফলে বাঙালিসহ প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর আত্মমর্যাদা আজ আহত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দেখবার পর সীমান্তের ওপারে এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বাঙালি জাতির আত্মচেতনার বিকাশ এবং রাষ্ট্রিকস্তরে তার প্রতিষ্ঠার সাফল্য সম্পর্কে সমস্ত বাঙলা-ভাষীরই আগ্রহ আজ অপরিমেয়। জাতীয়তাবাদ কখনই ধর্মভিত্তিক নয়। যদি তাই হত তাহলে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হত না; আরব দেশগুলিও একই রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্গত হত; ইরান-ইরাক যুদ্ধ চলত না অবিরামভাবে। বাংলাদেশের স্থিত-স্বার্থবাদীরা ইসলামকে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলেছে। ভারতে যেমন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান শ্লোগান তুলে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সত্তা বিলোপের চক্রান্তে প্ররোচনা দেয়। এক আলোচক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পক্ষে লিখেছেন পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক প্রাধান্য থেকে মুক্ত হবার জন্যই পৃথক পরিচয় দরকার। এই চিন্তা হীনম্মন্যতার পরিচায়ক। পশ্চিমবঙ্গ একটি অঙ্গরাজ্য। ভারতরাষ্ট্রে তার স্থান ২৫টি অঙ্গরাজ্যের একটি হিসেবে। ভারতে হিন্দির দাপট ক্রমশ এমনি বাড়ছে যে বঙ্গসংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য রীতিমত সংগ্রাম করা ছাড়া এপারের বাঙালিদের অন্য কোনো পথ খোলা থাকবে না। সুতরাং এনায়েতুল্লাহ্‌ খানের বক্তব্য, 'ঐতিহ্যের অনুশীলন এক কথা কিন্তু সমন্বিত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নামে পররাষ্ট্রের আধিপত্যের পথ সুগম করা আরেক কথা' ধোপে টেকে না। সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের কথাই যদি ধরা যায় তাহলে এ কথা মনে রাখা ভালো যে, হাজার-হাজার মাইল দূরে বসে আমেরিকা তার টাকার জোরে আর রাজনৈতিক আধিপত্যের জোরে দুনিয়া জুড়ে তার সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রসার এবং বজায় রাখার চেষ্টা করছে। তৃতীয় বিশ্বের দিকেই তাদের নজর। পপ সংগীত, জিনসের পোশাক, মারিহুয়ানা থেকে শুরু করে মিডিয়া মারফত কমিক স্ট্রিপস্, সংবাদ সরবরাহ সংস্থা মারফত বাছাই-করা সমাজতন্ত্রবিরোধী সংবাদ পরিবেশন ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কলুষতা বিস্তারের বিরুদ্ধেই বরং বাংলাদেশের সংস্কৃতিমনস্কদের তৎপরতা আকাঙ্ক্ষিত। পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতির সেই আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা সীমিত। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে বাঙালি জাতীয়তাবাদও কোনো জাতির প্রকৃত মুক্তির পক্ষে শেষ কথা নয়। সেই মুক্তির আন্দোলন কী রূপ নেবে এবং কখন নেবে সে তার নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে জাতীয়তাবাদের বেড়া ভেঙে আন্তর্জাতিক শ্রেণীচেতনা ও সাংস্কৃতিক বিশ্ববীক্ষা একদিন জরুরি হয়ে পড়বে ইতিহাসের নিজস্ব গতিতেই। কিন্তু তার জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর চিন্তা এবং চেতনার প্রাসঙ্গিক উত্তরণের তাৎপর্য মূল্যহীন হবে না। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের এই সামূহিক আলোচনার এই সারাংসার সযত্নে অনুধাবনযোগ্য।

হায়াৎ মামুদের বইটি বাংলাদেশে প্রশাসনিক স্তরে বাঙলা ভাষা কতটা

চালু হয়েছে তার এক আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ। ভূমিকায় লেখকের মন্তব্য : ‘জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—চারটি মূল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রে এখন গণতন্ত্র নেই, সমাজতন্ত্রের ধারণা পর্যন্ত হাস্যকর দিবাস্বপ্ন, ধর্মনিরপেক্ষতা বহিষ্কৃত, এবং জাতীয়তাবাদের অর্থ বিকৃত—বাঙালি জাতীয়তাবাদ বর্তমানে “বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ”-এর আড়ালে সু-কৌশলে ও গোপনে গোপনে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠার গ্লানিকর অপচেষ্টায় নিমজ্জিত।’ বাংলাদেশ একটি একভাষী রাষ্ট্র—ভারতের মতো বহুভাষী নয়। তার প্রশাসনিক কাজকর্মে এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাঙলাভাষা প্রচলনে ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। সমস্যা পশ্চিমবঙ্গেও থাকত না, কিন্তু আছে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা ও প্রশাসনের সমস্ত কাজে প্রয়োগ করা একটি জাতিসত্তার প্রাথমিক স্বীকৃতি। বাংলাদেশ যখন পাকিস্থানি ঔপনিবেশিক শাসনে ছিল তখন তাকে ভাষার স্বীকৃতির জন্য রক্ত দিতে হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ঢাকার পলটন ময়দানে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র দম্ভোক্তি, ‘উর্দু অ্যাণ্ড উর্দু অ্যালোন উইল বি দি স্টেট ল্যাংগুয়েজ অভ পাকিস্তান’ সেদিনকার পাকিস্তানি বাঙালিরা মেনে নেয় নি। ১৯৫২ সালে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শুরু হয় দেশজোড়া এক ব্যাপক, গভীর এবং সর্ব অর্থেই একটি জাতীয় আন্দোলন। মহান একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তদানের বিনিময়ে বাঙলা ভাষা পেয়েছিল তার স্বীকৃতি। ১৯৭১-এর পর বাংলাদেশ তো বলতে গেলে বাঙলাভাষার জঠর থেকেই রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিষ্ঠ হল। পাকিস্তানি আমলে খাজা নাজিমুদ্দিন প্রমুখ লীগনেতারা বরাবর উর্দুভাষার পক্ষে সওয়াল করেছেন। কিন্তু আমরা দেখি যে, পাকিস্তান সৃষ্টির অল্পকাল পরেই তৎকালীন আজাদ পত্রিকায় (৮ ডিসেমবর ১৯৪৭) মৌলানা আকরম খাঁ বাঙলাভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দিয়ে স্বাক্ষরিত বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষায় ‘রাষ্ট্রের জনগণের মাতৃভাষা সেখানকার রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবে, ইহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক কথা।’ তাঁর বক্তব্যের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এই যে, অবিভক্ত বঙ্গে পাকিস্তানের পক্ষে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা জোরালো আন্দোলন পরিচালনা করে। “আজাদ” পত্রিকার ভাষাও ছিল উর্দু-ফার্সি-মিশ্রিত বাংলা যাকে নিয়ে সে সময়কার আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি কংগ্রেস-সমর্থক সংবাদপত্র প্রতিনিয়ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। কিন্তু আকারম খাঁ ছিলেন মনেপ্রাণে বাঙালি এবং বাঙলাভাষার ওপর ছিল তাঁর অসামান্য দখল। তাঁর কথাতেও সেদিনকার পাকিস্তানিরা কান দেয় নি।

১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে গঠিত হয় আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে যুক্তফ্রনট মন্ত্রিসভা। গঠিত হয় বাংলা একাডেমি। পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা রূপে বাঙলাও স্বীকৃতি পায় উর্দুর পাশাপাশি। কিন্তু তাতেও বাঙলাভাষা তার আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদা পেল না। বাঙলা, তবে কী রকম বাঙলা? এ নিয়ে শুরু হল নানা দ্বন্দ্ব, নানা কুটকচালি। বাঙালি কবির রচনায় ঈশ্বর শব্দ থাকায় তা সরকারি সাহিত্যপত্রে প্রকাশের ছাড়পত্র পায় না। নজরুল ইসলাম জাতীয় কবি হিসেবে স্বীকৃত হলেও তাঁর কবিতা থেকে ভগবান ইত্যাদি শব্দ বর্জন করতে বেতার, টেলিভিশন কর্তাদের বিবেকদংশন হত না। ভারতে সরকারি হিন্দি ভাষা থেকে যেমন প্রচলিত উর্দু ফার্সি শব্দ ছেঁটে বাদ দেওয়া হচ্ছে তেমনি বাংলাদেশে আজও বাঙলাভাষার অতিপ্রচল অনেক সহজবোধ্য শব্দ বর্জন করে তাতে আরবি ফার্সি প্রতিশব্দ বসানোর ঝোঁক বর্তমান। বাংলাদেশ টেলিভিশনে এখনও নাকি রবীন্দ্রসংগীত গাইতে হলে তার পাঠ পরীক্ষার জন্য জমা দিতে হয়। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব কতকগুলি অনুষঙ্গ নির্মাণের পদ্ধতি আছে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপকরণে নির্মিত হয় তার শব্দভাণ্ডার। কথ্যভাষার এই প্রবল শক্তি তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং সহজ। তাকে রুদ্ধ করতে যাওয়া মূঢ়তা। শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭১-এর নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে চালু হবে বাঙলাভাষা। বাংলাদেশ পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম গ্রহণের পর শেখ মুজিব তাঁর প্রতিশ্রুতিমত কাজই করেছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপটেমবর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবর রহমান বাঙলাভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন। এর আগে আর কোনোদিন বিশ্বসভাপ্রাঙ্গণে বাঙলাভাষা উচ্চারিত হয় নি।

বাঙলাভাষার নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্বীকৃত হবার পরও যে সর্বস্তরে এখনও বাঙলা চালু হয় নি, লেখক তার জন্য দায়ী করেছেন একশ্রেণীর আমলার বাঙলা-ভাষা-বৈরিতাকে। এটাও খবর যে ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার এক ঘোষণায় বলেন, সরকারি কাজকর্ম করতে হবে সাধু বাঙলায়। হঠাৎ এই সাধুভাষার প্রতি প্রীতির আসল উদ্দেশ্য কী? যতদূর সম্ভব বাঙলাভাষাকে সাধারণ মানুষের কাছে জটিল এবং আয়াসসাধ্য করে তোলা? বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তো কাব্যচর্চাও করেন বাঙলা ভাষায়। সুতরাং তাঁর আমলে বাঙলাভাষা প্রচলনে স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর উৎসাহ ও উদ্যোগ রয়েছে। কিন্তু তাতেও জননী বাঙলাভাষা তার ন্যায্য সম্মান আর স্বীকৃতি পাচ্ছে না। একই সমস্যা আমরা পশ্চিমবঙ্গেও লক্ষ করি। একইভাবে উভয় বাঙলাতেই একশ্রেণীর লোক ছেলেমেয়েদের পাঠান ইংরেজি-মিডিয়ম স্কুলে। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পঠন-পাঠন তুলে দেওয়ায় এদেশে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী কতই না শোকাকুল হয়েছিলেন! বাংলাদেশেও এঁদের জ্ঞাতিভ্রাতারা থাকবেন তাতে আর বিচিত্র কী! দেশের শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণীস্বার্থই বাঙলাভাষার সার্বিক প্রচারের বিরোধী। সে কারণেই ইংরেজি উচ্চতর সোপানে আরোহণের পথ করে দেয় মসৃণ। বাঙলাভাষার প্রতি নামমাত্র স্বীকৃতি দিয়েই তাঁদের কাজ শেষ। দেশের মানুষের সার্বিক মুক্তি ব্যতীত মাতৃভাষার প্রকৃত মর্যাদাপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শাসনকালের দাস মানসিকতাই এখন বিদেশী ভাষার সৌকর্য আবিষ্কারে বিমোহিত। বাঙলাভাষার লাবণ্যে তাদের অরুচি তাই স্বাভাবিক। কিন্তু, বিনা স্বদেশীভাষা পূরে কি আশা? প্রত্যেক বাংলাভাষী নিজেকেই এই প্রশ্ন করুক। **কৃষ্ণ ধর**

একটি অবহট্ট কাব্যের পুনরুদ্ধার

নাম লেখা আছে ‘অদ্দহমান’। নামটি কবির। আর কাব্যটির নাম হল “সংণেহয়রাসউ”। আধুনিক পাঠকের জন্য সংস্কৃত আর বোধগম্য করে পুনর্নামকরণ করা হয়েছে ‘আবদুর রহমান’ ও “সন্দেশরাসক”। আবদুর রহমানের “সন্দেশরাসক” একটি অবহট্ট কাব্য। অবহট্ট সাহিত্যের অপরাপর নিদর্শন হচ্ছে “প্রাকৃত পৈঙ্গল” ও “পৃথ্বীরাজরাসক”। বহুকবির রচিত কবিতার সংকলন এগুলো। কিন্তু সংকলনগুলো সম্পূর্ণ ও অখণ্ড পাওয়া যায় নি। “সন্দেশরাসক” হচ্ছে অবহট্ট সাহিত্যের সেরকম নিদর্শন যা কিনা সম্পূর্ণ পাওয়া গেছে। “সন্দেশরাসক” সম্বন্ধে ড. সুকুমার সেন তাঁর “ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে” নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন :

‘কাব্যটি মেঘদূতের মতো, তবে নায়কের উক্তিময় নয়, নায়িকার উক্তিময়। কবি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় বেশ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অপভ্রংশের অংশ অত্যন্ত বেশি বলিয়া রচনা কঠিন ও গুরুভার।’ (পৃ. ৪২৬)

বাঙলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে কাব্যটির বিস্তারিত তথ্য অজ্ঞাত ছিল। রস আস্বাদনের উপায় তো ছিলই না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রাজ্ঞ অধ্যাপক ড. মমতাজুর রহমান তরফদার “সন্দেশরাসক” নামের অবহট্ট কাব্যটি সম্পূর্ণ আধুনিক বাঙলায় রূপান্তর করেছেন। তিনি প্রাপ্ত একাধিক পাণ্ডুলিপি ও সম্পাদিত গ্রন্থ পরীক্ষা করেছেন এবং এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপনা করে সারগর্ভ ভূমিকা লিখেছেন। টীকা-টিপ্পনীসমেত তিরানব্বই পৃষ্ঠার সরলগদ্যে রূপান্তরিত অবহট্ট কাব্যটি বাঙালি পাঠকের সম্মুখে উন্মোচন করার জন্য অনুবাদক, গবেষক ও পণ্ডিত তরফদার সাহেবকে সাধুবাদ জানাতে হয়। জনান্তিকে বলে রাখা ভালো, ড. তরফদার কিছুটা সংগোপনে কবিতাচর্চাও করে থাকেন। কবিতা-রসিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি “সন্দেশরাসক” কাব্যটিকে কাব্যান্তর না করে গদ্যান্তর করেছেন। ফলে মূলের বাণীর বিশ্বস্ততা যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে বলা যেতে পারে। কবিতার অনুবাদ করার জন্য কবিতাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলে বাণীর বিশ্বস্ততার যে সমস্যা সচরাচর দেখা দেয়, তরফদারের রূপান্তরে সে সমস্যা আসে নি। সুতরাং মূলবাণীর সংগঠন অবিকৃতভাবে পাওয়া সহজ হবে “সন্দেশরাসকে”র বাঙলা রূপান্তরে। ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটির প্রথম ৪৭ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সুলিখিত ভূমিকা আছে। এই ভূমিকা মূলকাব্য সম্বন্ধে ড. তরফদারের দীর্ঘ গবেষণার ফল। কাব্যটির পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

‘ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এটিই একমাত্র কাব্য যাতে ‘প্রক্রম’ বিভাজনের রীতি অনুসৃত হয়েছে। হয়ত এটা ‘মেঘদূতে’র ‘পূর্বমেঘ’ ও

আবদুর রহমানের সন্দেশরাসক (১৯৮৫)—গবেষণা ও অনুবাদ ড. মমতাজুর রহমান তরফদার। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা। তিরিশ টাকা।

'উত্তরমেঘ' জাতীয় খণ্ডবিভাগের প্রচ্ছন্ন প্রভাব। কাব্যটি তিন প্রক্রমে বিভক্ত। প্রথম প্রক্রম অনেকটা অবতরণিকা বা গৌরচন্দ্রিকার মত যাতে আছে স্রষ্টার বন্দনা, কবির আত্মপরিচয়, কাব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিনয়-ভাষণ, পাঠকের প্রতি আবেদন ও বিষয়বস্তুর শৃঙ্গার-রসাত্মক প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির উক্তি। দ্বিতীয় প্রক্রমটি বিশেষ কারণে গুরুত্ব-পূর্ণ। কাব্যের মৌল বিষয় এতেই বিধৃত।'

'ম্লেচ্ছদেশ' মূলতানের মুসলমান কবি, মীরসেন তাঁতীর পুত্র, 'কুলকমল' আব্দহমান যে কাব্যটি রচনা করেছেন তার রচনাকাল ড. তরফদারের মত অনুযায়ী ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দের বেশি পূর্বে নয়। অন্যান্য পণ্ডিতেরা অবশ্য এগার শ শতক পর্যন্ত হতে পারে বলে ধারণা করেছেন। মূল কাব্যটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় প্রধানত পণ্ডিতদের জন্য সুবিধা হল। তাঁরা 'প্রথানুযায়ী' কাব্যের ভাষা, কবির জন্মস্থান ও জন্ম-কাল, কবির নাম-গোত্র ও ধর্ম-পরিচয় সম্বন্ধে বিতর্কের অবতারণা করতে পারবেন। বিতর্ক যে নেই তা নয়, তবে সে বিতর্ক আরো জমজমাট হতে পারবে অনুবাদ ও অনুবাদের ভূমিকার উপস্থিতিতে। চণ্ডীদাস-বিতর্ক আর বিদ্যাপতি-বিতর্কের মতোই উপাদেয় হবে অব্দহমান-বিতর্ক; কিঞ্চিৎ অধিকও হতে পারে।

অবশ্য কাব্যরসিকদের জন্য যে হতাশার কারণ আছে তা নয়। গদ্যে রূপান্তরিত কাব্যটি শৃঙ্গাররসে পরিপূর্ণ। মধ্যযুগীয় শৃঙ্গাররসের কাব্য-পাঠ করে যাঁর হৃদয়কে প্রশান্ত করতে বাসনা করেন তাঁরা নায়িকার উক্তিতে রচিত কাব্যটির গদ্যানুবাদ পাঠ করে মূলকাব্য পাঠের প্রেরণা পাবেন। কবির গৌর-চন্দ্রিকার বাণী থেকেই এ রসের প্রাচুর্য অনুভব করা যাবে। কবি বলেছেন:

'এই কাব্য অনুরাগিগণের রতিগৃহ, কামুকদের জন্য মনোহর, মদন-মাহাত্ম্যের উদ্দীপক, বিরহিণীদের জন্য মকরধ্বজ, এবং শোনো (এ কাব্য) রসিকগণের জন্য বিশুদ্ধ রস-সঞ্জীবক। এ-কাব্য অতি-স্নেহপূর্বক রচিত, শৃঙ্গার-ভাবনায় গন্ধিত এবং শ্রবণপটহে অমৃত সরোবর স্বরূপ। সুরতিসঙ্গে যে বিদগ্ধ, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তির মনের ভাবে এর অর্থ ও লক্ষণ উৎকীর্ণ এবং সে এর অর্থলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।' (পৃ. ৫৪)

তুলনামূলক সাহিত্য বা কাব্য অধ্যয়ন যাঁদের আনন্দের বিষয়, "সন্দেশরাসক" তাঁদেরও পরিতৃপ্তি দান করবে। মহাকবি কালিদাসের মেঘ-দূতকে যাঁরা বিচ্ছিন্ন কাব্য ঠাউরে এসেছেন তাঁরা সেই ঐতিহ্যের অনুবর্তন অব্দহমানের কাব্যে দেখে উৎফুল্ল হবেন।

এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ বই প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বাংলা একাডেমী আমাদের ধন্যবাদার্হ। তবে একটি বিষয়ে একাডেমীর নজর দেওয়া উচিত ছিল। তা হল কাব্যটির স্তবক-বিন্যাস পৃথক পৃথক করা। বাক্যের পারম্পর্য ও বিন্যাস সুপরিকল্পিত হলে মূল কাব্য-অবয়বের স্তবকবন্ধন সুস্পষ্ট হত এবং মূলের কাব্য-পরিমণ্ডল আরো অটুট থাকত।

মনসুর মুসা

দেশের কবিতা ও বিদেশের কবিতা

আগুনের পাখি—স. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রকাশক কল্যাণ চন্দ, কলিকাতা-৪৭।

পুতুলনাচের গান—দেবী রায়। মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-৭৩। দশ টাকা।

ঝাপসা ফুল গাছপালায়—অর্ধেন্দু চক্রবর্তী। মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-৭৩। ছয় টাকা।

রোদের প্রার্থনা—নির্মল বসাক। ইয়ং রাইটার্স, কলকাতা-৫৪। দশ টাকা।

মিরোস্লাভ হোলুব ও তাঁর কবিতা—আনন্দ ঘোষ হাজরা। বিশ্বজ্ঞান, টেমার লেন, কলকাতা-৯। পনেরো টাকা।

ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বলি তরুণ লেখক সোমেন চন্দের ৬৫-তম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত "আগুনের পাখি" পুস্তিকাটি একটি স্মরণীয় প্রকাশকর্ম হিসেবে চিহ্নিত হবার যোগ্য। এই পুস্তিকাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে "প্রাচীর" নামে বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য ছোটো কাব্যসংকলনটির সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ। আজকের তরুণ কবি এবং কাব্যপ্রেমীরা "প্রাচীর" সংকলনটি দেখতে পেয়ে নিশ্চয় নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করবেন। তরুণ গল্প-কারের শোকাবহ মৃত্যুর পরেই দক্ষিণ কলকাতা ছাত্র ফেডারেশনের তরফে "প্রাচীর" প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লিখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়ের মতো যশস্বী কবিরা। অমিয় চক্রবর্তীর কণ্ঠে দৃঢ় উচ্চারণ 'গড়ি প্রাচীর' / ধ্বংসবাহীকে করুক স্থির / প্রাণখড়্গ'—আজও সমান তেজে ঘোষণার প্রয়োজন। সংকলনটির দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে উত্তরকালে বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবীণ আর নবীন কবিদের কবিতা। "প্রাচীর"-এর কবিতাগুলো যেমন এক ব্যক্তিহত্যার শোক থেকে লেখা হয়েও ব্যক্তিগত গণ্ডি পেরিয়ে একটি অন্ধকার যুগের ঘৃণ্য বর্বরতাকে উদ্ঘাটন করেছে, পরবর্তী কবিতা-গুলোতে সেই মাত্রা নেই। অধি-কাংশেই আবেগের প্রাবল্য এবং বহু-ব্যবহৃত উচ্চকিত শব্দ আর বাক্যবন্ধ যা সচরাচর কোনো কবিশিল্পীর মৃত্যুর পর বলা হয়েই থাকে।

কয়েক মাস আগে দেবী রায়ের "এই সেই তোমার দেশ" পড়ে যেমন ভালো লেগেছিল, তাঁর পরবর্তী কাব্য-গ্রন্থ "পুতুলনাচের গান" পড়ে তেমন লাগল না। আগের বইটির কবিতা-গুলোতেই কবির কবিত্বশক্তির প্রকাশ ছিল বেশি। এ বইটিতে মনে দাগ কাটার মতো কবিতা অল্প। তার মধ্যেই বারবার পড়ার মতো হল "ও জল মর্মভেদী জল", "ঝুলন্ত ক্রুশ", "ও তুফান নয়"। ৮২-৮৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন কবিতার এই সং-কলনে কয়েক পংক্তিতে সম্পূর্ণ কতক-গুলো খুদে পদ্য রয়েছে, সেগুলোর ব্যঙ্গে যেন বিদ্যুৎ-ঝলক, যেমন "কংক্রিট-ভদ্রতা" নামের এক লাইনের কবিতাটি হল 'যে কোন অছিলায় ব্যস্ততা দেখিয়ে উঠে যাও।' "প্রেমিক"-এর স্বয়ংসম্পূর্ণ এক পংক্তি 'চেপেচুপে না ধরলে দেয় না কিছুই।'

দেবী রায়ের এই বইটিতেও এমন অনেক কবিতা রয়েছে যেগুলো বাজারি জনপ্রিয়সাহিত্য বা সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিণাম। তথাকথিত প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতির প্রতি তাঁর অনীহা স্পষ্ট। "তকমা" নামের কবিতাটিতে তিনি স্বীকৃতির তকমা-গ্রহণকারীদের উল্লুক বলেছেন। যদিও সাহিত্যক্ষেত্রে আজ স্বীকৃতিলাভের সহজ বা চোরা পথে হাঁটার প্রবণতারই প্রাবল্য, কিন্তু প্রতিষ্ঠাই কি ফাঁকি দিয়ে ফাঁকতালে লোক ঠকিয়ে পাওয়া, কেবল বিজ্ঞাপন-নির্ভর, ভিত্তিহীন কাগুজে পৃষ্ঠ-পোষকতার কাচের স্বর্গ? কিছু কবি জনপ্রিয়তা, প্রচারমাধ্যমের পৃষ্ঠ-পোষকতা ভোগ করেন, আর অনেক ক্ষমতাবান কবির কপালেই তা জোটে না—এই বৈষম্য শিল্পের জগতে এক প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার। এইসব জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠিত কবিদের তুলনায় দেবী রায়ের কবিত্বশক্তি কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু তিনি যদি সেই শক্তিকে কবিতা লেখার কাজে না লাগিয়ে জনপ্রিয়তা তথা স্বীকৃতিপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে খোঁচা দেবার কাজেই লাগাতে থাকেন, এই ক্ষোভ-ঘৃণার প্রকাশমাধ্যমস্বরূপ তিনি যদি কবিতাকে বেছে নেন, তবে তিনি এইরকম আক্রমণে 'প্রতিষ্ঠিত'দের ভিত কতটা নড়াতে পারবেন বা পেরেছেন জানি না, কিন্তু নিজের কবিতার সমূহ ক্ষতি করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো পরপর পড়ে যাবার পর একটি কবিতাই আমাকে এমন মুগ্ধ করল যাতে আমি বারবার পড়তে প্ররোচিত হলাম। এগারো লাইনের এই কবিতাটির নাম "বৃত্তের বাইরে ভেতরে"। কবিতাটির মধ্যে কবির বোধের একটা সংহত রূপ ধরা পড়েছে। তা ছাড়া অধিকাংশ কবিতা সরল বর্ণনাধর্মী। কবিতাগুলো গদ্যে লেখা, কিন্তু গদ্যের মধ্যে যে আশ্চর্য গোপন ছন্দের সঞ্চার করে বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন বা শঙ্খ ঘোষ পাঠকমনে বিস্ময়-শিহরণ জাগাতে পারেন এখানে তার অভাব। শব্দও তেমন তীব্র ভূমিকা নিতে পারেনি যাতে গদ্যের শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

নির্মল বসাকের এক নিজস্ব আকৃতি আছে। তিনি যতিচিহ্ন প্রয়োগ করেন না, তার বদলে স্পেস ব্যবহার করে পংক্তিগুলিকে সাজিয়ে তোলেন। প্রায় পঞ্চাশটি কবিতা নিয়ে তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ "রোদের প্রার্থনা"র কবিতা-গুলিও অনুরূপ। অন্ত্যমিলহীন সোজা-সরলভাষার গদ্যকবিতায় তিনি ছন্দের সংশ্রব আনতে পারেন। "গলিটা" "পারাপার" "দ্বিতীয় তরঙ্গ এসো" "দেখা হবে"-র মতো ভালো কবিতার সঙ্গে মিশে গেছে "বেল্ট", "বুট", "টুপি", "শ্যাম্পু"-জাতীয় অকবিতা। "কী আমার পরিচয়" আর "নিষেধ" নামের দুটি দীর্ঘ কবিতা পড়তে ভালো লাগে কবির আত্মবিশ্লেষণের জন্য।

বাঙলা ভাষায় অনেকদিন বিখ্যাত শক্তিমান বিদেশী কবিদের কবিতার অনুবাদ করে গ্রন্থ প্রকাশের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। বুদ্ধদেব বসু বোদলেয়ার ও রিল্‌কে, বিষ্ণু দে এলিয়ট, প্রেমেন্দ্র মিত্র হুইটম্যান, সুধীন্দ্রনাথ মালার্মে ভের্লেন, অরুণ মিত্র এলুয়ার, আরাগঁর কবিতা বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করে গত তিন দশকের মধ্যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নেরুদা আর হিকমতের অনুবাদ বিখ্যাত। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের

কবিদের মধ্যেও এই প্রবণতা বর্তমান। যার ফলে বাঙলা কবিতা নানা বিদেশী কবিতার সংস্পর্শে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। সম্প্রতি ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের চেয়ে সোভিয়েত রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কবিদের কাব্যকর্মে বাঙালি কবিদের মনোযোগ বেড়েছে। বোদলেয়র, রিলকে, এলিয়ট, এলুয়ারের নাম পেরিয়ে বাঙলা অনুবাদ-কবিতার জগৎ আজ বহুদূর বিস্তৃত। সেখানে আজ চেসোয়াভ মিউশ, ইয়েসি হারাসিমোভিচ, খলিল জিব্রান, ভাসকো পোপা, জারোসলাভ সেই-কার্টেরও পদচারণা। ১৯৮৭-র মারচে প্রথিতযশা কবি আনন্দ ঘোষ হাজরা চেক কবি মিরোসলাভ হোলুব-এর কবিতার অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করে এই ধারাটিকে পুষ্ট করলেন। তিনি বুদ্ধদেব বসুর অনুসরণে তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন বোঝা যায়। অর্থাৎ তিনি শুধু এক বিদেশী কবির কবিতা অনুবাদ করেই দায় সারতে চান নি, সেই কবির সম্বন্ধে আরো তথ্য সংগ্রহ এবং পরিবেশন করে বাঙালি পাঠকের কাছে কবিকে পরিচিত করিয়ে দিতেও চেয়েছেন। এটি খুব প্রয়োজনীয় দায়িত্ব। একজন বিদেশী কবিকে আত্মস্থ করতে হলে তাঁর কবিতাপাঠই শেষ নয়, সেই কবির ব্যক্তিত্ব, জীবনদর্শন, জাতীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল অনুধাবন করা জরুরি। বুদ্ধদেব বসু "বোদলেয়ার ও তাঁর কবিতা" প্রকাশ করে বাঙলা অনুবাদকবিতা গ্রন্থ প্রকাশের একটি আদর্শ তৈরি করে দিয়ে গেছেন—এরকম বইয়ে কবিতার অনুবাদ ছাড়া আর কী কী থাকা আবশ্যক আমরা জানতে পেরেছি। আনন্দবাবু সেই মানদণ্ড সামনে রেখেই তাঁর বইটি নির্মাণ করেছেন। প্রারম্ভিক, আধুনিক চেক সাহিত্যের রূপরেখা এবং ভূমিকা—এই তিনটি অনতিদীর্ঘ নিবন্ধ এবং পরিশিষ্টের 'সহায়ক মন্তব্য' অংশটি এই গ্রন্থের পক্ষে অপরিহার্য। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত কয়েকটি অনুবাদ—কবিতার বইয়ে এই যত্ন এবং পরিকল্পনা দেখা যায়নি, তাই এখানে দেখে ভালো লাগল। মিরোসলাভ হোলুবের কবিতা কেমন, কী তার বিশেষত্ব এবং কবিতার ছন্দ, ভাষা ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ভূমিকায় অনুবাদক যে প্রাজ্ঞ ও বিশ্লেষণী আলোচনা করেছেন—তারপর আলাদা করে সমালোচকের আর কিছু বলার থাকে না। পেশায় বৈজ্ঞানিক আর নেশায় কবি হোলুবের কবিকৃতি আমাদের অস্তিত্বের পক্ষে জরুরি, কারণ 'আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অর্থহীনতাকে, রাজনৈতিক ভঙ্গিগুলিকে বা আমলাতন্ত্রের অচলতাকে' হোলুব বিদ্রূপের খোঁচায় জর্জরিত করেন। তিনি বলতে পারেন, 'কবিতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি হল এই যে পৃথিবীতে সব কিছুর মধ্যেই কবিতা রয়েছে।'—তাঁর প্রতি যে কোনো ভাষার কাব্যপ্রেমীরই সমীহ জাগা স্বাভাবিক।

অনুবাদক কবিতাগুলো ইংরেজি থেকে অনুবাদ করলেও মূলের ঘনিষ্ঠ হবার তাগিদে ড. হানা প্রেইন্-হেলত্রোভা নাম্নী এক বাঙলা জানা বিদুষী চেক মহিলার সাহায্য নিয়েছেন। এ ছাড়া, আনন্দের কথা, তিনি অনুবাদকর্মে স্বয়ং কবির সাগ্রহ সহায়তা পেয়েছেন। বাঙলা কবিতার পরিমণ্ডলে এই নোতুন ধরনের কবিতাগুলো পড়তে হয়। পড়তে আকৃষ্ট হতেই হয়। অনুবাদের সংখ্যাল্পতার জন্য আফশোস হয়। আমরা আশা করছি, বইটি নিশ্চয় পাঠকসমাজে আদৃত হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে অনুবাদক আরো বেশি কবিতা সংযোজন করবেন।

মেঘ মুখোপাধ্যায়

আমাদের নাটকের মুখ ও মুখোশ

উন্মোচন

বিচ্ছিন্নতাবাদ যখন আমাদের এই দেশটার নানান প্রান্তে তার শেকড় ক্রমশই বিস্তৃত করে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, মৌলবাদ ও জাতীয়তাবোধের অভাব থেকে আহরণ করে চলেছে তার পুষ্টি ; এবং রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ যখন দিশেহারা, স্থবির ; তখন এই আত্মবিধ্বংসী প্রবণতার সঙ্গে লড়তে হবে শুভবোধসম্পন্ন সাধারণ মানুষকেই। এইখানে শিল্পের একটা ভূমিকা আছে। শিল্পের জীবনমুখীনতার অগ্নিপরীক্ষার ক্ষণ উপস্থিত হয় বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে। শিল্পী সময়ের ইঙ্গিত-ভাষা বোঝেন। অতীতের প্রেক্ষাপটে, ভবিষ্যতের আলোকে বর্তমানকে দেখতে পারেন তিনি। তাই শিল্পের দায় এক অর্থে হয়তো রাজনীতির দায়ের থেকে বড়ো। শ্রী রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত তথা "নান্দীকার" গোষ্ঠী থিয়েটারের কাঁধে সেই দায় তুলে নেবার আহ্বান জানিয়ে গত চার বছর ধরে প্রায় একক প্রচেষ্টায় "জাতীয় নাট্যমেলা"র আয়োজন করে চলেছেন। তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁদের অভিপ্রায়ের যথার্থ মূল্যায়ন এখনও হয় নি। 'নান্দীকার' পথিকৃতের কাজ করেছেন। কিন্তু এখনও তাঁরা একা। একই উদ্দেশ্যে এই কাজ সারা দেশ জুড়ে আরও ব্যাপকভাবে শুরু হওয়া উচিত ছিল। তবে সুখের কথা, শোনা গেল অদূর ভবিষ্যতে কর্ণাটকে এমনই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হতে পারে।

উনত্রিশে নভেমবর থেকে ছয়ই ডিসেমবর পর্যন্ত (রবীন্দ্রসদন আর আকাদেমী মঞ্চে) আটদিন ধরে চলেছিল "নান্দীকার"-আয়োজিত "চতুর্থ জাতীয় নাট্যমেলা"। দুটি বাঙলা (এপার এবং ওপার মিলিয়ে), দুটি মারাঠি, দুটি কানাড়ি, একটি হিন্দি—এই সাতটি নাটক এবং কয়েকটি খণ্ডের সমাহার সমন্বিত একটি নৃত্যানুষ্ঠান নিয়ে এবারের নাট্যমেলা। এবারের আটদিনব্যাপী নাট্যমেলায় অন্যান্য প্রদেশের যে প্রযোজনাগুলি এসেছিল সেগুলির অধিকাংশই সাম্প্রতিক। সেক্ষেত্রে উচ্চমানের শিল্পগুণ এবং প্রাসঙ্গিকতার বিচারে বাঙলা মঞ্চের যে একটি-দুটি সাম্প্রতিক প্রযোজনার নাম করা যেতে পারে—"রানী-কাহিনী", "নাথবতী অনাথবৎ" বা "নীলাম নীলাম" এবং এমনই আরও কয়েকটি—সেগুলি না বেছে "টিনের তলোয়ার"-এর মতো একটি পুরনো প্রযোজনা (প্রথম মঞ্চায়ন : ১৯৭১) যে কোন্ যুক্তিতে নির্বাচন করা হল বোঝা শক্ত। নির্বাচনের মানদণ্ড অন্যরকম হলে নাট্যমেলা উপলক্ষে অতিথি নাট্যশিল্পী এবং কর্মী যাঁরা এসেছিলেন তাদেরও পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেত আমাদের ইদানীংকার উৎকৃষ্ট নাট্যকর্মগুলির সঙ্গে।

উনত্রিশে ডিসেমবর সন্ধ্যায় উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে ছিল গুণিজনসংবর্ধনা। যে চারজন নাট্যশিল্পীকে সম্মানিত করেন "নান্দীকার" তাঁরা হলেন শ্রী খালেদ চৌধুরী, শ্রী উৎপল দত্ত, শ্রীমতী বিজয়া মেহতা এবং শ্রী চন্দ্রশেখর কাম্বার। এই সংবর্ধনার উত্তরে শ্রী খালেদ চৌধুরীর আশা প্রকাশ করেন যে "দৃশ্যচিত্র" (মঞ্চসজ্জা)-শিল্প ভবিষ্যতে আরও কদর পাবে এবং তাঁকে প্রদত্ত এই সম্মান নাট্যের সেই অবহেলিত বিভাগের শিল্পীদের উৎসাহিত করবে। শ্রী উৎপল দত্ত "অনুজপ্রতিমের" হাত থেকে "পারিতোষিক বা সাম্মানিক" নেবার আনন্দানুভূতি প্রকাশ করে পরবর্তী বক্তা শ্রীমতী বিজয়া মেহতার মতোই জানান যে এই সংবর্ধনায় অবসর নেবার সময় উপস্থিত—এমন না মনে করে আরও বহুদিন তিনি কাজের মধ্যেই থাকতে চান।

নাটক

দুই বাংলার দুটি প্রযোজনা

কেরামতমঙ্গল : ঢাকা থিয়েটার (বাংলাদেশ)। রচনা : সেলিম আল-দীন। নির্দেশনা : নাসিরউদ্দীন ইউসুফ। ২৯শে নভেমবর, সন্ধ্যা, রবীন্দ্রসদন।

'১৯৪৬ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী জনপদের মূল্যবোধের অবক্ষয়কাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের ব্যবচ্ছেদ হয়েছে "কেরামতমঙ্গল"-এ। পাঠকজন কেরামতের চোখ দেখে—ক্লিষ্ট ক্রূর জীবন দোজখ একের পর এক।…এগারো গণ্ডী, এগারোটি দোজখ অতিক্রম করেছে সে।…অন্ধ এবং পরিণত কেরামত শেষ গণ্ডীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।…সমগ্র জীবনে সে একটি প্রাণের নিশ্চয়তাবিধানে সমর্থ হয়।…কেরামতের অনিবার্য পরিণতির মধ্যেও জীবনের ইতিবাচক দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এখানে।…'

এগারোটি খণ্ডে বিভক্ত এই নাটকে—এগারোটি আখ্যান—এগারোটি নরক। কোরান-বর্ণিত সাতটি নয়,

মনুষ্যসৃষ্ট এগারোটি দোজখ। কেন্দ্রীয় চরিত্র কেরামত—প্রায় পিকারেস্‌ক্‌ (picaresque) উপন্যাসের নায়কের মতো—নাটকটিকে গ্রথিত করে রাখে এক শিথিল বন্ধনে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৭১ এবং তার অব্যবহিত সময়—এই সুদীর্ঘকালব্যাপী একটি জাতির জীবন-ইতিহাসকে ধরার চেষ্টায় নাট্যকারকে নির্ভর করতে হয়েছে মহাকাব্য বা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের সংস্থানের ওপর। আনুরেখ প্রাগ্রসর নয়, কাহিনীর এই বিন্যাস বরং এক পরিকল্পিত চক্রাকার পৌনঃপুনিকতায় আবদ্ধ। সংস্থাপনা অতিক্রম করে এই আবর্তন আরও কিছু গভীর। তাই দেখা যায় ছেচল্লিশের দাঙ্গায় স্বগ্রাম-স্বগৃহ থেকে উন্মূল কেরামত আর অঘোর দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নাটকের প্রায় অন্তিমক্ষণে কয়েক মুহূর্তের জন্য যখন মিলিত হয় তখন অঘোর অন্য আর-এক দাঙ্গায় আবার গৃহহীন, সর্বস্বান্ত। ভ্রূণবিনাশ—ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও আশার হত্যা—প্রতিটি খণ্ডেই অব্যাহত। এই যন্ত্রণা আর পাপের মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র আদমসুরতের ধ্রুবত্ব আশ্রয় করে এগিয়ে চলে কেরামত—চলার পথে হারায় স্বজন, বন্ধু, স্ত্রী—এবং অবশেষে শমলার গর্ভের ভ্রূণটিকে—ভবিষ্যতের শেষ ও একমাত্র প্রতিশ্রুতিকে—বাঁচাতে গিয়ে পরিণামে অন্ধত্ব লাভ করে সে। নাট্য-আঙ্গিক এবং নাটক রচনায় জাতীয় চারিত্র্য বজায় রাখতে দায়বদ্ধ নাট্যকার যদিও চেয়েছেন "দেশজ" হতে—বর্জন করেছেন পশ্চিমী বাস্তবধর্মী নাটক রচনায় অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ বা আদি-মধ্য-অন্ত্য দিয়ে গাঁথা পাশ্চাত্য নাটকের ত্রিকোণাত্মক সংস্থান। অথচ পশ্চিমী নাট্যক্রিয়ার ভিত্তি যে সংঘাত, আখ্যান-অন্তর্বর্তী নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়োজনে তা কিন্তু পরিহার করতে পারেন নি তিনি। অন্যদিকে, মহাকাব্য বা মঙ্গলকাব্যে যে কাহিনী-কথনের বৈশিষ্ট্য তা এ নাটকে অনুপস্থিত। শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে দুটি জায়গায় এই ধরনের কথনরীতি ব্যবহার করা ছাড়া নাট্য-আঙ্গিকে তাকে স্থান দেন নি তিনি। অথচ সূত্রধর বা গায়কদলের সাহায্যে এই জাতীয় কাহিনীকথন আধুনিক নাটকের ইতিহাসে বিরল নয়।

"কেরামতমঙ্গল" হতে পারত একটি মর্মস্পর্শী জীবন-অভিজ্ঞতার নাটক, যা নাকি রাজনৈতিক-সামাজিক-ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক সীমারেখার সুনির্দিষ্টতা সত্ত্বেও অনায়াসে পারত অপরিনির্দিষ্টতার বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হয়ে চিরকালীন হতে। কিন্তু নাটকটির এই সম্ভাবনাকে কোনো মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে বিন্দুমাত্র সহায়তা করেন নি নির্দেশক নাসিরউদ্দীন ইউসুফ। "কেরামতমঙ্গল" এর প্রধান দুর্বলতা এই যে, কী নাটকে কী নাট্যে, উভয়ত আধেয় এখানে আধারের পদাবনত। যে ভাবহীন, অনায়াস চলন অত্যন্ত জরুরি ছিল এই প্রযোজনায়—যা সম্ভব হতে পারত অনাড়ম্বর মঞ্চপরিকল্পনায় আর আলোর সংযত ব্যবহারে—অকারণে তার সর্বাঙ্গে অপ্রয়োজনীয় বোঝা চাপিয়ে তাকে করে তোলা হয়েছে শ্লথ, স্খলিত। মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে এক উইং থেকে আরেক উইং পর্যন্ত বিস্তৃত অর্ধবৃত্তাকার রস্ট্রম বা তার সামনে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত-চাকা-লাগানো-নীচু বৃত্তাকার বেদী—যা ইচ্ছেমতো বিচ্ছিন্ন বা স্থানান্তরিত করা যায়। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, এক গণ্ডী পেরিয়ে অন্য গণ্ডীতে প্রবেশের সময় এই বৃত্তাকার বেদীটির খণ্ডগুলিকে ঠেলে-ঠেলে এগিয়ে বা পেছিয়ে নতুনভাবে সাজিয়ে দেন কালো-পোশাক-পরা কিছু নেপথ্যকর্মী। গাছের গুঁড়ি, বাঁশের সাঁকো বা দরজার ফ্রেম বিভিন্ন স্থান নির্দেশে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই ধরনের জটিল মঞ্চ-বিন্যাস নাটকটির দেশজ কাঠামোর সঙ্গে একেবারেই বেমানান। এরই সঙ্গে-সঙ্গে যথার্থ সম্পাদনার পরিবর্তে নাটকটির মেদবহুল শরীরের লালন-পালন, পরিকল্পনাবিহীন আলোকপাত এবং নির্দেশনায় কেন্দ্রীয় চিন্তার অভাব প্রযোজনাটিতে যে শিথিলতা এনে দেয় তা হয়তো দূর করা যেত শক্তিশালী অভিনয়ের সাহায্যে। কিন্তু শুধুমাত্র হুমায়ুন ফরীদি (কেরামতের ভূমিকায় তৃতীয় অভিনেতা) এবং শিমূল ইউসুফ (দাই ও শমলা) ব্যতীত—ঐ অসংখ্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অন্য কারোর চরিত্র-রূপায়ণে তেমন উচ্চমানের অভিনয় দেখা গেল না। "কেরামত-মঙ্গল"-এ সংগীত ব্যবহারের ব্যাপক সুযোগ ছিল। অথচ গ্রামীণ সুরে বাঁধা দু-তিনটি গান—রামনির্বাসন বা দোজখের গান—ও পাহাড়ি উপজাতিদের কিছু সংগীত-যন্ত্রবাদন ছাড়া তেমন ভাবে সংগীতের ব্যবহার নেই এই নাটকে। তবে আখ্যান থেকে অন্য আখ্যানাংশে যাত্রা-কালে সুরে-বাঁধা "গণ্ডী—গণ্ডী"-র পুনরাবৃত্ত উচ্চারণ ভালো লাগে—নাটকের মূল থীমের সঙ্গে যা স্বাভাবিকভাবে মানিয়ে যায়।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে বিতরিত নাটকের পরিচয়-লিপিতে ঢাকা থিয়েটার "কেরামতমঙ্গল"-এর বিষয়বস্তুকে আধুনিক নাট্যসাহিত্যে অদ্বিতীয় বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সত্যিই কি "কেরামতমঙ্গল" নাটকের বিষয়বস্তুর কোনো তুলনা নেই আধুনিক বাঙলা নাট্যসাহিত্যে? অবশ্য "আধুনিক বাঙলা নাটক" বলতে যদি বাংলাদেশের নাটক বোঝানো হয়ে থাকে তবে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বাঙালি নাট্যপ্রেমীদের অধিকাংশেরই হাতের কাছে আছে অন্তত একটি নাটক, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কাহিনী অবলম্বন করে লেখা একটি অত্যাশ্চর্য আধুনিক ট্র্যাজেডি। একটি জাতির জীবন-ইতিহাস এই নাট্যকাহিনীর উপজীব্য। দেশজ কাহিনী, দেশজ নাট্য-আঙ্গিকের সঙ্গে আধুনিক জীবনবোধ ও আধুনিক নাট্যরীতির এমন পরম-মিলন আমার বিবেচনায় এই উপমহাদেশের নাট্যসাহিত্যে একটি আশ্চর্য নজির। উল্লিখিত নাটকটি অবশ্যই শ্রী শম্ভু মিত্র-রচিত "চাঁদ বণিকের পালা", বাঙলা মঞ্চে এখনো যে নাটক প্রযোজনার সম্মান পায় নি।

টিনের তলোয়ার: পিপল্‌স্‌ লিট্‌ল্‌ থিয়েটার (পশ্চিম বঙ্গ)। রচনা ও নির্দেশনা : উৎপল দত্ত। ৩০শে নভেম্বর, রবীন্দ্রসদন।

"মানুষের অধিকার"-এর (১৯৬৮) পর নাট্যকার-প্রযোজক উৎপল দত্তের সৃষ্টিশীলতা যদি আরেকবার কোনো তুঙ্গবিন্দুতে পৌছে থাকে তবে তা "টিনের তলোয়ার" (১৯৭১) নাটকে। ("মানুষের অধিকার"-এর পূর্ববর্তী কালে, এই দুই শীর্ষবিন্দুর মধ্যবর্তী সময়ে এবং "টিনের তলোয়ার"-এর অব্যবহিত পরে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ কিংবা পিপল্‌স্‌ লিটল থিয়েটার আরও বেশ কয়েকটি প্রযোজনা আমাদের উপহার দিয়েছেন, কিন্তু উৎপল দত্তকে তাঁর সর্বোত্তম ক্ষমতায় তেমন করে আর পাওয়া যায় নি।)

"টিনের তলোয়ার" বাঙলার নাট্যকর্মের আদিপর্বের ইতিহাসআলেখ্য। সেটা কুখ্যাত নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের কাল। ইতিহাসকে যেমন করে দেখতে চেয়েছেন নাট্যকার তারই চিত্র এই নাটক। এই দলিল-চারিত্র্য, কাহিনী-বুননের মুন্সীয়ানায় হয়ে ওঠে উপভোগের প্রধান উপজীব্য। "পিগম্যালিয়ন"-এর ছায়া চেতনায় ধূসর হয়ে যায়, ইচ্ছা-পূরণের ফরমূলাও ক্ষমা পেয়ে যায় নাটকীয়তার জাদুমন্ত্রে।

"টিনের তলোয়ার" পি. এল. টি-র নতুন প্রযোজনা নয়। গত পনেরো-ষোলো বছরে বহুবার অভিনীত হয়েছে এই নাটক, এখনো মাঝে-মধ্যেই হয়ে থাকে। তবু যে "নান্দীকার" তাঁদের চতুর্থ জাতীয় নাট্যমেলার জন্য এই প্রযোজনাটিকেই বেছে নিয়েছিলেন তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে শ্রীউৎপল দত্ত এই নাট্যমেলায় অন্যতম সংবর্ধিত নাট্যশিল্পী। তাঁর কোনো প্রযোজনা প্রদর্শনের জন্য নির্বাচন করতে হলে এই নাটকটির নাম সর্বপ্রথম মনে পড়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু পূর্বে একাধিকবার দেখা এই নাটকের সেই সন্ধ্যার অভিনয় সর্বতোভাবে হতাশ করেছে, এ কথাটা সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হয়। অবহেলায়-লালিত সদন-মঞ্চের ঘূর্ণন-যন্ত্রটি অকেজো, পাদপ্রদীপের সামনে ট্র্যাপের ব্যবস্থা উধাও (দুটিই এই প্রযোজনার পক্ষে অত্যন্ত জরুরি), ফলে মধ্যমঞ্চে বারংবার পরদা এবং প্রথম সারির দর্শকের নাকের ডগায় তৈরি করা ট্র্যাপের ব্যবহারের আপস-রফায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল প্রযোজককে।

মহারাষ্ট্রের দুটি নাটক

ডাকঘর : আবিষ্কার (মহারাষ্ট্র)। রচনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুবাদ : অশোক সাহানে। নির্দেশনা : সুলভা দেশপাণ্ডে। ১লা ডিসেমবর, আকাদেমী মঞ্চ।

নেপথ্য থেকে ভেসে আসে "গীতাঞ্জলি"-র কবিতার মারাঠি অনুবাদের আবৃত্তি। নীলচে আলোয় ভরা সাইক্লোরামার সামনে রবীন্দ্রনাথ-সদৃশ কেউ বড়ো-বড়ো চুল-দাড়ি নিয়ে শ্যিলুয়েত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আবৃত্তি শেষ হলে ওই ছায়ামূর্তি সরে যায়। সাইক্লোরামার আলো মিলিয়ে গিয়ে সামনের মঞ্চে টুকরো আলোয় দেখা যায় ছোট্ট অমল বসে আছে। তার শরীরে-মুখে জানলার শিকের সারি-সারি ছায়া। বন্দী অমল। তারপরেই পুরো মঞ্চ আলোয় ভরে ওঠে। কেউ ডাকে অমল! অমলবাবু! অমল ধীরে-ধীরে মঞ্চ ছেড়ে চলে যায়। তারপর অভিনয় শুরু হয় সেখান থেকে, যেখানে মূল নাটকের শুরু।

মঞ্চের সামনের অংশটা অভিনেতার বাঁ দিক থেকে শুরু করে ডানদিকে পুরোটা গিয়ে ঘুরে দ্বিতীয় উইং পর্যন্ত একটা পথ। বাঁদিকে প্রথম উইং-এর কাছে একটা বড়ো গাছের গুঁড়ির কাট-আউট, তার তলায় বসার জায়গা আছে,—উইং-এর গায়ে লাগানো কাঠের নীচু দরজা। ডান দিকে প্রথম উইং-এর কাছে পথের ওপর তিনটে বড়ো পাথর-খণ্ড,—বসা যায় তার ওপর। এটা মঞ্চের প্রথম মণ্ডল। এই পথের পরে প্রথম উইং থেকে দ্বিতীয় উইং বরাবর অংশটুকু অমলের ঘর। সামনে মাঝ-মঞ্চে বাঁদিক ঘেঁসে পথের ওপরেই একটা জানলা—সেখানে একটা টুল রাখা আছে। ওটা যে জানলা সেটা বোঝা যায় কখনো-সখনো, যখন ওই আসনে-বসা অমলের ওপর জানলার

শিকের ছায়া পড়ে। ডানদিকে পথের ওপর আরেকটা জানলা। দর্শকের দিকে প্রোফাইলে দাঁড় করানো গরাদ-দেওয়া একটা জানলার ফ্রেম। এই জানলার কাছেও বসার ব্যবস্থা। মঞ্চের মাঝখানে অমলের শোয়ার খাট—বিছানায় রঙিন চাদর। খাটের গায়ে সামনের দিকে সংলগ্ন একটা নীচু টানা থাক-মতো। খাটের ঠিক পেছনেই এ উইং থেকে ও উইং পর্যন্ত প্রায় একটা আয়তাকার ফ্রেম ঘরের দেওয়াল বোঝাবার জন্য। এটা মঞ্চের দ্বিতীয় অংশ। ফ্রেমের গায়ে মঞ্চের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত পাতলা জালের পরদা। তারও পেছনে উইং থেকে উইং পর্যন্ত টানা রসট্রম। এটা তৃতীয় মণ্ডল—অমলের কল্পনার জগৎ। খুঁটিনাটি বাদ দিলে "আবিষ্কার"-প্রযোজিত "ডাকঘর" নাটকটির মঞ্চসজ্জা মোটের ওপর এইরকম।

ঘরের সামনে পথ দিয়ে যারা যায় তারা অমলের এই পৃথিবীর লোক, জানলা দিয়ে ডেকে যাদের সঙ্গে কথা বলে অমল। আর ঘরের পেছনে জালের পরদার পেছন দিয়ে আসে যায় অমলের স্বপ্নের জগতে মানুষ-জনেরা—পথিক যে পথ হাঁটতে-হাঁটতে ঝরনার জলে মুখ-হাত ধুয়ে পুঁটলি খুলে ছাতু খায়, লাল-শাড়ি-পরা সেইসব ভিন গাঁয়ের মেয়েরা যারা শ্যামলী নদীতে জল আনতে যায়, আর রাজার সেই ডাকহরকরা যে দূর-দূর দেশে চিঠি বিলি করে ফেরে। আর এইসব স্বপ্নিল মুহূর্তে সাইক্লোরামায় নানা রঙের, নানা ঢঙের আলোর খেলা চলতে থাকে। অমলের কল্পনার ছবি তার সব রঙ-রূপ নিয়ে জালের পরদার পেছনে সাইক্লোরামায় যতই স্পষ্ট হতে থাকে ততই ধরা পড়তে থাকে প্রযোজনার বিন্যাসচিন্তায় কল্পনা আর বোধের দারিদ্র্য। স্পটের সামনে মোটর-চালিত রঙিন জেলাটিনের ডিস্ক ঘোরে আর রঙ বদলে-বদলে যায় মঞ্চের ওপর। নাটকের শেষে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে অমল (নাকি তার আত্মা ?), তার স্বপ্নের জগতে রসট্রমের ওপর গিয়ে দাঁড়ায়। কারণ রাজকবিরাজ জানলা-দরজা উন্মুক্ত করার আদেশ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সরে গেছে সেই জালের পরদা—পার্থিব জগৎ আর অপার্থিব এক হয়ে মিশে গেছে। সাইক্লোরামায় ফুটে ওঠে নক্ষত্রমণ্ডলী। আর সেই উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জ নক্ষত্ররাশির মধ্যে দিয়ে অন্য এক যাত্রায় বিলীন হয়ে যায় "আবিষ্কার"-এর অমল। সেই সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়—মঞ্চপরিকল্পনার ওই জটিল পারিপাট্য আর আলোর জাদুকরী মোহজালের তলায় চাপা-পড়া রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" উদ্ধার পাবার শেষ আশাটুকু। দর্শকের চিত্তপটের ওপর যাঁর অসীম আস্থা ছিল সেই নাট্যকারের চিত্রকল্পগুলি দর্শকের চোখের ওপর মঞ্চপটে অমন ভাবে বাস্তবায়িত করে সুলভা দেশপাণ্ডে আমাদের বঞ্চিত করলেন নাটকটির অন্তর্লীন কাব্য থেকে। ভাষার দূরত্ব পেরিয়ে সে কাব্য কেমন ক'রে পৌছয় আমাদের কাছে, প্রযোজনাটি দেখার আগ্রহের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল তাই।

অরুণ কাকাড়ের 'মাধবদত্ত' একটি সু-অভিনীত চরিত্র। প্রণতি প্রধানের 'অমল' শুধুমাত্র একটি শিশু, স্বপ্নদর্শী সুদূর-পিয়াসী মানবাত্মার প্রতীকী ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত কোনো সত্তা নয়। 'সুধা'-রূপী মধুরা গোরেকে ভালো লাগে, ভালো লাগে নাটকের শেষে তার ফুল ছড়াতে ছড়াতে চলে যাওয়া।

ওয়াড়া চিরেওন্দি : কলাবৈভব (মহারাষ্ট্র)। নাটক : মহেশ এলকুন্‌চওয়ার। নির্দেশনা : বিজয়া মেহতা। ৩রা ডিসেম্বর, আকাদেমী মঞ্চ।

পরদা উঠে যাওয়া মাত্রই সিধে হয়ে উঠে বসতে হয় এই নাটকের শুরুতেই। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা যায় এই নাট্যকর্মটির পেছনে যিনি আছেন, থিয়েটারের কাজটা তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত। নাট্যশরীরের নির্মাণে আছে একটি সুবিন্যস্ত কৌশলী পরিকল্পনা। ভাঁজে-ভাঁজে একটু-একটু করে উন্মোচিত হতে থাকে নাটক। নাট্যকাহিনী আর সেই কাহিনী-কথন—দুয়ের টানে আবিষ্ট হয়ে থাকতে হয় সারাক্ষণ। এবারের নাট্যমেলায় এই প্রযোজনাটিই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

এই নাটক একই সঙ্গে পরিবর্তনশীল অথচ স্থিত সময়ের কথা। সামন্ততান্ত্রিকতার অবশিষ্টাংশটুকু আঁকড়ে ধরে গ্রামজীবন যখন কারিগরি শিল্পকেন্দ্রিক আধুনিক জীবনধরনকে প্রতিহত করার ব্যর্থ প্রয়াসে নিমগ্ন। দেশপাণ্ডে পরিবারের প্রধান তাতিয়াজি সদ্য মৃত, তবু তার দৃষ্টিহীন বধির মা কেবলই থেকে-থেকে তাঁর পুত্রের নাম ধরে ডেকে ওঠেন। চেখভ-এর "চেরি অর্চার্ড"-এর ফিয়ারসের মতোই প্রাচীনতার প্রতীকস্বরূপ যেন ঐ অতিবৃদ্ধা নারী, সময় যার কাছে তাঁরই মতো স্থবিরতাপ্রাপ্ত। তার নিরন্তর ডাকে দেশপাণ্ডে পরিবারের ইতিহাস যেন এই বিশাল জীর্ণ বাড়িটার দেওয়ালে-দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। যে বাড়িতে এখনো "শোকনস্থ" আর "দেশস্থ" ব্রাহ্মণের কৌলীন্য-বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কথায়-কলহে খোঁচা লাগে। তাতিয়াজির স্ত্রী, তাঁর ছেলেমেয়েদের আয়ী, প্রাণপণ চেষ্টা করেন এই সংসারটাকে ধরে রাখতে, যে সংসারে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর চারদিনের মধ্যেই, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাস্কর আর শহর প্রবাসী মধ্যম পুত্র সুধীরের মধ্যে শ্রাদ্ধের খরচা আর সম্পত্তির ভাগ নিয়ে শুরু হয়ে গেছে অশান্তি—যে কলহে তাঁর অবিবাহিতা কন্যাও শামিল হয়ে পড়ে। প্রত্যেকে দায়ী করে প্রত্যেককে। শুধু বাড়ির কড়িকাঠগুলোতেই নয়, এই পরিবারের মানুষগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কেও ঘুন ধরেছে। ছোটো ভাই চন্দু আর ভাস্করের মেয়ে রঞ্জুর অপরিণত বুদ্ধি যেন এই অবক্ষয়েরই আর-এক দিক। গোপন সঞ্চয় থেকে টাকা এনে দিয়ে, বাড়ির নিজের অংশটুকু এক কাঠের ব্যবসায়ীকে চেরাই-কল বানাবার জন্য বিক্রি করে শ্রাদ্ধের খরচ যোগাড় করেন আয়ী। ক্রমশ এই চেরাইকল, বাড়ির বাইরে পড়ে থাকা অব্যবহৃত ট্রাকটর, দশ বছর আগে শহরে চলে যাওয়া সুধীর আর তার স্ত্রী অঞ্জলির জীবনযাপনের ধরন—এইসবের আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রাচীন বাড়িটার জীবনযাত্রার জীর্ণতা। আর তখন এই বিশাল ভগ্নপ্রায় বাড়িটা—যার ছাদ থেকে মাঝে-মাঝেই পলেস্তারা খসে পড়ে, উঠোনে পড়ে থাকা অকেজো ট্র্যাকটর—যেটা একটা শরীরী উপদ্রবের মতো একবার ছিঁড়ে দেয় অঞ্জলির শাড়ি আর একবার কাটে চন্দুর পা, সুধীরের বম্বের বাড়ির রঙিন টি. ভি. বা নির্মীয়মাণ চেরাইকল—সবকিছুর ব্যঞ্জনাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার মনে পড়ে যায় চেখভের "চেরি অর্চার্ড"-এর মতোই এই নাটকের শুরু এক আগমনে এবং শেষ এক বিদায়ে। চেখভের নাটকের চরিত্রদের মতো পলায়নকামী চরিত্রদের উপস্থিতি এই নাটকেও। ভাস্করের ছেলে পরাগ, মেয়ে রঞ্জু, তার বোন প্রভা—সবাই পালাতে চায় কিন্তু পারে না। রঞ্জুর স্বপ্নের জগৎ হিন্দি ফিল্ম আর তারকারাও যেন এই পরিবারের থেমে থাকা প্রাচীনতায় সময়ের পরিবর্তনের অনুপ্রবেশ। এ নাটকে শুধু নেই লোপাখিনের মতো নতুন যুগের প্রতিনিধি কোনও জীবন্ত চরিত্র বা রানেভস্কায়ার মতো অতীত-আঁকড়ে-থাকা নিষ্ক্রিয় কোনো অভিজাত নারী। আয়ী যদিও প্রাচীন আভিজাত্যের প্রতিনিধি, কিন্তু বাস্তবকে তিনি দেখেন স্বচ্ছ চোখে, তাকে গ্রহণ করার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তাও তাঁর আছে। রানেভস্কায়ার মতো পলায়নপর মনোবৃত্তির মানুষ নন তিনি। আয়ীরই উপস্থিতিতে সম্পত্তি ভাগাভাগির আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে একমাত্র ঐতিহ্যমণ্ডিত অলংকারগুলি ছাড়া এই বংশের আর কোনো সম্পদই অবশিষ্ট নেই। এই সংসারটাকে দশ বছর ধরে টিকিয়ে রাখার জন্য জমিজমা, মূল্যবান বাসনপত্র—সবই বেচতে হয়েছে বড়ো ছেলে ভাস্করকে। সবার দৃষ্টি পড়ে ঐ অলংকারগুলির ওপর, যেগুলো লুকিয়ে পানের বাটায় ভরে বালিশের নীচে নিয়ে শোয় ভাস্কর। বাড়ির বড়ো বৌ বাহিনী স্বামীর কথায় যখন সেই সমস্ত অলংকার পরে এসে দাঁড়ায় ভাস্করের সামনে তখন দেশপাণ্ডে বংশের ঐতিহ্যময় অতীত যেন সোচ্চার হয়ে ওঠে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভাঙা বাড়ির ছাদ থেকে খসে পড়ে একখণ্ড পলেস্তারা—দৈব নির্দেশের মতো। পরের দিনই সমস্ত গয়না নিয়ে গৃহশিক্ষকের সঙ্গে উধাও হয় রঞ্জু। এই হঠাৎ বিপর্যয়ে পুরো পরিবারটি যেন ফিরে পায় ক্ষণকালে আপাত-সংহতি। শুধু বিচক্ষণ আয়ী বোঝেন আর বেশি দিন সম্ভব নয় এই ঐতিহ্য, এই অতীতকে ধরে রাখা। চুরির চার দিন পরে সুধীরের পিছু-পিছু রঞ্জু ফিরে আসে। কিন্তু ফিরে আসে না দেশপাণ্ডে পরিবারের শেষ সম্বল গয়নাগুলি। ক্ষয়িত মর্যাদাটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পুলিশে খবর দিতে রাজি হয় না ভাস্কর। সুধীর আর তার স্ত্রী ফিরে যায় তাদের শহরের সংসারে। কিন্তু সুধীর প্রতিশ্রুত মুক্তি দিতে পারে না পরাগ বা রঞ্জুকে। এই নাটকের প্রতিটি চরিত্রেরই অতীত বর্তমান মিলিয়ে একটা গল্প আছে। শুধু নেই কোনো ভবিষ্যৎ। হয়তো সুধীর আর অঞ্জলি ছাড়া। চেখভের মতো এই নাটকের রচয়িতাও যেন প্রতিটি চরিত্রকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন, অথচ প্রত্যেকের জন্যই অনুভব করেন এক কৌতুকময় সহমর্মিতা।

মঞ্চসজ্জার এমন সুপরিকল্পনা বহুদিন বাদে দেখা গেল। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হল দুটি ভারি শক্তসমর্থ কড়ি-বরগা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ওপর থেকে সমান্তরালভাবে, তাদের দৈর্ঘ্য মঞ্চের প্রস্থের সমান। ওই দুটি কড়ি-বরগা এবং তিনটি দরজা দিয়ে বাইরের দালান আর ভেতরের দুটি ঘরের বিভাজন দেখানো হয়েছে। ঘরের দেওয়ালগুলি উহ্য রাখা হয়েছে। অভিনয়ের কৌশলে ওই বিভাজন সবসময়েই বিশ্বাস্য থেকেছে। মঞ্চের সামনের অংশটা বারান্দার নীচে অঙ্গনের মতো। সেখানে একটি ছোটো বসবার বেদী। দালানের অংশটি মঞ্চের (অভিনেতার) ডানদিকে। সেখানে প্রথম আর দ্বিতীয় উইং-এর গায়ে দাঁড়-করানো দুটি প্রাচীন থাম। ওই থাম এবং ছাদের কড়ি-বরগাই বাড়িটির

বিশালত্ব ও প্রাচীনতা—দুই বোঝাতে যথেষ্ট। দালানের পেছন দিকটায় মঞ্চের ডানদিকেই রেলিং আর-একটা অংশ, তার পেছনে সাদা পরদায় দিন-রাত্রির সময় বদলের আভাস মেলে আলোর রঙের হেরফেরে। ঘরের পেছন দিকের এবং বাঁদিকের শেষে দেয়াল আছে—পুরোনো, হলদেটে, পলেস্তারা-খসা। দালানের দিক থেকে প্রথম ঘরে পেছনের দেয়ালে দরজার পাশে দেওয়াল-আলমারিতে সংসারের টুকিটাকি। দরজার পাশে একটার মাথায় আরেকটা করে তিনটি বড়ো-বড়ো চাল-গম রাখার টিন—আয়ীর টাকায় বাজার আসলে ওখানেই সব তুলে রাখা হয়। দ্বিতীয় ঘরের বাঁদিকের দেওয়ালে জানলার গায়ে একটা খাট—ভাস্করের শোবার জায়গা। খাটের পাশে দেওয়ালে ঝোলানো আয়না—যেখানে রঙ্কু ঘুরে ফিরে মুখ দেখে যায়, সামনে দাঁড়িয়ে সেই বিশেষ রাত্রে বাহিনী একটি-একটি করে দেশপাণ্ডে পরিবারের গয়নাগুলি পরে। বাস্তবধর্মী এই মঞ্চসজ্জাকে সহায়তা করেছে আলোর দক্ষ ব্যবহার। মলিন হলদেটে আলো বাড়িটির জীর্ণতাকে যেন আরও স্পষ্ট করে তোলে। আর সেই সঙ্গে আছে আনাচেকানাচে জমা ঘন অন্ধকার। অন্ধকারসৃষ্টি যে আলোপ্রক্ষেপণের একটি জরুরি দিক, তা প্রযোজনা দেখলে বোঝা যায়।

অভিনয়ে প্রথমেই যার নাম করতে হয় তিনি বিজয়া মেহতা। তাঁর 'আয়ী' কথা বলে খুবই কম, কিন্তু তাঁর দীর্ঘ সময়ের নির্বাক উপস্থিতির এক অপূর্বলেও অভিনয় থেমে থাকে না। সংলাপ বলুন বা না বলুন, তিনি যে মঞ্চে আছেন সেকথা সর্বদা অনুভূত হয়। নির্দেশনা আর অভিনয়ে তাঁর সব্যসাচী ক্ষমতা আমাদের মুগ্ধ করে। অভিনয়ের গুণে বিশেষ কয়েকটি দৃশ্য স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে থাকে—স্বামীর গয়নার তালিকা পড়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে দর্শকের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বাহিনীর অলংকার পরা, সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে পারিবারিক সভা, গভীর রাতে শাশুড়ির সঙ্গে বসে আয়ীর তাতিয়াজির আত্মার কাছে প্রশান্ত প্রার্থনা। অভিনয়ই যে থিয়েটারের প্রাণ—ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে আমাদের মুগ্ধ করে—"ওয়াড়া চিরেগুন্দি" সেই কথাই আবার প্রমাণ করল।

কর্ণাটকের দুই প্রযোজনা

করিমায়ী : স্পন্দনা (কর্ণাটক)। মূল রচনা : ডঃ চন্দ্রশেখর বি. কাম্বার। নাট্যরূপ : বি. জয়শ্রী ও ভি. আর. প্রতিভা। নির্দেশনা : বি. জয়শ্রী। ৪ঠা ডিসেম্বর, আকাদেমী মঞ্চ।

এই নাটকের কাহিনীর পটভূমি নাগরিকতার কলুষস্পর্শ-মুক্ত এক শান্ত, স্থির গ্রাম। যেখানে জীবন পরিচালিত হয় গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী করিমায়ীকে ভয়-ভক্তি করে, গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিভাবকত্বে। এই সরল জীবনে ছন্দপতন ঘটে শিক্ষিত শহুরে গুড়শিকরের আবির্ভাবে গ্রামবাসীরা যাকে সরপঞ্চের পদে অভিষিক্ত করে। নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে প্রাচীন বিশ্বাস আর মূল্যবোধ প্রভাবিত হতে থাকে। সমাজে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য গুড়শিকর আশ্রয় নেয় নানাবিধ ছলা-কৌশলের। কারণ সে বুঝতে পারে নামে সরপঞ্চ হলেও সাধারণ মানুষরা তাকে যতটা না মানে তার থেকে বেশি শ্রদ্ধা-ভক্তি করে বৃদ্ধ গ্রামপ্রধানকে। অর্থের লোভ দেখিয়ে আর নেশায় আসক্তি সৃষ্টি করে গুড়শিকর কলুষিত করতে চেষ্টা করে গ্রাম্য মানুষের প্রকৃতি। এই কাজে তাকে সহায়তা করে তার শহুরে বন্ধু বাসবরাজা আর বাবরনিতা চিমাম্মা। শুভবোধসম্পন্ন প্রাচীনপন্থীরা গ্রামপ্রধানের নেতৃত্বে গুড়-শিকরের এই ক্রমবিস্তৃত প্রভাবকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন নানাভাবে। গ্রামপ্রধানের নামে মিথ্যা কলঙ্কলেপনের চেষ্টা করতে গিয়ে চিমাম্মা বিতাড়িত হয়। প্রতিশোধস্পৃহায় মত্ত চিমাম্মা দেবীর মন্দির অপবিত্র করেই ক্ষান্ত হয় না, মন্দিরের পূজারীকে বাসবরাজার সাহায্যে নেশাগ্রস্ত করে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে আগন্ন নির্বাচনে গ্রামপ্রধানকে তার ক্ষমতা থেকে অপসৃত করার জন্য গ্রামবাসীদের সে আদেশ দেবে দেবীর পূজার দিনে। নির্দিষ্ট দিনে অর্চনা-নৃত্যরত পূজারীর মুখ থেকে যখন আর কিছুতেই প্রত্যাশিত আদেশ বেরোয় না, তখন চিমাম্মা 'ভর' হওয়ার ভান করে। ভীত, সন্ত্রস্ত, অপরাধবোধে আন্মবিশ্বাসহীন পূজারী মন্দির ছেড়ে পালায়। সেই সুযোগে চিমাম্মা আর বাসবরাজা দেবীর স্বর্ণমুখোশ চুরি করে সরে পড়ে। এই চুরি শুধুই অর্থলোভে চুরি নয়, এর মধ্যে নিহিত গ্রামবাসীদের করি-মায়ীর শক্তিতে বিশ্বাস ভেঙে দেবার উদ্দেশ্য—প্রাচীন মূল্যবোধ ধ্বংস করার উদ্দেশ্য। গ্রামবাসীরা পূজারীকে ফিরিয়ে এনে চুরি আবিষ্কার করে। দেববশি অর্চনানৃত্যের তলোয়ার বুকে বিঁধিয়ে আত্মহত্যা করে। এই সবই দেবীর কোপের ফল—এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় গ্রামবাসীদের মনে।

মঞ্চের পেছনদিকে মাঝবরাবর কালো পরদার সামনে দেবী করিমায়ীর ভয়াল মূর্তির নীচে নীচু চতুস্তরায় সারাক্ষণ বসে থাকে নারীপুরুষদের মিলিত এক গানের দল। দেবী-

মাহাত্ম্যের গান গায় তারা—এদেরই মধ্য থেকে উঠে আসে দুই সূত্রধার। সূত্রধারেরা বিবৃত করে নাটকের কাহিনী, নাট্যক্রিয়া সম্বন্ধে মন্তব্য করে, অভিনীত অংশগুলির মধ্যে স্থাপন করে যোগসূত্র। গায়ক দলও এসব কাজে তাদের কথনো সাহায্য করে। এরাই কাহিনীকে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। মাঝ-মঞ্চের (অভি-নেতার) বাঁদিকে আরেকটি চাতাল সবুজ কাপড়ে মুড়ে রাখা, অন্যদিকে নীল-কাপড়ে-ঢাকা অপেক্ষাকৃত নীচু আরেকটি চাতাল—এখানে গুড়শিকর আর তার সঙ্গীদের আধিপত্য। বাঁদিকের চাতালে গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রাচীন প্রতিনিধিরা এসে বসে, কথা বলে, সভা করে, জমায়েত হয়। প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনীত হলেও, বাবরার প্রসেনিয়াম-ফ্রেমটিকে ভেঙে দিয়ে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে অভিনয় ও অভি-নেতাদের ছড়িয়ে দেন নির্দেশিকা। শুধু শহুরে উকিল গুড়শিকর বা বাসবরাজা ছাড়া অন্য অভিনেতাদের পোশাকে ব্যবহৃত হয় উজ্জ্বল রঙ, যদিও কখনোই তা চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে না।

এই প্রযোজনার অনেকখানিই গানে বাঁধা। তালে আর সুরে প্রাণময় হয়ে ওঠে গানগুলি, তৈরি করে এক বিশেষ পটভূমি। সুরসংযোজনায় মূলত স্থানীয় লোক-গীতির সুর ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হল। এ ছাড়া আছে নাচের কতগুলি অপূর্ব সিকোয়েন্স। করিমায়ীর পূজারী দেবরশির স্ত্রীবেশে তরোয়াল নিয়ে অর্চনানৃত্য ছাড়াও যে দৃশ্যে করিমায়ীর দেবরূপে ব্যঙ্গ করে চিমাম্মা, সেই দৃশ্যে বি. জয়শ্রীর অসাধারণ প্রাণবন্ত নাচ পুরো প্রযোজনাটিতে একটি আলাদা মাত্রা এনে দেয়।

'করিমায়ী' নাট্য-পরিকল্পনা অভিনয়ের যে ধরনের ওপর নির্ভরশীল তাতে কোনো চরিত্রের ক্রম-বিবর্তন বা রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে ওঠার কোনো অবকাশ নেই। সূত্রধারের কাহিনী-কথন, নাটকীয় পরিস্থিতিগুলিতে একরঙা অভিনয় এবং সংগীতে—এই তিনের ওপর ভর করে গড়ে উঠেছে এই নাটকের নাট্য-শরীর। সংগীতের ভূমিকাই যেন সর্বাধিক জরুরি। তবু এরই মধ্যে নাগেশের পরিমিত অভিনয়ে "পারাগোড়" এবং নৃত্য-গীত-অভিনয়ে পটীয়সী পরিচালিকা বি. জয়শ্রীর 'চিমাম্মা' আমাদের মুগ্ধ করে।

নাটক হিসাবে "করিমায়ী" নিষ্প্রভ। প্রধানত কাহিনীর দুর্বলতাই এই নিষ্প্রভতার জন্য দায়ী। প্রাচীন গ্রাম্য এবং আধুনিক নাগরিক পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধের কোনো

বিশ্বাস্য সংঘাত নেই এই নাটকে—যদিও সেই সংঘাতই যেন প্রত্যাশিত ছিল। গ্রামীণ মূল্যবোধের গুণকীর্তন ও নাগরিকতার নিন্দাবাদ—একপেশে সাদা-কালোর বিভাজনে বার্তাহীন সমাপ্তিতে পৌঁছে থেমে থাকে নাটক, কোথাও কোনো উত্তরণ ঘটে না। অন্তর্দ্বন্দ্বে কাহিনীর জটিলতা প্রকাশের পক্ষে যেন নিতান্তই অপর্যাপ্ত মনে হয় এই নাট্য-আঙ্গিক।

"লক্ষপতি রাজন কাথে" ও "করিমায়ী"-র অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মন্তব্য হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাহিত্য বা শিল্প জীবনকে তার সমগ্র জটিলতা সমেত বোঝবার চেষ্টা করে। এই প্রয়াস তার চিরকালের। শিল্পচর্চা একটি সামাজিক ক্রিয়া। বাক্তির সামাজিক ক্রিয়া। সমাজ বা জীবনের চেহারা পরিবর্তনশীল। জটিলতার ধরনও তাই। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হয় শিল্পকে। আজকের জীবনের এই বহুস্তর জটিলতা প্রকাশ করার জন্য আমাদের থিয়েটারকেও যোগ্য করে তুলতে হবে। উৎস সন্ধানে লোকনাট্যের চর্চা প্রয়োজনীয় কিন্তু তার বাইরের চেহারাটার দরজায় মুগ্ধ হয়ে পড়ে থাকলেই চলবে কিনা ভেবে দেখা দরকার। বরং ভেতরের অঙ্গিনায় ঢুকে একবার সবটা দেখেশুনে নিলে বুঝতে সুবিধে হতে পারে যে আধুনিক জীবনের জটিলতার স্তরগুলি প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের এতদিন ধরে ক্রমশ গড়ে ওঠা, অভ্যস্ত নাট্য আঙ্গিকের সীমাবদ্ধতাকে লোকনাট্যের কোন্ অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য দিয়ে ভরিয়ে তোলা যেতে পারে। নয়তো "ভারতীয়" থিয়েটার গড়ে তোলার হুজুগে আমাদের থিয়েটারের প্রাণ যেখানটায়—সেই অভিনয়ে একটা মস্ত বড়ো ফাঁকি পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

•

যোকুমার স্বামী : বেনাকা (কর্ণাটক)। রচনা : ডঃ চন্দ্রশেখর বি. কাম্বার। নির্দেশনা : বি. ভি. করন্থ। ৫ই ডিসেমবর, আকাদেমী মঞ্চ।

বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ চন্দ্রশেখর কাম্বার একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার, অভিনেতা, সংগীতপরিচালক এবং চলচ্চিত্রকার। আলোচ্য নাটকটি রচনা করা ছাড়াও, এই প্রযোজনায় তাঁর ভূমিকা সংগীত-পরিচালনা এবং অভিনয়ে।

যোকুমার স্বামী উর্বরতার দেবতা। কী জমি—কী নারী—ফলনের জন্য দুই-ই এই দেবতার কৃপার ওপর

নির্ভরশীল। ধনী জমিদার গৌড় অনুর্বর পুরুষ—তার স্ত্রী গৌড়থি সন্তানহীনা। অথচ জমি এবং নারী দুইয়ের জন্যই গৌড়ের লালসা অপরিসীম। মাইনেকরা গুণ্ডাদের সাহায্যে পরের জমি আর নারী দখল করা নিয়ে মেতে থাকে সে। নিঃসন্তান গৌড়থি সন্তানকামনায় যোকুমার স্বামীর বৎসরকালব্যাপী ব্রত পালন করে পরম নিষ্ঠায়। গৌড়ের বেতনভোগীদের হাতে মৃত পিতার অন্যায়ভাবে অধিকৃত জমি ফেরত চায় বিদ্রোহী যুবা বাসমাইয়া গৌড়ের কাছে। কথার পিঠে কথায় তর্ক বাধে। ঠিক হয় পূর্ণিমার রাতে তাদের দুজনের মধ্যে যে পারবে সেই জমিতে রাত কাটাতে জমি হবে তারই। গৌড় তার ভাড়াটে গুণ্ডাদের আদেশ দেয় ওই নির্দিষ্ট রাতেই বাসমাইয়াকে হত্যা করতে। সে নিজে যায় পতিতালয়ে রাত কাটাতে। সেই সঙ্গে জমি পাহারা দিতে বাড়ির বাইরে রাত কাটাচ্ছে, এই মিথ্যে খবর পাঠায় স্ত্রীর কাছে। বাসমাইয়া জমিতে পৌঁছে পরাস্ত করে ভাড়াটে গুণ্ডাদের। স্বামী তার জমিতে গেছে শুনে সেই রাত্রিতে ব্রতশেষে পুজার প্রসাদ স্বামীর সঙ্গে ভাগ করে খাবে বলে গৌড়থি যায় সেই জমিতে, যে জমি উর্বরতার প্রতীক বাসমাইয়া শর্তানুযায়ী অধিকার করেছে। অন্ধকারে বাসমাইয়াকে স্বামী বলে ভুল ক'রে সযত্নে খাওয়ায় গৌড়থি। পরে বাসমাইয়াকে চিনতে পেরে সে পালাবার চেষ্টা করে। সমর্থ বাসমাইয়া গৌরথিকে বোঝায় তার অনুর্বর স্বামীর ক্ষমতা নেই তাকে সন্তানবতী করার, তা ছাড়া দেবতার প্রসাদ সে ভাগ করে খাইয়েছে বাসমাইয়াকেই। ব্রতের নিয়মানুযায়ী প্রসাদভোগীর সঙ্গে সহবাস গৌড়থিকে করতেই হবে সন্তানলাভের জন্য। রাজি হয় গৌড়থি। উর্বর নারীতে গমন করে উর্বর পুরুষ। গৌরথির মনে অনুরাগ জন্মায় বাসমাইয়ার জন্য। এদিকে প্রতিবেশীর পরিহাসে গৌড় সব কথা জানতে পেরে নির্জনে বাসমাইয়াকে ঘিরে ফেলে মাইনেকরা খুনীদের সাহায্যে হত্যা করে। উর্বর বিদ্রোহী যৌবন ধ্বংস হয় অনুর্বর প্রতিষ্ঠানের ভাড়া-করা অস্ত্রের আঘাতে। নাটকের সমাপ্তি এখানেই। প্রতিরোধের যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয় অনুরক্ত-উর্বর গর্ভে, তার পরিণাম আমাদের অনুমান করে নিতে হয় নিজের-নিজের মতো করে।

লোকনাট্যের আঙ্গিকের দাবি অনুযায়ী এই নাটকের অভিনয় কখনোই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণধর্মী বা ক্রমপরিণতিমুখী নয়। চরিত্র-গঠনের ধাঁচেই অন্যরকম। কোনো বহুস্তরবিশিষ্ট আবেগ বা অনুভব প্রকাশের জন্য এখানে চরিত্র "হয়ে-ওঠা" নিষ্প্রয়োজন—তার সুযোগও নেই। যা প্রয়োজন তা হল সরল আবেগ কিংবা অনুভব প্রকাশের জন্য সঠিক স্বচ্ছন্দ "ভঙ্গি"। সেই প্রকাশ এখানে ঘটে মুখের অভিব্যক্তি, শারীরিক ভঙ্গি, চলন, কণ্ঠস্বর—সবেরই সহজ-সরল প্রায় একমাত্রিক ব্যবহারে। যে নাট্য-আঙ্গিক সূত্রধার-জাতীয় চরিত্রের কথন-মন্তব্য, সংগীত এবং নৃত্যের মাধ্যমে অভ্যন্ত-কাহিনীর উপস্থাপনায় তাকে অভিনয়ের ওপর তেমন করে নির্ভরশীল না হলেও চলে, যেমনটি প্রয়োজন হয় পশ্চিমী নাট্য-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে। কলকাতায় বসে বি. ভি. করন্থ পরিচালিত যে ক'টি প্রযোজনা দেখার সুযোগ আজ পর্যন্ত হয়েছে তার মধ্যে "বর্ণম বন"-এর পরে এইটিই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ভালো। জটিলতাহীন কাহিনী ও লোকনাট্যের সাধারণ কিছু-কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে তোলা এই প্রযোজনায় আধেয় এবং আধার সুষম সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত। "কৱিমায়ী"তে যা সম্ভব হয়ে ওঠে নি, "যোকুমার স্বামী"-তে বিষয় এবং আঙ্গিক সেই সামঞ্জস্য লাভ করেছে।

নান্দীকারের এই চতুর্থ জাতীয় নাট্যোৎসবে দু'ধরনের প্রযোজনা উপস্থাপিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য নাট্যভঙ্গির অনুসারী বাস্তববাদী থিয়েটার, এবং অন্যদিকে দেশজ-নাট্য-আঙ্গিক-নির্ভর আধুনিক নাটক। "ওয়াড়া চিরেওন্দি" যদি হয় প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহলে নিশ্চিতভাবে "যোকুমার স্বামী" দ্বিতীয় বর্গের শ্রেষ্ঠ নাটক।

রাজধানীর দুটি প্রযোজনা

'প্রার্থনা' এবং অন্যান্য ব্যালে : ভূমিকা ক্রিয়েটিভ ডান্স সেনটার (দিল্লী)। নির্দেশনা : নরেন্দ্র শর্মা। ২রা ডিসেম্বর, আকাদেমী মঞ্চ।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী নাট্যের আঙ্গিকে নাচের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। আধুনিক যুগে "টোটাল থিয়েটার" বা "পূর্ণ নাট্য"-এর ধারণাতেও নৃত্য (নাট্যশাস্ত্রে যা 'নৃত্ত') একটি অপরিহার্য উপাদান। দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রতিক ভারতীয় নাটকেও নৃত্য এবং গীত ধীরে-ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের নাট্যপ্রেমীরা নাচ সম্বন্ধে যে কতটা উদাসীন সেটা বোঝা গেল নাট্যমেলার চতুর্থ সন্ধ্যায়। দিল্লীর 'ভূমিকা' গোষ্ঠীর নৃত্যানুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে খুব কম মানুষই নাট্যকর্মী কিংবা নাট্যামোদী, দর্শকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নৃত্যশিল্পী বা নৃত্যানুরাগী।

নাট্যোৎসবের বহু-নাটকের মেলায় "ভূমিকা" গোষ্ঠীর নিবেদন নিঃসন্দেহে একটি আলাদা স্বাদ সংযোজন করেছিল। তাঁদের প্রযোজনা সবশুদ্ধ পাঁচটি পৃথক নৃত্যাংশে গ্রথিত। এর মধ্যে "হংসবলাকা" এবং "আলিঙ্গন" বিশুদ্ধ নৃত্য-আঙ্গিকে পরিবেশিত। বাকি তিনটি অংশ "মানুষ ও মুখোশ", "কনফারেন্স '৭৯" এবং "প্রার্থনা"-র মধ্যে নাচ এবং অভিনয়ের ভূমিকা প্রায় সমপর্যায়ের। শেষোক্ত অংশগুলির মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তার উপাদানও উপস্থিত। অনুমান করা যায়, নাট্যোৎসবে উপস্থাপনার কথা মনে রেখেই হয়তো এই নৃত্যাংশগুলি বাছা হয়েছিল।

নির্দেশক নরেন্দ্র শর্মা নৃত্যাচার্য উদয়শঙ্করের প্রাক্তন ছাত্র। উদয়শঙ্কর ঘরানার নাচের প্রভাব তাঁর নৃত্য-পরিকল্পনার মধ্যে স্পষ্ট। "হংসবলাকা" উদয়শঙ্করের স্মৃতির প্রতি নিবেদিত। এই নৃত্যাংশটির অনুপ্রেরণা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতাটির উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল ভাবের সঙ্গে এটির প্রকৃত কোনো যোগ নেই। যূথবদ্ধ কয়েকটি উড়ন্ত হাঁসের হ্রদের ধারে বিশ্রামের জন্য অবতরণ, স্নান ও জলকেলি এবং অবশেষে আকাশপথে পুনর্যাত্রা বিভিন্ন নাচের ভঙ্গিতে পরিবেশিত হল। ছ-জন সাদা পোশাকের নৃত্যশিল্পী মঞ্চ জুড়ে নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে বা দলবদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করলেন অপূর্ব সমস্ত দৃষ্টিনন্দন বিন্যাস। সংগীত এবং আলোর বিচিত্র এবং সফল ব্যবহার তাঁদের নৃত্যে প্রাণসঞ্চার করেছিল।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় নিবেদনটি একক নৃত্য। ভরত শর্মার পারদর্শিতায় তা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। নৃত্যাংশটির মূলে যে চিন্তা কাজ করছিল তা আজকের জগতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ঐশ্বর্য, শক্তি এবং হিংসা—এই তিন রিপুর বশে মানুষ কিভাবে একের পর এক মুখোশ ধারণ করে নিজের আত্মাকে বিকিয়ে দিতে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত নিজস্ব সত্তাটি হারিয়ে ফেলে, তাই মূর্ত হয়ে উঠল নৃত্যের তালে-তালে। কোনোরকম সংগীতের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র অঙ্গসঞ্চালনে ভরত শর্মা যেভাবে এই দার্শনিক চিন্তাকে প্রকাশ করলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

"আলিঙ্গন" তৃতীয় নৃত্য-রচনা। নারীপুরুষের চিরন্তন প্রেম—তাদের আত্মিক এবং দৈহিক সম্পর্ক—এই নৃত্যাংশটির ভিত্তি। দু-জোড়া নর্তক-নর্তকী মঞ্চে উপস্থিত করলেন, ভাস্কর্য-প্রতিম কিছু নৃত্যভঙ্গিমা। কিন্তু পুরুষনারীর বহুস্তর মিলনের যে বিভিন্ন রূপ দৃশ্যমান হয়ে উঠল মঞ্চে, তা যেন বড়ো বেশি অলঙ্কারযুক্ত এবং কিছুটা পুনরাবৃত্ত। তাই আলোর খেলা এবং শ্রুতিনন্দন সংগীতের কারুকার্য সত্ত্বেও অনুষ্ঠানের এই অংশটি ক্লান্তিকর।

'কনফারেন্স '৭৯'—এই সন্ধ্যার চতুর্থ পরিবেশনা। এই অংশটিতে একটি নাটকীয় কাহিনীসূত্র আছে। শিশুবর্ষে শিশুকল্যাণকে কেন্দ্র করে সরকারি আমলাতন্ত্রের খেয়োখেয়ি, স্বার্থান্বেষণ আর স্বজনপোষণকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এই নৃত্যনাট্যে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সামনে আমলাদের নির্লজ্জ ব্যবহার, সভার মধ্যাহ্নভোজনের বিরতিতে চেয়ারম্যানের চেয়ার-চ্যুত হওয়ার দুঃস্বপ্ন, আমলাদের নিষ্ফল তর্ক-বিতর্ক, সভাশেষে কাগজ-কুড়োনো কিশোরের ফেলে যাওয়া ফাইল-পোসটার ইত্যাদি সংগ্রহ ও তার ঝুলির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা অবহেলিত শিশুর অসহায় কান্না অনুষ্ঠানটিতে এনে দেয় এক বিশেষ মাত্রা। নৃত্যের ব্যবহার এখানে পুরোপুরি ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী নয়, যেমন নয় "মানুষ ও মুখোশ"-এও। পাশ্চাত্য নৃত্যভঙ্গি ভারতীয় নাচের ধরনের সঙ্গে মিলে এক স্বতন্ত্র আঙ্গিক তৈরি করেছে, সেজন্যই হয়তো এই নৃত্যানুষ্ঠানকে 'ব্যালে' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সংগীতপরিকল্পনায় (সুশীল দাশগুপ্ত) নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে মানুষের কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারে নতুনত্ব আছে। তবে এই নৃত্যরচনাটি পরিকল্পনার দিক থেকে যতটা মনোগ্রাহী, নৃত্যপরিবেশনার দিক থেকে ততটা নয়।

প্রতিটি অংশেই মঞ্চব্যবহার লক্ষণীয়। সামান্য কিছু রঙ্গবস্তুর সাহায্যে অনেক সময় বিশেষ কোনো নৃত্যভঙ্গিকে অর্থবহ করে তোলা হয়েছে। চারটি নৃত্যাংশের মধ্যবর্তী ছেদগুলি একটু বেশি দীর্ঘ হওয়ার ফলে দর্শকের বিরক্তি উৎপাদন করছিল। অথচ কিছু সংগীতের ব্যবহারে এক ধরনের প্রবহমানতা আনা যেত সহজেই।

বিরতির পর নিবেদিত হল রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' কবিতাটির নৃত্যরূপ। আশ্চর্য এই যে, কবিতাটির নির্যাসটুকুর ওপর নির্ভর না করে নির্দেশক প্রতিটি পংক্তিকে এক-একটি নৃত্যাংশে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন। এবং তাই পুরো নৃত্যরচনাটি আটটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। মঞ্চে সামনে (নর্তক-নর্তকীদের) বাঁদিকে কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদের পংক্তিগুলি একটি পোসটারের ফ্রেমে পর পর সাজানো ছিল। এক-একটি নৃত্যাংশের পর সেগুলি বদলে পরবর্তী পংক্তিটিকে দৃশ্যমান করে তোলা

হচ্ছিল। মঞ্চের ওপর কয়েকটি সাদা কাঠের ব্লক নানাভাবে সাজিয়ে নাচের পর্যায়গুলিতে বৈচিত্র্য আনা হচ্ছিল। দশ-জন নৃত্যশিল্পীর সমবেত বা বিচ্ছিন্ন নৃত্য ছাড়াও, নির্দেশক নরেন্দ্র শর্মা এই অনুষ্ঠানে কবির ভূমিকা গ্রহণ করলেন। ইতিপূর্বে আলোচিত "কনফারেনস '৭৯"-তেও তিনি চেয়ারম্যানের চরিত্রটিকে রূপায়িত করেছিলেন। রবীন্দ্র-নাথের কবিতাকে এতটা সরলীকৃত ভাবে নাচের মুদ্রা বা ভঙ্গিতে অনুবাদ করাটা খানিকটা অপরিণত চিন্তার প্রকাশ বলে মনে হয়েছে। 'প্রার্থনা' শব্দের অন্তর্লীন যে গভীরতা বা স্থিতি, তা এই নৃত্যপরিকল্পনাটির কোথাও প্রকাশ পায় নি। নৃত্যের ধরনও যথেষ্ট সুললিত বা সুসমঞ্জস নয়—খানিকটা দৈহিক কসরত বলে কখনো-কখনো ভ্রম জন্মেছে। যে নৃত্যশৈলী "কনফারেনস '৭৯"-এর মতো প্রহসনে খাপ খেয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব প্রকাশে তা ব্যর্থ হবে—এটা বোধহয় নির্দেশকের বোঝা উচিত ছিল।

*

মগরী কী হুর: এন. এস. ডি রেপার্টার (দিল্লি)। নাটক: পণ্ডিত রাধেশ্যাম কথাবাচক। নির্দেশনা: বি. এম. শাহ। ৬ই ডিসেম্বর, সন্ধ্যা, আকাদেমী মঞ্চ।

দিল্লীর জাতীয় নাট্য বিদ্যালয়ের এই গোষ্ঠীটি গত কয়েক বছরে যথেষ্ট যন্ত্রণার কারণ হওয়া সত্ত্বেও ("ওথেলো", "অন্ধ-যুগ" স্মর্তব্য), "জাতীয় নাট্যমেলা" বিষয়ক লেখার প্রতি-শ্রুতিতে আবদ্ধ হয়ে আরও একবার নিজেকে এঁদের হাতে সঁপে দিতে হয়েছিল। সংস্কৃতের পণ্ডিত রাধেশ্যাম কথাবাচক "বিশুদ্ধ" উর্দুতে লিখেছেন যে নাটক, সেই নাটক কেমন এই কৌতূহলের টান হয়তো ছিল তাদের, যাদের এই তথ্য জানা ছিল। বা, প্রযোজনাটি যে আবার পার্শি থিয়েটারের আদলে তৈরি তাও আগে থেকে জানা ছিল না। নাটকটির অভিনয় দেখতে-দেখতে অবশ্য বোঝা গেল পার্শি থিয়েটারের আড়ম্বরপূর্ণ বাস্তববাদী মঞ্চসজ্জা ব্যবহার না করলেও, নাট্য-ক্রিয়ার সর্পিল ও জটিল বিন্যাসে, প্রথাগত কয়েকটি চরিত্রের (কমক, কামাল-জামাল ইত্যাদি) এবং সেই সঙ্গে অভিনয়শৈলীতে, সংলাপের শায়েরি-নির্ভর গঠনে, স্বর-প্রক্ষেপণে পরিচালক বি. এম. শাহ ঐ থিয়েটার-ঐতিহ্যের বেশ কয়েকটি উপাদান ব্যবহার করেছেন এই প্রযোজনার পরিকল্পনায়।

কিন্তু পার্শি থিয়েটারের কাছে ভারতবর্ষের ব্যবসায়িক থিয়েটারের ঋণ স্বীকার করে নিয়েও এই নাটক দেখার পরে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়—থিয়েটারের জাদুঘর অলংকৃত-করার মতো একটি প্রযোজনা না হয় হল, কিন্তু তাতে আধুনিক নাট্যের কোন্ লাভটা হল? এ নাটকের দর্শক প্রেক্ষাগৃহ থেকে তিন ঘণ্টার চমৎকারিত্ব বা মনোরঞ্জন কিংবা শুধুই ক্লান্তি ছাড়া আর কী নিয়ে ঘরে ফিরল?

যবনিকা

'বাঙালির থিয়েটার বাঙালির গর্বের বিষয়'—এই মতটি এখনো বোধ হয় প্রত্নতত্ত্বের দখলে নয়। এই সেদিনও আমরা জাঁক করেছি বাঙালির থিয়েটার নিয়ে গড় গড় করে আউড়েছি—গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, বিনো-দিনী, দানীবাবু, শিশিরবাবু, প্রভাদেবী, অহীন চৌধুরি, সরযূবালা, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি নাম। অসুবিধে দেখা গিয়েছে ইদানীং। একটা ছোট গণ্ডির মধ্যে অনেকে মিলে দাপাদাপি করতে থাকলে যা হয় তাই হয়েছে। হয় পায়ের তলার ধুলোয় অধিকাংশের দৃষ্টি হয়েছে আচ্ছন্ন, নয়তো সেই ধুলো কাদায় পরিণত হয়ে কর্দমাক্ত করেছে অল্পবিস্তর প্রত্যেককেই।

অথচ, এক সময় ভাবা গিয়েছিল, ভালো নাটক ভালো করে করব, আর তা করতে-করতেই আমাদের বাঙলা থিয়েটার তার স্বরূপ খুঁজে পাবে। কিন্তু তা হয় নি। হয় নি যে—এই কথাটা যাঁরা বোঝেন তাঁরা যেমন জানেন, যাঁরা বোঝেন না তাঁরা যেন আরো বেশি জানেন। তাই চারদিকে আজ ঢক্কানিনাদ "গ্রুপ থিয়েটারের নাভি-শ্বাস উঠেছে" ব'লে। এই থিয়েটারের কাজটা যখন শুরু হয়েছিল গোড়ার দিকের সেই সময়টায় তার নাম ছিল অন্য। তারপরে ক্রমে বদলাতে বদলাতে কখন যেন এক সময়ে এর নাম হয়ে গেছে "গ্রুপ থিয়েটার"। 'নবনাট্য' 'সৎনাট্য', 'অন্য থিয়েটার'—সব লুপ্ত কিংবা সংলিপ্ত হয়ে গিয়ে "গ্রুপ থিয়েটার"। নামের এই ক্রম-বিবর্তন নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা হয় নি। আমা-দের বাঙলা থিয়েটারের স্বরূপসন্ধানের অবসান কি তবে আজকের গ্রুপ থিয়েটারের এই রূপের মধ্যেই? বস্তুত, বাঙলা থিয়েটার যে আর আমাদের তৃপ্ত বা মুগ্ধ কিংবা আন্দো-লিত করতে পারছে না—এই সত্যটাকে আজ কিছুতেই উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। কেন এমন হল? তবে কি ভালো নাটক ভালো করে করা হয় নি? নাকি ওই কথাটার আসল তাৎপর্য আমাদের অগোচর থেকে গিয়েছিল, পারি নি তার যথার্থ মূল্য দিতে? অথচ, ভালো নাটক সত্যিই হচ্ছিল এবং যথেষ্ট ভালো করেই করা গিয়েছিল। বিচ্ছিন্ন ভাবে হলেও তা আজও হচ্ছে। তবে কোন্ বেনোজলের টানে ডুবতে বসেছে সব? "কেন জাতীয় নাট্যমেলা?"

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

যিনি জাদুর স্বপ্নে স্থির

ভবিষ্যতে কী হতে পারে আধুনিক মানুষের সংজ্ঞা, কী হবে তার গোত্র, তা আমরা অনেক আগেই পেয়ে গেছি একালেরই এক কথাশিল্পীর কাছ থেকে। আধুনিক মানুষের পরিচয় ধরা থাকবে দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে। অথবা বলা যায় আধুনিক বলতে সেই মানুষ-কেই বোঝাবে যার দুটি মাত্র কাজ। একটি মৈথুনচর্চা আর অন্যটি সংবাদ-পত্রপাঠ। এই আধুনিক মানুষকে ঘিরেই আউটসাইডারের ভাবনা বা অনিবার্যতা যে বারেবারে এসেছে বিশ্ব-সাহিত্যে, তা আর বিস্তৃত করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু একবার মনে করে নিলেই চলে যায় যে, মূল হারিয়ে সমস্ত মূল্যবোধ হারিয়ে কেবল বর্তমান নিয়ে বেঁচে থাকাটা আজ আর কোনো বিশেষ ভূখণ্ডের সমস্যা নয়। বর্তমান মানেই তো গতি এবং সে গতি যে কতটা চক্ষুহীন, হৃদয়হীন আর অবিরাম, তার একটি চিত্র এই কলকাতাতেও খুঁজে পেয়ে তা নিয়ে প্রবন্ধ লিখে আমাদের ভাবিত করাতে চেয়েছিলেন সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ। সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ ছিল তাঁর যাবতীয় শঙ্কার ইন্ধন। শহরের নিবিড় অংশে একজন মানুষ শূলবেদনায় অসুস্থ হয়ে ভূমিশয্যা নিতে বাধ্য হয়েছেন। সেই আর্ত অস্তিত্বের দুপাশ দিয়ে পরিষ্কারভাবে ছুটে যাচ্ছে শত-শত গাড়ি। দু-দণ্ডের জন্য গাড়ি থামিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসার প্রয়োজন মনে করছে না কেউ। সেই ঘটনার পর বেশ কয়েক বছর পার হয়ে গেছে। সভ্যতার নিয়মেই, ক্যাসেট-টিভি-ভিসিয়ার আর স্টলভরানো অগণিত পত্রিকার প্রমোদ যোগানোর নিয়মেই, মানুষ যে আরও বেশি গতি-ময় হয়েছে, হয়েছে আরও বেশি ক্ষণ-পরায়ণ—সে ব্যাপারে বোধ হয় সন্দেহ করার খুব বেশি সুযোগ আর অবশিষ্ট নেই। এই গতির গোধূলিতে দাঁড়িয়ে তার পক্ষে যে অতীত হয়ে উঠবে বোঝা, অতীতকে যতটা পারা যায় বিস্মৃত হওয়াটাই তার পক্ষে যে জরুরি, তা আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। যাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এইসব কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে পড়ল তিনি আজ নেপথ্যে চলে গেছেন। বর্তমানের রঙ্গ-মঞ্চ থেকে তিনি দেহাবসানের আগেই বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। তবে কয়েক যুগ আগে তিনি বিধাতার কাছে যে 'প্রার্থনা' জানিয়েছিলেন সেই প্রার্থনার মধ্য থেকেই তিনি এখনও

সাক্ষাৎকার

পেতে পারেন নেপথ্যবাসের দুঃখ থেকে মুক্ত হবার শক্তি। তাঁর সেই 'প্রার্থনা' এখনও স্মরণযোগ্য, কোনোভাবেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে নি তার গুরুত্ব আজও:

প্রভু, বেলফুলে মোর কাজ নাই, তুমি / বেলফল মোরে দিয়ো, / ফুলে হবে না তো, ফল দিয়ে হবে/মোরব্বা রমণীয়। না-ই হোক খাটি, থাকুক ভেজাল / মালা-র চাইতে তবু ভাল মাল, / শিশুকাল হতে ফুল হতে মোর / ফুল-কপি বেশি প্রিয়।

বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই যে তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত নন, তার পেছনে দুটি কারণ খুবই প্রবল। প্রথম কারণটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, যে অতীতবিস্মৃতির ঢল নামার কথা এইমাত্র বলা হল তার প্রভাব। আর দ্বিতীয় কারণটি হল তাঁর এখনকার লেখা সাগ্রহে বা সশ্রদ্ধভাবে সংগ্রহ করে এনে তা ছাপার মতো উদারতা থেকে বর্ত-মানের সুপরিচিত প্রকাশক বা সম্পাদকেরা বিযুক্ত উল্লেখযোগ্যভাবে। তবে এমন একটা সময় ছিল যখন অনেক পাঠক প্রথম সুযোগেই অজিত-কৃষ্ণ বসু বা অ. কৃ. ব-র লেখা পড়ে ফেলার কাজটা সেরে নিতেন সানন্দে। শুধু তো উপন্যাস নয়, কবিতা, গল্প, শিশুসাহিত্য, এমন-কি হাস্যোজ্জ্বল ফীচার—সবকিছুই তাঁর কলম থেকে নিয়মিতভাবে বেরিয়ে এসেছে একদিন। "শনিবারের চিঠি" থেকে "দেশ"—সর্বত্র লেখকসূচীতে তাঁর নাম ফুটে উঠত বারংবার। তাঁর উপন্যাস "প্রজ্ঞা-পারমিতা" শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ (কথাসাহিত্য, অঘ্রান ১৩৭৪) "সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস"-এর অনেকটা জুড়ে যেমন ছিল, তেমনই ছিল তাঁর "পাগলা-গারদের কবিতা" নিয়ে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের অভিভূত মন্তব্য। এ ছাড়াও সজনীকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, পরিমল গোস্বামী এমন অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব নানা সময়ে তাঁর লেখা নিয়ে যেসব লিখিত অভিমত রেখেছেন তা পড়ে কেবলই মনে প্রশ্ন জাগে, এত দ্রুত তিনি যে প্রায় হারিয়ে গেলেন পাঠকের সামনে থেকে, তার পেছনে এর আগে যে-দুটি কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়াও অন্য কোনো নিরভিমান কারণ থেকে যাচ্ছে কিনা। তা সন্ধান করার ভার গবেষকরা একদিন নিশ্চয় নিয়ে নেবেন। আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য একেবারে আলাদা। জীবনের পরিণততম পর্বে এসে অজিত-

কৃষ্ণ বসুকে দেখা যাচ্ছে এমন একটা বিষয় নিয়ে নিরন্তর মগ্ন থাকতে আমাদের দেশে যার তেমন কোনো কৌলীন্য নেই, নেই তেমন ঐতিহ্য বা বংশমর্যাদা। প্রচলিত ধারণায় জাদু-চর্চা নিয়ে গল্প করে কোনো-কোনো বৈকালিক আসর উত্তীর্ণ করা যেতে পারে, বড়ো জোর দৈনিক পত্রিকার রবিবারের পাতায় লেখা যেতে পারে দু-একটা জাদু-ফীচার, কিন্তু তার বাইরে কিছু করার কথা চিন্তাও করা যায় না। সেই প্রচলিত ধারণাকে আঘাত করে অজিতকৃষ্ণ সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি জাদুসাহিত্যসৃষ্টির কথাও বলে আসছেন বহুদিন ধরে। শুধু বলে আসা নয়, লিখেও ফেলেছেন "যাদু-কাহিনী" নামের গ্রন্থ যাকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছে, যাঁর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'আপনার বইখানি অপূর্ব হয়েছে' এমন কথাও না লিখে পারেন নি। তাঁকে জাদু-বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করার ইচ্ছে প্রবল ও সঙ্গত হয়ে উঠেছিল সম্প্রতি।

কয়েক মাস আগে তিনি ৭৫ বছর পার করেছেন। কিন্তু তাঁর মনে আছে ডেল কার্নেগির সমগোত্রীয় হার্বার্ট ক্যাসনের সেই বইটির কথা যার শিরোনাম বোধ হয়—জীবন ৭০ বছরে শুরু হয়। এক বিকেলে দোতলার যে ঘরটিতে গিয়ে তাঁর লুঙি-গেঞ্জি-পরা দীর্ঘ অবয়বের মুখোমুখি হলাম, সেই ঘরে আসবাবের বিন্যাস ছিল না। বরং ছিল এক বিবাগী বিস্তৃতি। তিনি বাটি থেকে মুড়ি নিয়ে মুখে দিচ্ছিলেন। সামনে যে চায়ের কাপটি ছিল তা নিঃসন্দেহে আটপৌরে। আমাদের কথা এগিয়ে যাচ্ছিল, পিছিয়ে আসছিল ধীরে-ধীরে। আর ধীরে-ধীরে পাশের ঘর থেকে এ-ঘরে এসে এ-ঘর থেকে নিঃশব্দে পাশের ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন আর-এক বৃদ্ধ। এই বৃদ্ধ অজিতকৃষ্ণের অনুজ এবং প্রায়ান্ধ। কথা বলতে-বলতে এই অসহায় সহোদরের চলাচল লক্ষ করে যেন জ্বলে উঠছিল তাঁর চোখ। সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, জাদু আর জাদুকর নিয়ে অনবরত লিখে যাওয়া, অনবরত চিন্তা করে যাওয়া, তাঁর মনের এই পরিবর্তন কোন্ জাদুতে সম্ভব হল? এর পেছনে সত্যিই কোন্ উদ্ভাস কাজ করেছে, কোন্ প্রেরণা বয়ে গেছে সবেগে? এসব ভাবনার উত্তর কথায়-কথায় তিনি পরিষ্কার করে রেখেছিলেন। আমাদের এখানে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই জাদুচর্চার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে। অজিতকৃষ্ণের ক্ষোভ—এখনও, এত বছরেও, এদেশে একজনও জন্মালেন না যিনি প্রোফেসর হফম্যান, উর্দ্যা বা হুডিনির সমকক্ষ বলে গণ্য হতে পারেন। প্রোফেসর হফম্যান নিজে জাদুকর ছিলেন না বা মঞ্চে উঠে কখনও জাদু প্রদর্শন করেন নি। তিনি অভিনিবেশ এবং অনুসন্ধানের দ্বারা হয়ে উঠেছিলেন জাদুবিদ্যার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁর লেখা বই পড়ে ডেভিড ডেভানটের মতো বড়ো মাপের জাদুকর জন্ম নিয়েছিলেন। এই বই পড়েই অজিতকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন জাদুরও একটা বাণী আছে। দড়ি কেটে জোড়া লাগালেই জাদুর কাজ শেষ হয়ে যায় না। জাদুকরদের চারণকবির মতো হতে হবে। জাদুর সংজ্ঞা শুধু মায়া বা বিভ্রম সৃষ্টি করার মধ্যেই থেমে নেই। নির্দোষ আনন্দের পাশে থাকবে জাদুর কিছু ভূমিকা যা মানুষকে ভাবাবে, শিক্ষিত করবে আর জাগিয়ে তুলবে সমাজের প্রতি দায়িত্ব-বোধ। কিন্তু তাঁর দুঃখ এদেশের জাদুকররা জাদুর এই ব্যাপ্ত দিকটা নিয়ে একেবারেই ভাবেন না। এই শূন্যতা দেখে, এই অভাববোধ থেকে তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছে প্রেরণা—জাদুকে তার নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে দিতে হবে।

* হফম্যানের "মডার্ন ম্যাজিক" পড়ে আপনি কি হাতেকলমে জাদুবিদ্যার পাঠ নিয়েছিলেন?

* হ্যাঁ, নিয়েছিলাম কিছুদিন। তবে কখনও মঞ্চে দাঁড়িয়ে খেলা দেখাই নি। বহু খেলার টেকনিক বা চাবি-কাঠি আমার অজানা নয়। এই জানার ফলে একটা সমস্যাও স্থায়িভাবে এসে গেছে। আমি যখন কোনো খেলা দেখি তখন অন্যান্য দর্শকদের মতো রোমাঞ্চিত হতে পারার সুযোগ পাই না। শুধু উপভোগ করি সেই অংশটুকু যেখানে উপস্থাপনার চারুতা বা সূক্ষ্মতা আছে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আমাদের যৌবনে "দ্য ম্যাজিশিয়ান মান্থলি" লনডন থেকে বেরোত। বিখ্যাত পত্রিকা ছিল। ১৯৩২-এর নভেম্বরে এই পত্রিকায় আমার একটি লেখা বেরোয়। তখন আমার বয়স কুড়ি বছরের বেশি হয় নি। 'কাপস অ্যানড বলস' জাদু-জগতের একটা বিখ্যাত আর বহু-প্রচলিত খেলা। এই খেলার মধ্যে চুম্বক ব্যবহার করে একটা নতুন মাত্রা আনার কৌশল আমি সেই লেখায় দেখিয়েছিলাম। যতদূর জানি আমার আগে এই ব্যাপারে এভাবে কেউ ভাবেন নি। কিন্তু এই ভাবনার স্বীকৃতি, বছরের পর বছর চলে গেছে, আমি কোনোভাবে পাই নি। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে এসে একটা পত্রিকা দেখিয়ে গেলেন। পত্রিকাটির নাম "পেনটাগ্রাম"। এখনকার ইংল্যানডের প্রধান জাদুপত্রিকা। সম্প্রতি এই পত্রিকায় পিটার ওয়ারলক একটি ফীচার লিখেছেন। তাতে পরিষ্কার করে আমার নাম এনে সেই নতুন মাত্রার কথা স্বীকার করা হয়েছে।

* বিভিন্ন সূত্র থেকে দেখা যাচ্ছে পি. সি. সরকার শুধু আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুই ছিলেন না, জাদুসংক্রান্ত বহু ব্যাপারে আপনার মতামত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। তাঁর আগে আর পরে আমাদের দেশে আমরা অনেক জাদুকরকে পেয়েছি। কিন্তু পি. সি. সরকারের মতো এত বিস্তৃত ছাপ দর্শকের মনে আর কেউ রাখতে পারেন নি। এর কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?

* বিশেষ কারণ বলতে আমার মনে আসছে তাঁর অতুলনীয় নিষ্ঠা আর সংকল্পের কথা। এদেশে জাদুপ্রদর্শন ব্যাপারটাকে যখন খুব হেয় কাজ মনে করা হত তখন পি. সি. সরকার এই কাজের পেছনে দিনের পর দিন ব্যয় করেছিলেন। লক্ষ্য ছিল একটাই—আমাকে বড়ো হতে হবে জাদুর মাধ্যমে, হতেই হবে। নানা সূত্র থেকে শিখে উঠে সেই শেখাকে আত্মস্থ ক'রে নেবার অপূর্ব ক্ষমতা তাঁর ছিল। আর জাদুর স্বার্থে প্রদর্শনভঙ্গিকে কী ক'রে অনুকূল শক্তি করে তোলা যায় তা নিয়ে তাঁর মতো ভাবতে আর কেউ কি পেরেছেন?

আপনার সংজ্ঞায় আদর্শ জাদুকর কে?—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি একটুও সময় নিলেন না। ডেভিড ডেভানটের নাম করলেন সঙ্গে-সঙ্গে। ইংল্যানডের এই জাদুকর যখন খেলা দেখাতেন তখন মনেই হত না যে তিনি খেলা দেখাচ্ছেন। আর্ট কনসীলিং আর্ট। তিনি শিশুদের এত ভালোবাসতেন যে শিশুরাও তাঁকে প্রাণের মানুষ মনে করত। জাদুর মধ্য দিয়ে অনায়াসে যে কিছু বলা যায়, ফুটিয়ে তোলা যায় যে কিছু আদর্শের কথা, তার প্রমাণ রেখেছিলেন আমাদের দেশেরই এক জাদুকর রয় দ্য মিসটিক (যতীন্দ্রনাথ রায়)। একবার রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজুকে দার্জিলিং শহরের জনসাধারণ সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। সেই সভায় জাদুকর যতীন্দ্রনাথ দুটি খেলা দেখান। একটি খেলার নাম 'অবিনাশী কংগ্রেস পতাকা।' কংগ্রেস পতাকা নিয়ে যাচ্ছে এমন একটি সত্যাগ্রহী ছেলেকে পুলিস লাঞ্ছিত করে তার কাগজের পতাকাও টুকরো-টুকরো করে দেয়। সেই বিমর্ষ ছেলেটিকে দেখে জাদুকর তাকে প্রশ্ন করেন—তোমার কী হয়েছে? ছেলেটি তার লাঞ্ছনার জন্য কষ্ট পাচ্ছে না, কষ্ট পাচ্ছে তার এত শ্রদ্ধার যে পতাকা তার হাল দেখে। জাদুকর তাকে আশ্বস্ত করে বলে ওঠেন—কংগ্রেস পতাকাকে কেউ কখনও নষ্ট করতে পারে না। তিনি এগিয়ে গিয়ে পতাকার টুকরোগুলিকে হাতের মধ্যে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে একটি অক্ষত পতাকা বানিয়ে তোলেন। পুলিস সেই পতাকাকে আবার টুকরো-টুকরো করে। জাদুকর আবার সেই টুকরোগুলিকে হাতের মধ্যে এনে আকারে আরও বড়ো একটা পতাকা বানিয়ে তোলেন। এবার পুলিস সেই পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেয়। তাতেও কিছু যায় আসে না। পতাকাভস্ম হাতে নিয়ে জাদুকর আরও বড়ো পতাকা বানিয়ে তোলেন। এই যে খেলা দেখাতে-দেখাতে দর্শককে একটা আদর্শের কাছে নিয়ে দাঁড় করানো—এরই নাম জাদু। অজিতকৃষ্ণের বহুদিনের বাসনা জাদুর আঙ্গিকে জাদুকর ফাউসটের কিংবদন্তীর একটা প্রতীকী ধারণা উপহার দেওয়া। ফাউসট শয়তানের কাছে তাঁর সত্তাকে বিক্রি করেছিলেন। আধুনিক সভ্যতাও তার সত্তাকে শয়তানের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। ক্রিসটোফার মারলোর নাটক ডকটর ফাউসটাসে শয়তানের পরাজয় পাই নি। গোয়েটে তাঁর ফাউসট-এ শয়তানের পরাজয় দেখিয়েছিলেন। 'সেই সূত্র ধরে আমিও শেষ পর্যন্ত শয়তানের পরাজয়টা দেখাবো।' বহু বছর ধরে এই দেখানোর ইচ্ছে তিনি পোষণ করে আসছেন। পি. সি. সরকারের সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর কথাও হয়েছিল। সরকার বলেছিলেন জাপান থেকে ফিরে এসে অজিতকৃষ্ণের এই যে পরিকল্পনা, এই যে জাদুর সঙ্গে নাটকের বিবাহ ঘটিয়ে একটা অন্যরকম প্রতিক্রিয়া গড়ে তোলা, এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে তিনি তাঁর শক্তি আর সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু সরকার জাপান থেকে আর ফিরে আসতে পারেন নি। ফলে অজিতকৃষ্ণের সেই শুভ বাসনা এখনও অপূর্ণ থেকে গেছে। 'আর দু-চার বছর যদি বাঁচি ফাউসট লিজেনডের ব্যাপারটাকে রূপ দেবার চেষ্টা করব। দু-চারটি ছেলেকে তৈরি ক'রে যাব যারা চারণকবিদের মতো জাদুর মাধ্যমে এমন কিছু দেবে যা আর নিছক ভেলকি বলে

উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। আর, একটা উপন্যাস লিখে যাব যার নায়ক হবে এক আদর্শ জাদুকর।'

তিনি তাঁর স্বপ্নের মানচিত্র সম্পূর্ণ করার পর আমি জানতে চেয়েছিলাম আমাদের দেশের গুণী-মহলে এমন কেউ কি নেই যিনি কখনও না কখনও জাদুর প্রেমে পড়েছেন। ফলে যে তালিকাটি লাভ করলাম তা ওজনের দিক থেকে উপেক্ষা করার মতো কিছু নয়। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর তরুণ বয়সে জাদুর খেলা দেখিয়েছেন স্বহস্তে। গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতো বিজ্ঞানী জাদুর খেলা দেখাতে মঞ্চে উঠতেন। কয়েনের ছুটো খেলায় তাঁর সিদ্ধি ভারতের বাইরেও স্বীকৃত। সত্যজিৎ রায় এক সময় হাতেকলমে আর নিভৃতে জাদুর চর্চা করেছেন। তিনি যখন লেক টেম্পল রোডে থাকতেন অজিতকৃষ্ণ তখন তাঁর বাড়িতে জাদু-সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান বই লক্ষ করেছেন। সেতার-শিল্পী বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী প্রতিভাবান জাদুকর ছিলেন। অজিতকৃষ্ণ স্মরণ করিয়ে দিলেন পি. সি. সরকারের একটা মন্তব্য: 'বিমলাকান্ত ম্যাজিকে থেকে গেলে আমার ভাত মারা যেত।' একবার হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ পি. কে. সেনের কাছে শরীর-সংক্রান্ত উপদেশ নিতে গিয়ে অবাক হয়েছিলেন। কারণ ডাকতারি পরামর্শ দিতে-দিতে শ্রীসেন চাইনিজ লিঙ্কিং রিংসের একটা সূক্ষ্ম কাজ দেখিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন জাদুবিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা। এইসব জাদুপ্রেমের দৃষ্টান্তগুলি অজিতকৃষ্ণের জাদুজনিত যত স্বপ্ন সে-সবের পরিবর্ধনে সাহায্য করে যায় ক্রমাগত।

সাহিত্য, জাদু এবং সংগীত তাঁর কাছে একই ডালে ফুটে ওঠা তিনটি ফুল। তাঁর সংগীতের প্রথম গুরু কৃষ্ণচন্দ্র দে তাঁকে প্রথম দিনে শিখিয়েছিলেন 'হরি হে বিপদভঞ্জন তব নাম' এই গানটি। কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠে তিনি খুঁজে পেতেন জাদু। তাঁর শেষ গুরু তারাপদ চক্রবর্তীর কণ্ঠেও জাদুরই খেলা চলত পূর্ণরূপে। কোনো-কোনো জনহীন দিনান্তে আজও নিজেকে গান শোনাতে গিয়ে তিনি তাঁর গুরুকুলের উজ্জ্বল সব মুখমণ্ডল চোখের সামনে ভাসতে দেখেন। আর সমস্ত স্মৃতিকে ছাপিয়ে ঢাকার করোনেশন পার্কে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বেলাশেষে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিদায়রত যে শব্দ আর ভাবের জাদুকরের জ্যোতির্ময় মূর্তি অজিতকৃষ্ণকে আজও সম্মত করে দিয়ে যায় তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

সুভাষ ঘোষাল

চিত্রকলা

প্রবীণ-নবীনের সমাবেশ

বিড়লার ২১তম বার্ষিক প্রদর্শনী। ৯-২৯ জানুয়ারি, ১৯৮৮

তরুণ শিল্পীদের ৮৩৮টি শিল্পকর্মের মধ্যে বাছাই করে ৭৭টি পেনটিং, ২৭টি ভাস্কর্য এবং ২৭টি ছাপাই ছবি ছাড়া আরো ষোলোজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর ১৬টি শিল্পকর্ম নিয়ে কুড়ি দিন ধরে মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হল বিড়লা অকাদেমীতে। উদ্যোক্তারা আশা প্রকাশ করেছেন এই প্রদর্শনী থেকে 'the viewers will have an opportunity to evaluate the trends of Indian Contemporary Art'।

নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকার ফলে উদ্যোক্তারা চেষ্টা করেছেন সমগ্র ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে তরুণ শিল্পীদের শিল্পকর্মের সমাবেশ ঘটাতে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তরুণ শিল্পীরা যোগ দিলেও কার্যত প্রদর্শনীটিতে আধিপত্য ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার শিল্পীদেরই। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের তরুণ শিল্পীদের পরিচয় যত স্পষ্ট হয়েছে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিল্পচর্চার পরিচয় তত নয়। আর পশ্চিমবঙ্গের তরুণ শিল্পীদেরও সামগ্রিক পরিচয় এই প্রদর্শনী থেকে উঠে আসে না, কেননা ভালো আঁকছেন এমন অনেক তরুণ শিল্পীর অনুপস্থিতি লক্ষ করা গেল।

'Only participated for display'-র শিল্পীরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত। বোঝাই যাচ্ছে তাঁদের শিল্পকর্মগুলিকে অঙ্গীভূত করা হয়েছে প্রদর্শনীটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য। এবং এটাও ঠিক যে, প্রতিষ্ঠিতদের শিল্পকর্মগুলি তরুণদের পাশে একসঙ্গে প্রদর্শিত হওয়ায় একেবারে সরাসরি তরুণ প্রতিভার মাননির্ণয়ে শুধু তুলনাই নয়, ভারতীয় শিল্পচর্চার ধারাটিকেও চাক্ষুষ করাতে চেয়েছেন উদ্যোক্তারা। বলাই বাহুল্য, এই পরিকল্পনাটির জন্য তাঁদের ধন্যবাদ প্রাপ্য।

প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ তেলরঙ ছবিটি সুনীল দাসের। ছবিটির নামও সুনীল দাস—৪। ১৫২ × ১৮৪ সে. মি. সাইজ ক্যানভাসের গোটা জমিটাকেই শিল্পী মাত্র কয়েকটি রেখা, ঈষৎ হলুদ-সবজে নীলের আবছা টান দিয়ে বাকিটা ভরিয়েছেন সাদায়। সাদার ওপর সাদা দিয়ে মাত্রাবিন্যাস করতে পারেন যে শিল্পী, তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিনি মাধ্যমকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনেছেন নয়, গুলেও খেয়েছেন। কিছু জ্যামিতিক রেখাবিন্যাসে আর ঈষৎ রঙের ব্যবহার করে বাকিটা সাদা দিয়েই ছবিটাকে ত্রিমাত্রিক করেছেন সুনীল দাস। একটি পুরুষ আর-একটি নারী—দুজনেই বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সামনের গাছের হালকা আভাসিত পটের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সংলগ্ন এক পশুর দিকে। পশুটি যেন অর্ধভূমিষ্ঠ। মেয়েটার মুখেই যা বাদামি রঙের কারুকাজ, আর ঠিক তার একেবারে কোনাকুনি পশুটির পায়ে। পুরুষের হাতটি ছুঁয়ে আছে একটি পাইপ বা ওই-জাতীয় কিছু—যেন স্পর্শ করেও অ-ছোঁয়া, অধরা তার হাতটি। একমাত্র মেয়েটির লম্বালম্বি ঝুলে-থাকা হাতটিই যা স্পষ্ট। নারীপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে এই ছবিটিতে ফ্রয়েডীয় ছাপ স্পষ্ট। মেয়েটির মুখে, রগের কাছে সুনীল তুলির বদলে আঙুল আর হাতের তালুতে করে রঙ লাগিয়েছেন—ফলে মেয়েটির মুখটি আশ্চর্য রকমের জীবন্ত হয়েছে তার কালোয় ভরাট চোখদুটির অনুজ্জ্বলতা সত্ত্বেও।

অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর (অ. লা. চৌ) জলরঙ "শিল্পীর স্বপ্ন" ছবিটিতে রেখাই মূলশক্তি। কালিকলমে আঁকা রেখাগুলো এত প্রাণময় আর সংবেদনশীল যে গোটা ছবিটি মনমাতানো ছন্দে নাচছে। আকাশ চিরে উর্ধ্বমুখী গাছগুলো রঙরেখায় ঝলমলে, যেন ময়ূর পেখম মেলেছে মেঘমেদুর আকাশের তলায়। আর গাছের নীচে নাচের ভঙ্গিমায় ফলসংগ্রহে রত একদল মেয়ে। রেখার বিভাজনে উপরে ছড়িয়ে থাকা মেঘের স্তরবিন্যাসে জলরঙের খেলায় মেঘ আর আকাশকে একাকার করে তিনি বহুদূর ছড়িয়ে দিয়েছেন। অবলীলায় পটকে ভেঙে তছনছ করেও পটের মূল আধারটিকে ধরে রেখেছেন তিনি। রঙ-রেখার-রূপবন্ধের সামঞ্জস্যে কঠিনে-কোমলে মেশা এই ছবিটি বহুদিন মনে রাখার মতো।

গণেশ পাইনের একাধিক রূপবন্ধ এবং রূপ-কল্পনার সমাহারের জটিলতা থেকে "দ্য টাইগ্রেস" আপাতমুক্ত। মিশ্রমাধ্যমের ছবিটিতে শিল্পী পাতাকাটা চোখের এক নারীমূর্তির মাথার উপর বাঘের আভাস এনেছেন। দেবীর কাঁধের থেকে ঢল নেমে দুপাশে ছড়িয়ে পড়েছে বাঘের অঙ্গ। একটুতেই ভ্রম হয় বুঝিবা দেবীর দুটি বাহু। দেবীর কোমরে জড়ানো বাঘের থাবার আদলে দুটি হাতে একটি

পাতাসমেত লাল ফুল। দেবীমূর্তিটিকে গণেশ পাইন নিজস্ব রূপকল্পনায় ধূসর রেখাজালে আকীর্ণ করে দেবীর প্রত্নরূপ আর মানবীয় রূপ একই সঙ্গে ধরেছেন। ছবিতে প্রসারিত বাঘের পায়ে, দেবীর গায়ে প্যাসটেলের খয়েরি ডোরাকাটা দাগ। কাঠের পুতুল বা আইকন-সদৃশ মূর্তিটি অপূর্ব দ্যুতিময়।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গ্রামসুন্দরী" ছবিটি সোলার উপর জলরঙে আঁকা। বিশুদ্ধ রেখা আর রঙের সমন্বয়ে লিরিক্যাল হয়েও ধ্রুপদী এই ছবিটিতে তিনটি নারীমূর্তি, —শেষের জনের বাঁ হাতে এক ল্যাজঝোলা পাখি। বাঙলার পুরানো লোকছড়া, লোকগাথার সুন্দরীবর্ণনার সঙ্গে মিল থাকলেও রামানন্দের কমপোজিশন আর নির্মাণ-রীতির সারল্য এক আলাদা মাত্রা যোজনা করে। তুলির সুডৌল রেখা, যদৃচ্ছ বর্ণব্যবহার আর সোলার আঁশগুলো ছবিটাকে অপূর্ব ফলিয়েছে। রঙ রেখার মধ্যে কোথাও আবদ্ধ, কোথাও উপচে পড়ায় রঙরেখার যে টেনশন সৃষ্টি হয়েছে তাতে করে বোঝা যায় এই গ্রামসুন্দরীরা চোখে-দেখা-কানে-শোনার জগৎ থেকে আহরিত নয়, তাঁর মনের কোণে গাঁথা বোধ থেকেই উঠে আসা।

গণেশ হালুইয়ের "হোলি হিলস্" ছবিটি বোর্ডের উপর গোয়াশে ল্যাণ্ডস্কেপ। গণেশ বর্ণব্যবহারের সমস্ত ধারণাকে উলটে দিয়েছেন প্রকৃতিকে এক নিজস্ব বোধ আর দৃষ্টির আলোয় টেনে এনে। ফলে আকাশ, গাছ, পাহাড়ি দৃশ্য দৃশ্যবস্তুর সাদৃশ্য নয়, শিল্পীর দৃষ্টিপাতের রঙে রাঙা। আকাশ হয়েছে গেরিলাল, গাছ ঠিক সবুজ নয়, কোথাও কালচে সবুজ, কোথাও ঈষৎ লাল। ছবিটি এক ঝলক দৃষ্টিতেইচোখকে দুদণ্ড শান্তি দেয়, মনকে স্তব্ধ করে।

ঠিক তেমনি রঙের আগুন ঝরিয়েছেন দিল্লী-প্রবাসী শিল্পী ফাল্গুনী দাশগুপ্ত জলরঙের "মকিং বার্ডস" ছবিতে। তাঁর ছবির বিষয় প্রকৃতি হলেও প্রকৃতির ছবি তিনি আঁকতে চান না। প্রকৃতির চেয়েও বড়ো করে দেখতে চান প্রকৃতির অভিব্যক্তি। এখানে মাথায় আগুনরঙের পত্রপল্লব নিয়ে হেলে-থাকা গাছটি সমস্ত ছবি জুড়ে থাকলেও দুটি কাকের অভিব্যক্তি থেকে বিদ্রূপকেই ঝলসিত করেছেন। বর্ণ আর আকারের মেলবন্ধন এত ছন্দোময় যে চোখ সেঁটে থাকে।

প্রকাশ কর্মকারের "সূর্যমুখী" ছবিটি নতুন কিছু ব্যঞ্জনা আনে নি। কড়ির মতোন মুখ, বর্ণের বিপর্যস্ত ভাব আর দৈহিক গঠনের আশ্চর্য ভাঙচোর এখানেও সেই একই।

বরং বিকাশ ভট্টাচার্যের "এবং—গদাই" ছবিটি কিছুদিন পূর্বে দেখা প্রদর্শনীর ছবিগুলির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। ঘন তেলরঙের এবড়ো-খেবড়ো, অনেকটা গুহার মতোন দেয়ালে প্রসারিত নারীর বাঁ হাতের দিকে বিস্ময়বিমুগ্ধ বসে থাকা একটি পুরুষ। সে চাহনি প্রেম-মুগ্ধতার হতে পারে, বা অন্য কিছুরও হতে পারে। পুরুষটির চাহনি এত জীবন্ত —মনে হয় কোনো মানুষই বুঝি বা বসে আছে, তন্ময়তা ভেঙে গেলেই নড়ে বসবে এখনই। তেমনি জীবন্ত নারীর প্রসারিত বাঁ হাতটি। ছবিতে আলোর উৎস নেই, অথচ এক উজ্জ্বল আলোয় ঝকমকে পুরুষটির মুখ পিঠ। আর তন্ময়তার পিছনে খোলা দরজায় বিশাল এক সাদা জমি থাকায় রঙের উজ্জ্বলতায় ক্লান্ত বিপর্যস্ত চোখ দু দণ্ড শান্তি পায়। বিকাশের ছবিতে একটা কাহিনী থাকে, এই ছবির নামের মধ্যেই গল্পের একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শিল্পী চিত্রভানু মজুমদার। বর্ণব্যবহারে, কমপোজিশনে, বিষয়ের গভীর তাৎপর্য রূপায়ণে তিনি অসাধারণ দক্ষ। চিত্র-মাধ্যমের রহস্যকে কবজা করে নিয়ে ইতিমধ্যেই স্বতন্ত্র স্বকীয় ধারার চিত্রকর্মে স্থির হতে পেরেছেন। প্রদর্শনীর ছবিটি (কমপোজিশন) স্টিল লাইফ ধরনের। একটি ক্যারামবোর্ডের উপর নিরেট অন্ধকারে ভাসতে থাকা তিনটি ল্যাম্প্‌শেড। ল্যামপগুলি থেকে কোনো আলো বিচ্ছুরিত হয় নি। অথচ অন্ধকার-অন্ধকার রাখায় পরি-বেশটি না-দিন না-রাত। চিত্রভানু সম্ভবত সময়কে নির্দিষ্ট করতে চান নি। এর ফলে ছবিতে আলো-আঁধারির কোনো খেলা ছাড়াই ঘরের দেয়াল, ক্যারাম বোর্ড, এক কথায় গোটা পরিস্থিতিকেই তুলে আনেন শিল্পী। তিনি ফিগার আঁকার চেয়ে ফিগারের অন্তর্গত রূপান্বেষণেই বেশি আগ্রহী। তাই রঙের ক্রমগাঢ় ক্রমহালকা আর কালো লাল সাদা, বিশেষ করে সাদা বর্ণ যে প্রতিভাস সৃষ্টি করে তাতে শুদ্ধ বিমূর্ত চিত্রটিও মূর্তি পেয়ে যায় আচমকা। নানা স্তর, ছবির মাত্রাবিভাজন, বর্ণভঙ্গিমা সবকিছু ধুয়ে-মুছে একটি নির্দিষ্ট রূপের দিকে ধাবিত করাই চিত্রভানুর ছবির বৈশিষ্ট্য।

তবে, চিত্রভানুর দক্ষতাকে স্বীকার করেই বলতে চাই, তিনি সময়, সমাজ-প্রগতিকে ঠিকমতো স্পর্শ না করে শুধু ফর্মচর্চায় নিবিষ্ট হয়ে থাকলে ক্রমেই হারিয়ে যাবেন বিমূর্ততা থেকে নাথিংনেসে।

অর্পণা কাউরের "যুদ্ধের পর" ছবিটি পুরনো। শিখ-নিধনের উপর ভিত্তি করে ছবিটি তিনি অনেক দিন আগে এঁকেছিলেন। উজ্জ্বল আগুন বর্ণের হলদে অর্ধবৃত্তাকারের মধ্যে একটি নিরালম্ব নারী ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। তার সামনে তিনটি তীরের উপর রাখা এক শিখের (তার স্বামীর) ছিন্ন মাথা। আর এই জলন্ত আগুনের উপর, দহনের উপর সবুজ-নীলের কাছাকাছি আশ্চর্য ঝকমকে জামা গায়ে এক নির্বিকার মানুষ উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে আগুনের সমস্ত ধোঁয়া জড়ো হওয়া নিরেট কালো আকাশে।—যেন সে আগুনের উপর বাস করে আগুনকেই অবজ্ঞা করছে। ছবিটির বর্ণব্যবহার এবং মুখের অভিব্যক্তি অপূর্ব।

কাঞ্চন দাশগুপ্তের মিশ্রমাধ্যমের "হিংসার পরে" ছবিটি পুরস্কৃত ছবি। বিষয়ের দিক থেকে কাউরের ছবির সঙ্গে এর মিল আছে। কাউরের ছবিটি যতটা মানবিক ততটা সার্বজনীন নয়, কিন্তু কাঞ্চনের ছবিটির বড়ো গুণ সার্ব-জনীনতা। ক্যানভাসে কালো দিয়ে আঁকা ছোট্ট ছবিটিতে একটি পরিবার এঁকেছেন। কালোর ওপর সামান্য বিন্দু-বিন্দু ছড়িয়ে থাকা নীল সবুজ ঘর আর দিগন্তকে বিভাজন করেছে। একপাশে নিহত স্বামী, তার মুখ-মণ্ডলের চারপাশে হালকা কালো, যেন রক্ত গড়িয়ে নেমেছে, তারই পাশে ভেঙেপড়া স্ত্রী, বুকে বিহ্বল, হতাশ, অথচ আশ্চর্য নির্মল এক শিশু। ছবিটির সামান্য পরিসরে (৩৭×৫৭) শিল্পী সময়, সমকাল, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থান—সমস্তই অল্প আয়াসে স্পষ্টতায় এনেছেন। অত্যন্ত সহজ করে আঁকা ছবিটির সামনে দাঁড়ালে আত্মদর্শন হয়ে যায়, কান্নায় মুচড়ে ওঠে বুক। ক্রোধে ঘৃণায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় মন।

শেখররঞ্জন করের নামহীন ছবিটিতে তুলিচালনা এবং কমপোজিশনে শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় থাকলেও মানব-মানবীর মুখাবয়বে এবং বিষয়নির্বাচনে শানু লাহিড়ীর ছাপ স্পষ্ট। ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা দুই নারীপুরুষের অনেক দূরে ছড়িয়ে থাকা দৃষ্টির মধ্যে শান্ত গ্রাম্য উত্তাপ। নারীর হাতে একটি পাখি, পিছনে নিটোল বিস্মিত প্রকৃতি। মূর্তি দুটির মধ্যে বিমূর্ততার চেষ্টা থাকলেও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিমূর্ত। কালো হলদে লালের খেলায় গোটা প্রকৃতির আয়তঘন রূপ শত বিমূর্ততা সত্ত্বেও স্পষ্ট হয়ে আসে। শেখর পালের ছবি প্রসঙ্গে ওই একই কথা বলা যেতে পারে। মানস ভট্টাচার্যের "জানালা" ছবিটি সুন্দর। ছবিটি বিকাশ ভট্টাচার্যের "এবং—গদাই"-এর খুব কাছাকাছি। পোর্ট্রেট অঙ্কনে মানসের দক্ষতার পরিচয় এই একটি ছবিতেই মেলে। তাঁর ছবির মধ্যেও আলোর উৎস কোথায় জানা না গেলেও আলোর খেলা চমৎকার। খোলা জানালায় প্রৌঢ়া রমণীর বিস্ময়ঘন হাঁ-মুখে অনেক কাহিনী লুকিয়ে থাকে। জানালা, ঘরের দেয়াল প্রৌঢ়ার মতো জীর্ণ। ছবিটি চমৎকার।

অনির্বাণ কাজী, তাপস ঘোষাল, রথীন্দ্রনাথ চৌধুরী, চঞ্চল চ্যাটার্জী, সলিল ঘোষ প্রভৃতির ছবি প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন। তেমনি বেশ কিছু ছবি ভীষণ প্রভাবিত। গণেশ হালুই কিংবা গোপাল ঘোষের বলে ভুল হয় ৪১, ৪২ সংখ্যক ছবি দুটি। কমপোজিশন সুন্দর হলেও শুভ্রা চ্যাটার্জীর ছবি দুটি ওয়াসিম কাপুরের সমমাত্রিক ছবি। ওয়াসিম কাপুরের ছবিটি ভালো লাগলেও তিনি বিষয়ে, নির্মাণে নতুন কোনো মাত্রা আনতে পারেন নি। পরেশ-নাথ মৈত্রের "নৌকা" ভালো লাগে। শুভেন্দুশেখর দাসের ছবির টোন খুব সুন্দর। মনোজ দত্তর টেমপারা "দি জার্নি" প্রদর্শনীর উল্লেখযোগ্য ছবি।

অমলনাথ চাকলাদারের "গ্রাম্য মেলায়" ছবিটির আলাদা মূল্যায়ন হওয়া উচিত। এটি ভারতীয় রীতির ছবি হিসেবে পুরস্কৃত। শিল্পী স্তরবিভাজনের সাহায্যে সমগ্র মেলা, মেলা ছাড়িয়ে দূরে ছুটে চলা রেলগাড়ি, বিছিয়ে থাকা আকাশটিকেও অপূর্ব সুন্দর করে এঁকেছেন। মানুষ-জন, ছাউনি, সাইকেল, কুকুর, এমনকি ছাউনিতে বাঁধা ব্যানার, ব্যানারের লেখাও শিল্পীর তুলিতে ফাঁক যায়নি। প্রাচ্য শিল্পকলার মূল লক্ষণ সরলীকরণ আর প্রতীকীকরণ। শুধু পট নয়। অমলের এই ছবিটিতে প্রতীকী রূপ থাকলেও তাঁর পরবর্তী ছবি "বুনো বেড়াল"-এ সে লক্ষণ নেই। ছবির প্রধান এবং প্রথম গুণ যদি হয় ভালোলাগা, তবে বলব অমলের ছবিগুলি ভালো লাগে—এই পর্যন্তই। ভারতীয় শিল্পধারা নিজের গুণেই তার দাপট হারিয়েছে—যুগ, সময়কে যথাযথ চিত্রিত করতে রীতির সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাই ভারতীয় ঘরানায় ছবি আঁকতে হলে তার সঙ্গে বিদেশী উপাদানকে মিলিয়ে দিতেই হবে। যেভাবে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় রীতি গ্রহণ করেও আধুনিক,—সেই ক্ষেত্রটাকে আয়ত্ত করতে হবে। না হলে

সুন্দর প্রতিমূর্তিগুলি দৃষ্টিকে টানবে, মনোহরণ করবে, কিন্তু ভেতর নাড়িয়ে দিতে পারবে না।

ছাপাই ছবি

১৯৮৬ সালের ফেবরুয়ারিতে বিড়লা অকাদেমীতে সারা ভারতের ছাপাই ছবির একটি ঐতিহাসিক প্রদর্শনী হয়েছিল। ওই প্রদর্শনীতে ভারতের প্রাচীন কাল থেকে অতি সাম্প্রতিক কালের ছাপাই ছবির ধারাবাহিক পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। এই প্রদর্শনীটির পরিধি ঠিক ততদূর বিস্তৃত না হলেও পূর্ব প্রদর্শনীর পরিপূরক বলা যেতে পারে। গত প্রদর্শনীতে এবং এবারেও সোমনাথ হোড়ের অনুপস্থিতি চোখে লাগে।

ছাপাই ছবি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে, সামাজিক বিপ্লবে বিশাল ভূমিকা নিয়েছিল। চিত্রশিল্পকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ছাপাই ছবির গুরুত্ব কম বেশি সব শিল্পীই অনুভব করেন। আমাদের শিল্পীরা পেনটিং-এ ভাস্কর্যে অনেকটা স্থিত হলেও ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ আত্মপ্রতিষ্ঠ নন। বলা বাহুল্য ছাপাই ছবির সেই দুর্বলতাই এই প্রদর্শনীতে স্পষ্টতা পেয়েছে। ছাপাই ছবিতে মাধ্যমের অন্তর্নিহিত যে প্রকরণগত চরিত্র তারই টানে শিল্পীদের বিমূর্ততার দিকে সহজেই পদস্খলনের আশঙ্কা থেকেই যায়। বর্তমান প্রদর্শনীতে এই রকম ছাপাই ছবি অনেক।

পুরাতন ও নবীন ধারার সংযোগশিল্পী হরেন দাসের "গোধূলি" ছবিটি খুবই সুন্দর। আকাশে মাথা উঁচিয়ে থাকা গাছের সরু-সরু সূক্ষ্ম হিজিবিজি রেখার টেকসচার আর মাথার ওপর ছড়ানো অন্ধকার। ছোট্ট পরিসরে পটভূমিটি বিশাল হয়ে ওঠে। আকাশ আঁকার ক্ষেত্রে হরেনবাবু পুরনো ঘরাণার লোক। হালকা আর ঘন করে স্তরে-স্তরে অর্ধবৃত্তাকার আকাশের জ্যান্ত রূপটিকে ধরেছেন।

প্রদর্শনীতে হরেন দাসের পরবর্তী শিল্পীর ক্রম পরম্পরার দিকে না গিয়ে উদ্যোক্তারা সরাসরি তরুণ শিল্পীদের শিল্পকর্ম রেখেছেন। ছাপাই ছবিতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা অধিকাংশই শান্তিনিকেতনের। তবে ভারতের নানা প্রদেশের শিল্পীও আছেন। মঞ্জরী চৌধুরীর এচিং খুব সুন্দর। ঘন টেকসচারময় জ্যামিতিক আয়তনে ছাপাই ছবিতে তিনি আলাদা মাত্রা এনেছেন। পুনম কলিটা এচিং-এ ছোপ ছোপ দিয়ে মুখাকৃতিকে খুব খোলতাই করে এঁকেছেন। দীপক মুখার্জীর লিনোকাট সুন্দর। বুলি চালনার কৃতিত্ব ধরা পড়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভাজন-রেখায়। রেখাগুলি নিটোল কাটায় গাড়ি, পিছনের বিস্তৃত শহর খুব জ্যান্ত হয়েছে। মণিদীপ সাহার লিথোগ্রাফ টানে। দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতোন শিল্পীরা হলেন—অনিতা চক্রবর্তী, মিতা বিশ্বাস, বৈশাখী ঘোষ প্রভৃতি।

ভাস্কর্য

ভারতীয় ভাস্করদের ব্যয়সঙ্কুলানের জন্য ভাস্কর্য নির্মাণে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হয় প্লাস্টার, সিমেন্ট, কাঠ আর না হয় মাটি। মাটি-মাধ্যমেই কাজ বেশি। আর মাটি নিয়ে কাজ করলেই শিল্পীদের কাজে একটা লোকায়তিক ভাবনা ঘিরে রাখে। এই প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত ভাস্কর কিঙ্কর সাহার "স্ট্রীট বেগার" ভাস্কর্য মাটি দিয়ে হলেও লোকায়তিক ভাবনামুক্ত। শ্যামল রায়ের টেরাকোটা নগ্নমূর্তি দুটি লোকায়ত রূপবন্ধকে আশ্রয় করলেও আধুনিক ভাস্কর্যের সূক্ষ্মতাকে স্পর্শ করেছে। সঞ্জয় মিত্তানের "অ্যাগনি" ভাস্কর্যটি সুন্দর।—খুবই ছোট্ট তাঁর ভাস্কর্য। বিমল কুণ্ডুর "হেড" সরজিৎ দাসের "প্রভাস সেন" দিলীপ সাহার "কমপোজিশন" আর তারক গড়াইয়ের হাত-পা-হীন হেলান দেওয়া কাঠের ভাস্কর্যটি টেনেছে। তিনি তাঁর পারিবারিক বোধের সীমানা থেকে সরে বিশুদ্ধ রূপসৌন্দর্যের দিকে ধাবিত হয়েছেন এখানে।

প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে একমাত্র শঙ্খ চৌধুরীর "শী" (she) আবক্ষ নারীমূর্তি প্রদর্শিত হয়েছে। ত্রিপুরার বিপুলকান্তি সাহার "বাসন্তী" মূর্তিটিও চমৎকার। সামগ্রিক প্রদর্শনীটি অভিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও আকর্ষণীয় শিল্পকর্মের সঙ্গে অনেক কাঁচা কাজও প্রদর্শিত হয়েছে।

হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

অ-প্রবাসী বিভূতিভূষণ

অমল সেনগুপ্ত

আত্মজৈবনিক রচনা "জীবন তীর্থে" লিখেছেন বিভূতিভূষণ: 'আমি পূর্ণ এক ভারতীয়ত্বে বিশ্বাসী। স্বপ্ন দেখি, আচরণে-অনুষ্ঠানে, বিবাহে সামাজিকতার সব প্রভেদ ঘুচে গিয়ে ভারতবর্ষ, প্রদেশ-প্রদেশের সীমারেখা মুছে গিয়ে, শুধু "ভারতবর্ষ" হয়ে একটি সত্তায় দাঁড়াবে জগতের সামনে। দু-দশ বছরে নয়, দু'চার শতাব্দী হয়তো যাবে লেগে, যে শুভ পরিণতির সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধও নেই। তবু দেখি স্বপ্ন। সে-পরিণতির সামান্যও সূচনা দেখলে আনন্দিত হই। তবু বাঙ্গালীত্ব ব'লে একটা আলাদা বস্তু আছে-ই। একটা পাড়ার মধ্যে একটা বাড়ীর যে নিজস্বতা, অন্তত তাই নিয়ে।' (১)

বিহারে তিন পুরুষের (অধস্তন পুরুষদের ধরলে পাঁচ পুরুষ) বসবাসকারী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় অনায়াসে মিলে গিয়েছিলেন বিহারের জনজীবনের সঙ্গে। নির্দ্বিধায় নিজেকে অভিহিত করতেন "বঙ্গভাষী বিহারী" বলে। সমগ্র বিহারের হিন্দিভাষী মহলেও তাঁর ঈর্ষণীয় জনাদৃতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রেই জানা। বহির্বঙ্গের বাঙালি-সুলভ হীনম্মন্যতায় কখনো নিজেকে প্রবাসী বাঙালি বলে অনুভব করেন নি। অ-প্রবাসী পরিচয়ে গর্ববোধ ছিল তাঁর। অপিচ বিভূতিভূষণ জানতেন, পূর্ণ ভারতীয়ত্ব বা বঙ্গভাষী বিহারীত্বের অনিবার্য শর্ত কিন্তু তাঁর সংস্কৃতিগত বা মানস বাঙালিয়ানা। যে বাঙালিত্ব অর্জন করতে তিনি ছুটে-ছুটে গেছেন বাঙলার সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক পরিবেশে। বাঙালিত্বের প্রথম স্পষ্ট অনুভূতি অবশ্য তাঁর হয় হাওড়া শিবপুরে এসে। আজন্ম বিহারে লালিত বিভূতিভূষণ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে দ্বারভাঙ্গা থেকে শিবপুরে এলেন তৎকালীন রিপন কলেজে ইনটারমিডিয়েট-ইন-আর্টস পড়তে। শিবপুরে তাঁর মাতুলালয়। 'শিবপুরে আসা আমার একটা নূতন জগতে নবজন্ম। আমার বাঙ্গালীত্ব-বোধ একটা সার্থকতা পেল।'—লিখেছেন বিভূতিভূষণ। (২) বিহার এবং বাঙলা—উভয়কে নিয়েই যে তাঁর পরিপূর্ণ জীবনসত্তা, বারবার বলেছেন বিভূতিভূষণ, বিভিন্ন প্রসঙ্গে। এই সেদিনও এক সংবর্ধনা-অনুষ্ঠানের প্রতিভাষণে তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল: 'আমার প্রসূতি-জননে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা ছাড়া আরও দুটি মায়ের সন্তান আমি। একটি বিহার-মাতা, যাঁকে দিয়ে আমার দেহ পুষ্ট, আমার এমন দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব হয়েছে। আর একটি আমার বঙ্গমাতা—যিনি পুষ্ট করেছেন আমার মানসজীবন, আমার সাহিত্য শিল্পজীবন।' (৩) পাটনার "সঙ্কিতা" একদা লিখেছিলেন, 'বিহারে থেকেও যে বাঙলা সাহিত্যের যশঃশিখরে আরোহণ করা যায়, বিহারে থাকলেই যে বাঙালীত্ব বিসর্জন দিতে হয় না, বাঙালী থেকেও যে অবাঙালীর আপন হওয়া যায়—বিভূতিবাবু আমাদের কাছে যেন তার জীবন্ত নিদর্শন। (৪) বিহার বাঙলা সমিতির মটো ঠিক করে দিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ—"সংহতি ও সমন্বয়"। তাঁর জীবনেও সার্থক হয়েছে সেই সংহতি ও সমন্বয়ের সাধনা। তাঁর সাহিত্যে স্পষ্ট করে দেখা দিয়েছে বাঙলা ও বিহারের মানুষ, প্রকৃতি, জীবনচিত্র। জীবনেও তিনি ঘটিয়েছেন বিহারের চিরায়ত লোক-জীবন এবং তাঁর মানসজীবনের সেতু-বন্ধন।

বিহার বাঙালী সমিতির কথা এখানে অনিবার্য এসে পড়ে। ১৯৩৮ সালের ১২ই ফেবরুয়ারি মুখ্যত দেশবন্ধু-

ভ্রাতা ব্যারিসটার প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (পি. আর. দাশ)-এর নেতৃত্বে এটি গঠিত হয় সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক-অসাম্প্রদায়িক অবয়বে। পাটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শহরে এবং অঞ্চলে এর কর্মপরিধি পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। মূল উদ্দেশ্য ছিল বিহারে বাঙালিদের ক্ষেত্রে ন্যায়-হীন প্রযোজ্য ডোমিসাইল রুলের অবসান ঘটানো এবং বৈষম্যের দূরীকরণ। সমিতির ইংরেজি সাপ্তাহিক "বেহার হেরালড"-এর জন্যে শ্রী দাস প্রার্থনা করলেন রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী এবং বিষয়ানুগ একটি প্রবন্ধ। ১৪ সেপটেম্বর ১৯৩৮ কবির একান্তসচিব অনিল চন্দ মারফত এই অনুরোধ জানিয়ে লিখলেন, 'I claim that Bengali Association is in no sense a communal organisation. It does not claim to be a separate community in Bihar but it claims that Bengalis are Indians, first and foremost.' ১৮ অকটোবর, ১৯৩৮-এর বেহার হেরালড-এ প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের এক দীর্ঘ বাণী। কবি লিখলেন, "Our

immediate duty is to throw off the deadening burden of crude materialism, imposed upon us by dead centuries, the idolatry of spiritual genius of local boundaries, inciting in us an un-reasoming passion of hatred against neighbours, the fury of which recoils upon ourselves to degrade our being." অনিল চন্দ লিখলেন পি আর. দাশকে, প্রবন্ধ পাঠানো হয়তো কবির পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু message-টি হবে 'much on the lines you have suggested for the article.' বিভূতিভূষণ "জীবন-তীর্থে" লিখেছেন, 'বাঙালী "স্বদেশী" আন্দোলনের পর আর একবার "রাখীবন্ধনের" ব্রত নিল। এবার অবশ্য পরস্পরের মণিবন্ধে নয়, অন্তরে অন্তরে। ···কিছু কাজ হয়েছিল। উনিশ শো সাতচল্লিশ সালে দেশ স্বাধীন হোল। নূতন করে "সংবিধান" সৃষ্টি হোল। তার মূল কথাটা হোল, ভারতবাসী ভারতের যে যেখানে আছে, সর্ব বিষয়েই পূর্ণ এবং সমান অধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারবে। মনে হোল, ডোমিসাইল-দানব বুঝি বিদায় হোল।' (৫)

বিহার বাঙলা সমিতির ক্রিয়াকর্ম স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর এই প্রত্যাশায় ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তী কালে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণের সমস্যা-শঙ্কায় এর পুনরুজ্জীবন ঘটে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮ তারিখে। বিভূতিভূষণ যুক্ত হলেন নিবিড়-ভাবে সমিতির কার্যধারার সঙ্গে। ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি দ্বারভাঙ্গা সম্মেলনে বিহার বাঙলা সমিতির কেন্দ্রীয় সভা-পতি পদে বৃত হন তিনি এবং পরবর্তী দুই বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে সমিতিকে সার্থক নেতৃত্ব দেন। সভাপতির দায়িত্ব-মুক্ত হবার পরও আমৃত্যু তিনি বিহার বাঙলা সমিতির অন্যতম প্রাণপুরুষ থেকে যান এবং সমিতির প্রয়াসে ভারতের প্রথম সরকারি বাঙলা আকাডেমি ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় বিহার সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলে, তিনিই হন বিহার বাঙলা আকাডেমির প্রথম অধ্যক্ষ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিভূতিভূষণ এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

বস্তুত বিহার বাঙলা সমিতি এবং বিহার বাঙলা আকাডেমি তাঁর পরিণত জীবনের শেষ পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। শুধু নামমাত্র সভা-পতি বা অধ্যক্ষ নন, যাকে বলে সক্রিয় নেতৃত্ব, তা-ই তিনি দিয়ে গেছেন আ-মৃত্যু। এদিক থেকে আশ্চর্য সজীবতা এবং কর্মক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর নিজের ভাষায়: 'এদিকে নিজের আয়ু পূর্ণ হয়ে ক্লান্তিও এসে গেছে। সময় এসেছে ছুটি নেওয়ার। তারই জন্য প্রস্তুত হবো, এমন সময় কবির কথায় হুকুম এলো—"এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা"।' (৬) পাখা যে তিনি বন্ধ করেন নি, তারই ফলে আমরা ধরতে পেরেছি তাঁর "অপ্রবাসী" বা "বঙ্গভাষী বিহারী"র সত্তাকে। এ এমন এক বিচরণভূমি যার থেকে স্পষ্ট হয় তাঁর মনোভঙ্গি, তাঁর এক দিককার জীবনদর্শন। বঙ্গভাষী বিহারী এবং সংখ্যাগুরু অন্য অধিবাসী উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এক শাশ্বত ভারতীয়ত্বে। 'পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে, পরস্পরকে বুঝে, বুঝিয়ে, আরো কাছাকাছি এসে পড়বার চেষ্টা থাকবে আমাদের।'—লিখেছেন বিভূতিভূষণ—'আমাদের পলিসি দ্যোতক বাণী (motto) আর প্রতীক কি হওয়া উচিত, আমার অভিমত চাওয়া হলে আমি লিখে দিলাম—মৈত্রীতে নিবদ্ধ দু'টি হাত, করমর্দনের ভঙ্গিতে, আর মোটোর (motto) দিকে "সংহতি-ও-সমন্বয়"। কেন্দ্রীয় কমিটি এটা গ্রহণ ক'রে নিলেন। ভাবটা রইল নিজেদের মধ্যে 'সংহতি', ওঁদের সঙ্গে 'সমন্বয়' বা বোঝাপড়া।' (৭) আজ যখন সর্বস্তরে সর্বত্র জাতীয় সংহতি নিয়ে আলোচনা এবং তৎপরতা—এর থেকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি আর কী হতে পারে? এবং বিহার বাঙলা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন যখন হল দ্বারভাঙ্গায়, স্মারকপুস্তিকার নাম রাখলেন বিভূতিভূষণ—"অ-প্রবাসী"।

তাঁর মানস সত্তা এবং সংস্কৃতিগত বাঙালিয়ানার প্রসঙ্গ ইতোপূর্বেই স্পর্শ করা হয়েছে। বিভূতিভূষণের লেখক-সত্তার পূর্ণ বিকাশ বিহারের মাটিতে। কিন্তু মানস হাওয়া বদলের জন্য বারেবারে ছুটে গেছেন কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্যিক আড্ডায়। আবার কলকাতাও বিভিন্ন সময়ে এসে পড়েছে দ্বারভাঙ্গায়, তাঁর বাড়িতে। দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল কলেজ বা অন্যান্য স্থানীয় কলেজের বাঙালি ছাত্রদের বার্ষিক সাহিত্যবাসরে তিনি স্থায়ী সভাপতি। বাঙলা সাহিত্যের অন্য কোনো দিক্‌পাল সাহিত্যিককে প্রধান অতিথি করে আনিয়ে দেবার দায়িত্ব ছিল তাঁর। তাঁরা এসে উঠতেন বিভূতিভূষণেরই বাড়িতে। 'প্রায় একটা দিন বেশি ধরে রাখতাম। কলেজের হাঙ্গামা মিটে গিয়ে আমরা নিজেদের দুজনকে নিয়ে বসতাম। নিশ্চিন্ত অবসরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে দুজন সাহিত্যিক মনের কপাট খুলে আলাপ-আলোচনা, নিজেদের নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে, জীবন নিয়ে, জীবনাতীত যা সাহিত্যে ধরা যাচ্ছে না, তাই নিয়েও। তন্ময় হ'য়ে কখনও কখনো গভীর রাত্রি পর্যন্ত।—সে যে কী আনন্দ বলে ওঠা যায় না।' (৮)

এই সূত্রেই অনিবার্য এসে যাবে শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথ। 'শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা বরাবরই ছিল, কিন্তু দূরত্ব প্রভৃতি কারণেই হয়ে উঠেছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন দ্বারভাঙ্গায় ব'সেই একটা সুবর্ণসুযোগ পেয়ে গেলাম।

'খুব সম্ভব আমি তখন রাজস্কুলে [দ্বারভাঙ্গা মহারাজার স্কুল—লেখক] দ্বিতীয়বার হেডমাষ্টারি করছি, হঠাৎ কি ক'রে খবর পেলাম শান্তিনিকেতন থেকে আচার্য বিধুশেখর ভট্টাচার্য রাজধর্মশালার দ্বিতলে মাননীয় অতিথিদের জন্য নির্ধারিত ঘরটিতে এসে রয়েছেন। ধর্মশালাটি আমাদের বাড়ির কাছেই, গিয়ে দেখা করলাম। সদাপ্রসন্ন অমন অমায়িক মানুষ আমি জীবনে কম দেখেছি। তাঁর কাছেই জানতে পারলাম, কবি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় ভারতে সদলবলে ভ্রমণে যাচ্ছেন, আচার্যমশাই অর্থ-সংক্রান্ত দৌত্যে মহারাজের কাছে এসেছেন।····· একটি প্রতিশ্রুতি আদায় হয়েছে, গেলে উনি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পথ সুগম ক'রে দেবেন। পথ যে নিতান্ত দুর্গম নয়, এটাও তাঁর সান্নিধ্যে এসেই অনুমান ক'রে নিতে পারলাম।' (৯)

বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হবার পর বিভূতিভূষণ চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। উৎসাহের প্রাবল্যে স্মরণ ছিল না, তখন গ্রীষ্মের ছুটি। কবি শান্তি-নিকেতনে নেই, আশ্রমিকরাও অনেকেই নেই। তবু শান্তিনিকেতনের অভিজাত সহৃদয়তার স্বাদ পেলেন এবং দেখা হল বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে। 'এর বেশ কয়েক বৎসর পরে হোল দেখা। তবে সে লিখে রাখবার মতো কিছু নয়। খবর দিয়েই যাই, তবে খবরটাই ছিল অসম্পূর্ণ। কবি শান্তিনিকেতনেই আছেন, তবে, সদ্য একটা বড় রকম অসুখ থেকে উঠে ডাক্তারের পরামর্শে সাক্ষাৎকার খুবই নিয়ন্ত্রিত। তবু পাওয়া গেল। অমিয়বাবু তখন একান্ত সচিব। সেদিনে দ্বিজেন্দ্রনাথের মতোই বাইরের একটা জায়গায় আরাম চেয়ারে অর্ধশয়ান হয়ে বসেছিলেন। প্রণাম করে পাশে বসলাম। ক্লান্তই রয়েছেন, যার জন্যে আমার উপস্থিতিই আমায় যেন পীড়া দিতে লাগল। অনেকটা সঙ্কুচিতই করে রাখল। ক্লান্তস্বরেই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।' (১০) এর পরেও অবশ্য শান্তি-নিকেতন গেছেন। কবি-বিহীন শান্তিনিকেতনেও। মানস হাওয়া বদলের তাগিদ তো দেখা দিয়েছে মাঝেমধ্যেই।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছু পত্রবিনিময় হয়েছিল বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের। তাঁকে নিজের গ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন। কবি পড়ে খুশি হন। ২৩. ১. ৪০ তারিখে এক পত্রে বিভূতিভূষণ লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে: 'আমার 'রাণুর প্রথম ভাগ' ও 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' আপনাকে ভেট দিয়াছিলাম। আশীর্বাদ পাইয়াছে।' প্রসঙ্গত ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪ তারিখে বই পাঠাবার সময় কবিকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি, তার উদ্ধৃতি: 'নিরতিশয় কুণ্ঠার সহিত আমার এই সামান্য পুস্তকখানি আপনার কাছে পাঠাইতেছি। আপনার অবসর একেই অল্প, তাহার উপর এ ভরসাও নাই যে বইখানি সামান্যতমও সেই অবসর বিনোদিত করিতে পারিবে। তবুও যদি জানা যায় সে নিতান্তই অত্যাচাররূপে উপস্থিত হয় নাই, তাহা হইলেও একটা তৃপ্তি।

'আসলে অক্ষমতার কুণ্ঠা সত্ত্বেও, আপনাকে অর্পণ করার মধ্যে যে একটি আত্মপ্রসাদ আছে তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা যায় না।'

"রাণুর দ্বিতীয় ভাগ" পড়ে বিভূতিভূষণকে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ: 'আজকাল বই পড়া কষ্টকর হয়েছে। তবু তোমার রাণুর দ্বিতীয় ভাগের কয়েকটি গল্প পড়ে বুঝেছি তোমার লেখায় রস আছে গাঁথুনি আছে। ছেলেদের সম্বন্ধে যে দুটি গল্প পড়লুম আমার বিশেষ ভালো লাগল।' (২. ১২. ৩৮)

উল্লেখপঞ্জী

১) জীবনতীর্থ পৃ ১১৩। ২) জীবনতীর্থ পৃ ১১৩। ৩) দেশ, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৮৭ পৃ ১২৩। ৪) সঞ্চিতা ১৫ ও ৩০ সেপটেমবর, ১৯৮৪ (সম্পাদকীয়)। ৫) জীবনতীর্থ পৃ ৪৫২। ৬) জীবনতীর্থ পৃ ৪৫২। ৭) জীবনতীর্থ পৃ৪৫৩। ৮) জীবনতীর্থ পৃ ৪১৬-৪১৭। ৯) জীবনতীর্থ পৃ ৩৭৮। ১০) জীবনতীর্থ পৃ ৩৮০।

ভ্রমসংশোধন

সংখ্যা : জানুআরি, ১৯৮৮

পৃষ্ঠা	কলম	লাইন	ছাপা হয়েছে	শুদ্ধরূপ
৭৫৪	২	১৮	সালোম্যামি	সালোম্যানি
৭৯৩	২	২৫		'আগেই বাড়ি ফিরে আসতে পারতাম। কিন্তু' (এই ছয়টি শব্দ ছাড় হয়েছে)।
৭৯৬	২	২	মিয়ে	নিয়ে
	২	২৪		দিতেন যা বেশ ব্যক্তিগত ছিল। ('বেশ' শব্দটি ছাড় হয়েছে)।
	২	২৯	বলছিলেন	বলেছিলেন
৮৩৬	১	১৮	৪০১	৮০০
	১	২৩	১৪ই	১৬ই
৮৩৯	২	২	কমানোর	বাড়ানোর
৮৪৭	১	শেষ লাইন	জেরাসিসভের	জেরাসিমভের
৮৫১	১	২২	poet	fact
৮৫২	২	২৭	Judes	Judo

ভ্রমসংশোধন

জানুআরি ১৯৮৮ সংখ্যায় 'ভারতে সাম্প্রতিক শেকসপিয়ার-চর্চা' রচনায় কয়েকটি গুরুতর মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেছে। লেখক এবং পাঠকদের আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

—সম্পাদক

পৃষ্ঠা	লাইন	ছাপা হয়েছে	শুদ্ধরূপ
৮১৩	২০	'গণ'	জুঁর্
৮১৫	৫	প্রাণের	পূর্ণের
	৬	stept into	slept / Into
	৭	our state Is	our state / Is
		Endymion, I 795-6	*Endymion*, I, 795-7
৮১৭	২২		'কেন এত কষ্ট?' 'কেন এত নিষ্ঠুরতা?'
৮১৯	১০	ফ্লোরিজাল	ফ্লোরিজেল
৮২০		নেথম্	নেহম্
৮২১	৪	Penosees	Penoe´es
	১৬	বিশেষ তাঁর	বিশেষ করে তাঁর
	৩০	সুখ্যাত	মুখ্যত
৮২২	১৫	সেলভেরো	সিলভেরো
	২৯	"জেরনটিয়োন"	"গেংন্টিয়ন্"
	৩২	টিলোটসিন	টিলট্সন্
	৩৩	subregno	sub regno
৮২৩	১৭	কে	কে কে
	৩১	স্বাতন্ত্র্য	স্বাতন্ত্র্য
৮২৪	২১	আত্মাকেও	আত্মাকেই
	পাদটীকা	amorous pinches	amorous pinches black,
৮২৫	২৮	স্বেচ্ছাকৃত	স্বেচ্ছাবৃত
৮২৬	৩	after all	after all
	৪	মারিল্লা	মারিয়া
		এবেদিয়ার	এবেদিয়ার
	৭	Impevator	Imperator
	১৭	পড়বার	গড়বার